পুরাকীর্তি সমীক্ষা : মেদিনীপুর

- তারাপদ সাঁতরা

মুদ্রক : হেড্‌ওয়ে লিথোগ্রাফিক কোঃ
পি-২৫৩, সি·আই·টি স্কীম ৬ এম
কলিকাতা-৭০০০৫৪

প্রথম প্রকাশ : ২৬শে, জানুয়ারি, ১৯৮৭

মুখবন্ধ

মানব সভ্যতা ধারাবাহী, কোন বিশেষ কাল বা যুগে সে স্বয়ম্ভু নয়। মানুষের শ্রমশক্তিজাত নব নব সৃষ্টিই গড়ে তুলেছে আধুনিক সভ্যতার ইমারত। আধুনিকতার আপাত চমৎকারিত্বের পিছনে যে হাজার হাজার বছরের কর্ম-ঘর্ম ও সৃজনশীলতার ইতিহাস রয়েছে, তার অনুসন্ধানই বস্তুনিষ্ঠ সমাজচেতনা। তাই যা কিছু প্রাচীন তাই বাতিলযোগ্য বা স্থানু নয়। মানুষের প্রাচীন কীর্তির মধ্যেও আছে গতিবেগ যা দিয়ে বর্তমানকে চেনা বা বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। কোন জাতিই তার ইতিহাস, তার পুরাকীর্তি, তার শিল্প-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য সম্যকভাবে অনুশীলন ও আত্মস্থ না করে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। ঐতিহ্যবিযুক্ত নিরবলম্ব জাতি বা সমাজ অবক্ষয়ী ও বিকলাঙ্গ হতে বাধ্য। অগ্রগতি ও সুস্থতার স্বার্থেই পূর্বপুরুষদের গৌরবজনক কীর্তিগুলির অনুসন্ধান, অনুধ্যান ও নবীন মূল্যায়ন একান্তভাবে জরুরী। যে জাতি যত বেশী এ কাজে সিদ্ধ হয়েছে তার সমৃদ্ধি তত বেশী সম্ভব হয়েছে।

পুরাকীর্তিতে বাংলার গৌরব অপরিসীম। এখনও তার উদ্‌ঘাটন ও মূল্যায়ন আমরা সম্পূর্ণ করতে পারিনি। সু-চিরকাল থেকে সৃষ্ট আমাদের সেই মহিমময় গৌরব ও মহান কীর্তি জেলায় জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে—কিছু লোকচক্ষুর সামনে, কিছু অগোচরে। সংস্কৃতির অঙ্গনে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচী রূপায়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকার সুস্থ সংস্কৃতির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে প্রয়াস করে চলেছে। এরই অন্যতম দিক হল পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও আধুনিক কালের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটানো পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাসহ ষোলোটি জেলার পুরাসম্পদের তথ্যভিত্তিক ইতিবৃত্ত রচনা ও প্রকাশের প্রকল্প এ রাজ্যের সরকার বহু আগেই গ্রহণ করেছিল। ইতিপূর্বে বাঁকুড়া, বীরভূম, কুচবিহার, নদীয়া ও হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ে পাঁচটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশের পর বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ও বৈচিত্র্যময় জেলা মেদিনীপুরের পুরা-ইতিবৃত্তের উপর দুটি গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হল।

মেদিনীপুরের পুরা-সম্ভার অপরিমেয়। কংসাবতী, শিলাবতী সুবর্ণরেখা, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদীর কখনও মমতাময়ী কখনও রুদ্ররূপ ভাঙাগড়ার চিরচিহ্ন এঁকে দিয়েছে এই জেলার শরীরে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জীবনযাত্রার ধারাস্নাত যুগ যুগ ব্যাপী সৃষ্টিক্রম সংস্কৃতির বিপুল সম্পদে ভরিয়ে রেখেছে এই রেখাকে। প্রস্তর যুগের নানা দ্রব্য-সামগ্রী সভ্যতার উষাকালের মৃৎপাত্র ও অন্যান্য পুরাবস্তু এবং তাম্রযুগের সমকালীন তাম্রায়ুধ অসংখ্য মন্দিরগাত্রের শিল্পসৌষ্ঠব প্রভৃতির সন্ধানলাভ মেদিনীপুরের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অনুশীলন ও অভিনিবেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।

সদ্য প্রকাশিত এই গ্রন্থটিতে মেদিনীপুর জেলার সুমহান পুরাকীর্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ত্ব ও তথ্যমূলক ইতিবৃত্ত বিধৃত হয়েছে। পাঠকের জ্ঞানপিপাসা ও কৌতূহলের দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। আশা করি পাঠক সমাজের কাছে এটি আদরণীয় হবে।

প্রকাশনার উদ্দেশ্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও কলকাতার যাবতীয় পুরাসম্পদের (পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর) বিশদ বিবরণসম্বলিত ষোলোটি গ্রন্থ প্রকাশের যে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন, এ গ্রন্থটি সেই গ্রন্থমালার নোতুন সংযোজন। ইতঃপূর্বে বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার, নদীয়া ও হাওড়া জেলার পুরাকীর্তিবিষয়ে যে পাঁচটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্বের আকর-গ্রন্থরূপে সেগুলি জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়েছে। আমার আশা, পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা মেদিনীপুরের উপরে লেখা এই গ্রন্থও জনসাধারণ সাদরে গ্রহণ করবেন।

গ্রন্থকারের নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ বিগত ১৬·৯·৭৪ তারিখে ২৪০ (৪) এ-নং পত্রে আমাকে হাওড়া ও মেদিনীপুর এই দু'জেলার পুরাকীর্তি সংক্রান্ত পুস্তক রচনার আদেশ দেন। তদনুসারে ঐ বৎসরের শেষ দিকে হাওড়া জেলার এবং ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক পাণ্ডুলিপি, 'পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার' সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত বিশেষ আধিকারিক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থাপন করি। পরবর্তী ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে 'হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থটি যথারীতি প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মহাশয়ের নির্ধারিত কার্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ায় তাঁর অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর জেলার পুরাকীর্তি বিষয়ক পুস্তকটির প্রকাশও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস ফদিকার মহাশয় এ বিষয়ে উদ্যোগী হন এবং তারই ফলে এ গ্রন্থের প্রকাশনা সম্ভব হল; এজন্যে তাঁর প্রতি আমি একান্তই কৃতজ্ঞ।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া) একশ বছরের বেশী পুরাতন ঐতিহাসিক ইমারতকে পুরাকীর্তি বলে গণ্য করেন। এছাড়া প্রাচীন স্তূপ, ঢিবি, কবরখানা, জলাশয়, ভাস্কর্য, পুঁথি-পুস্তক, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস প্রভৃতিও পুরাকীর্তি বা পুরাবস্তুর পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং এই সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী মেদিনীপুর জেলার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল ও পুরাবস্তুর বিবরণই এ পুস্তকটিতে পরিবেশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রত্নতত্ত্ব উপদেষ্টা পরিষদের প্রকাশন উপ-সমিতি পাণ্ডুলিপি যথাসম্ভব হ্রস্বীকৃত করার পক্ষে মত প্রকাশ করায় আলোচ্য পুরাকীর্তির স্থান-বিবরণী সেইমত কিছুটা সংক্ষেপিত করা হলেও মূল তথ্যের অবশ্য কোন হানি হয়নি। জেলার স্থানীয় পৌরসংঘের অন্তর্গত পুরাকীর্তিস্থলসমূহকে বর্ণানুক্রমে উল্লেখ না করে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট পৌরসংঘের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এছাড়া পরবর্তী সময়ে প্রশাসনিক সুবিধার্থে এ জেলার দু'একটি থানার এলাকা বিভাজন করে নতুন থানার পত্তন করা হলেও, এ গ্রন্থে পুরানো থানা এলাকার ক্ষেত্রাধিকারই বজায় রাখা হয়েছে। স্থানাভাবে কয়েকটি থানার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পুরাকীর্তিস্থল সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে প্রদর্শন করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত। এ ছাড়া যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ঘটে থাকতে পারে অথবা দু'একটি উল্লেখ্য পুরাকীর্তিস্থলের বিবরণও অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে সন্ধান পেলে সে সব স্থান-বিবরণীও এ পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থ বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখিত নয়; জনসাধারণকে জেলার প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের অপসৃয়মান নিদর্শনগুলি সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্যই এই প্রচেষ্টা। কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি যদি সাধারণ পাঠকের আনুকূল্য লাভ করে তবেই বর্তমান শ্রম সার্থক হবে।

এ পুস্তকটি রচনায় মেদিনীপুর জেলাবাসী নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে

সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি প্রণয়নকালে লোকান্তরিত ডেভিড্ ম্যাক্‌কাচ্চন, বিনয় ঘোষ, সুধাংশু রায়, দেবকুমার চক্রবর্তী, পঞ্চানন রায়, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন সামন্ত, রাসবিহারী রায় প্রমুখের জ্ঞানদ সাহচর্য আমাকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছে ; গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের ঋণ প্রথমেই স্মরণ করি। জেলার দূর দূরান্তরে পরিভ্রমণের সময় বহুক্ষেত্রে আমার বিশ্বস্ত ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার জন্য শ্রীঅসিতকুমার সামুই, শ্রীবিশ্বনাথ সামন্ত, শ্রীঅমল দে, শ্রীপ্রবাল রায় প্রমুখের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। এছাড়া বহুক্ষেত্রে অন্যান্য প্রত্নস্থল ভ্রমণের সঙ্গী সর্বশ্রী শম্ভুনাথ ঘটক (ঝাড়বনী), ডঃ ত্রিপুরারঞ্জন বসু (দাসপুর), রসময় বন্দ্যোপাধ্যায় (দেবীপুর), শিশুতোষ ধাওয়া (খাকুড়দা), অজয় ঘোষাল (মেল্লক), পূর্ণচন্দ্র দাস (বাসুদেবপুর), ভারত সামন্ত (ঘাঁটাল), প্রদ্যুম্ন রায় (হাওড়া), রবি দে (রাউলিয়া), বরেন্দ্রনাথ মাকড় (মেদিনীপুর), পার্থসারথি দাস (দেউলপোতা), ডঃ প্রবালকান্তি হাজরা (দেউলপোতা), সরোজকুমার জানা (জাহানাবাদ), আনন্দগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় (মেল্লক), বাঁশরীমোহন ভৌমিক (কাঁটাপুকুর), রাধারমণ সিংহ (চন্দ্রকোণা), সুকুমার মাইতি (আন্দিচক), শ্রীধর মাইতি (সজনাগাছি), দেবাশিস গোস্বামী (আনন্দপুর), দীপঙ্কর দাস (মেদিনীপুর), মহম্মদ ইয়াসিন পাঠান (হাতিহোলকা), শীতাংশু মুখোপাধ্যায় (চাঁদড়া), ডাঃ সত্যব্রত দত্ত (মেদিনীপুর), তাপসকান্তি রাজপণ্ডিত (কোলাঘাট), হিমাদ্রি সরকার (কলিকাতা), শিবেন্দু মান্না (হাওড়া), কমলকুমার কুণ্ডু (তমলুক), গঙ্গাপদ কোঙার (ঘোষডিহা), প্রশান্ত মণ্ডল (তমলুক), অরুণাভ দত্ত (মেদিনীপুর), দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পুঁএগাপাট) প্রমুখের সহৃদয় সহায়তায় আমি কৃতার্থ।

এ গ্রন্থমালার পূর্বতন সম্পাদক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র জেলার কয়েকটি অজ্ঞাত প্রত্নস্থলের তথ্য ও আলোকচিত্র সরবরাহ করে আমাকে বাধিতই করেননি, তিনি এবং তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী স্বর্গতা উমা বন্দ্যোপাধ্যায় এ জেলার প্রত্নস্থলে পরিভ্রমণের সময় আমাকে তাঁদের ভ্রমণসঙ্গী হবার সুযোগদান করে চিরঋণী করেছেন। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রত্নতত্ত্ব উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় এবং উক্ত পরিষদের প্রকাশন-উপসমিতির সদস্যদ্বয় ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল ও ডঃ অশোককুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থটির গুণগত মান বর্ধনে বহুবিধ তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে একান্তই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের উপ-অধিকর্তা ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কেবলমাত্র পরীক্ষাই করেননি, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি একান্তই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও আলোকচিত্র সংগ্রহে সর্বশ্রী পাঁচুগোপাল রায়, প্রাণকৃষ্ণ পাল, ডঃ হিতেশরঞ্জন সান্যাল, শিবেন্দু মান্না, কমলকুমার কুণ্ডু, ডঃ দীপকরঞ্জন দাস, ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, অমিত রায়, শ্যামসুন্দর চন্দ্র, ডঃ তারাশিস মুখোপাধ্যায়, ডঃ অনিমেষকান্তি পাল, ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার বসু, প্রবাল রায়, শরদিন্দু সামন্ত, ডঃ দেবাশিস বসু, ডঃ সুহৃদকুমার ভৌমিক, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সহায়তায় আমি একান্তই কৃতজ্ঞ।

এ পুস্তকটি শোভনভাবে মুদ্রণের জন্য হেডওয়ে লিথোগ্রাফিক প্রেসের শ্রীগৌতম দত্তকে ধন্যবাদ জানাই। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উপ-সচিব শ্রীব্রজেন মণ্ডল

মহোদয়ের সদা-প্রসারিত বিবিধ সাহায্যের জন্য তাঁর কাছেও গভীরভাবে ঋণী। সাংসারিক দায়বন্ধনের ভার লাঘবের জন্য আমার স্ত্রী শ্রীমতী নীলা সাঁতরা ও দু'একটি পুরাকীর্তিস্থলে ভ্রমণসঙ্গী হওয়ার জন্য পুত্র শ্রীমান শুভদীপ সাঁতরাকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদজ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র।

গ্রাম ঃ নবাসন, ডাক ঃ বাগনান,
জেলা ঃ হাওড়া, পিন ঃ ৭১১৩০৩।
২৬ শে জানুয়ারি, ১৯৮৭।

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভৌগোলিক রূপরেখা: মেদিনীপুর আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। এর উত্তরে বাঁকুড়া, হুগলী ও পুরুলিয়া জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পুবে হুগলী-ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিমে ওড়িশার বালেশ্বর ও ময়ূরভঞ্জ ও বিহারের সিংভূম ও মানভূম জেলা। জেলাটি ২১°৩৬'৩৫" থেকে ২২°৫৭'১০" উত্তর অক্ষাংশে এবং সমগ্র উত্তরাংশ ৮৮°১২'৪০" ও পশ্চিমাংশে ৮৬°৩৩'৩৫" দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের প্রদত্ত হিসাব মত এ জেলাটি ১৩,৬১৮ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী জেলার মোট লোকসংখ্যা ৬৭,২৩,৮৬০, যার মধ্যে পুরুষ ৩৪,৪৪,৫৬১, নারী ৩২,৭৯,২৯৯ এবং গ্রামে ৬১,৪৯,৮৪৩ জন ও শহরে ৫,৭৪,০১৭ জন বাস করেন।

এ জেলার মহকুমার সংখ্যা পাঁচটি হলেও, কার্যতঃ সেটি সদর-উত্তর, সদর-দক্ষিণ, ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম, এই ছ'টি মহকুমায় বিভক্ত।

মেদিনীপুর জেলার নামের উৎপত্তি নিয়ে নানান মত প্রচলিত। মেদিনীপুর শহরটি বেশ প্রাচীন হলেও, এর নামকরণ সম্পর্কে পণ্ডিতেরা সঠিকভাবে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শিখরভূমের নৃপতি রাজা রামচন্দ্রের রচিত এক পুঁথির বিবরণ থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, খ্রীষ্টীয় তের থেকে পনের শতকের মধ্যে এদেশে প্রাণকর নামে কোন এক স্বাধীন হিন্দুরাজার পুত্র মেদিনীকর এই নগরীর পত্তন করায় কালক্রমে সেটির নাম হয় মেদিনীপুর। শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রসঙ্গে আরও অবগত করান যে, এই মেদিনীকরই 'মেদিনীকোষ' নামে একটি সংস্কৃত কোষগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

অপর আর একটি মত হল, মেদনমল্ল রায় নামে ওড়িশার এক পরাক্রমশালী নৃপতি ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করে কাঁসাই নদীতীরবর্তী এলাকায় শাসন কায়েম করেছিলেন। তাঁর নাম থেকেই পরবর্তীকালে এখানকার নামকরণ হয় মেদিনীপুর। অবশ্য এ মতটির পরিপোষক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর রচিত 'ইসলাম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'মৌলনা মুস্তফা মদনীকে (রঃ) সম্রাট আওরঙ্গজেব বর্তমান মেদিনীপুর শহরে একটি মসজিদ সম্পর্কিত মহল ও বহু লাখেরাজ সম্পত্তি দান করেন। এই মৌলনা মদনী সাহেবের নাম হইতে মদনীপুর নাম হয়; পরে তাহার অপভ্রংশ মেদিনীপুর হইয়াছে। বাদশাহী সনের তারিখ ১০৭৭ হিজরী (বাংলা সন ১০৯০-৯১)। ইহা ফুরফুরা কেবলাগাহ সাহেবের খান্দানে রক্ষিত আছে' (পৃ: ১১৮)। কিন্তু আওরঙ্গজেবের বহু আগে খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে প্রণীত "আইন-ই-আকবরী"তে মেদিনীপুর মহলের অন্তর্গত মেদিনীপুর নগরের নাম উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং মৌলানা মুস্তফা মদনীর নামেই যে মেদিনীপুর নামকরণ হয়েছে, তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

ওড়িশার গঙ্গবংশের (খ্রীষ্টীয় ১২-শ শতক) ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গদেব তাঁর রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত শ্রীকুর্মম লিপি (১১৩৫ খ্রীঃ) থেকে জানা যায় যে, এই বৎসরেই তিনি গঙ্গা থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ অধিকার করেন। এছাড়া অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ, ২য় নরসিংহ ও ৪র্থ নরসিংহের প্রদত্ত বিভিন্ন লিপির সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে, অনন্তবর্মণের রাজ্য বিস্তৃত ছিল দক্ষিণে গোদাবরী, উত্তরে মিধুনপুর, পূর্বে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত। বর্তমানে ঐসব লিপিতে উল্লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ওড়িশার চোড়গঙ্গ রাজাদের আধিপত্য যে মিধুনপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেটিই হল বর্তমান মেদিনীপুর। সুতরাং আলোচ্য এই মিধুনপুর অপভ্রংশে যদি মেদিনীপুর হয়ে থাকে, তাহলে খ্রীষ্টীয় বার শতকেই 'মেদিনীপুর' নামের অস্তিত্ব রয়েছে।

এছাড়া 'মেদিনীপুর' নামকরণের পিছনে আরও একটি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গ ও দক্ষিণ বিহারের মগধ আমাদের কাছে জ্ঞাত হলেও উল্লিখিত চেরপাদটিকে ঐতিহাসিকেরা দক্ষিণাপথের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত 'চেরো' নামক গবেষণাগ্রন্থের লেখক হরিমোহনের অনুমান, চেরো ভূখণ্ড আসলে ছোটনাগপুরের মালভূমি। এই গ্রন্থে মেদিনীরায় নামে একজন পরাক্রান্ত চেরো সম্রাটের কথা আছে। মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশ ছোটনাগপুর মালভূমির প্রত্যন্তভাগে অবস্থিত। মেদিনীপুরের পশ্চিম অংশ উল্লিখিত মেদিনীরায়ের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। এই যুক্তিতে মেদিনীরায় প্রসঙ্গে মেদিনীপুর নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়।

নামকরণের ইতিহাস যাই হোক্ না কেন, মেদিনীপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজল প্রণীত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে (১৫৯৬ খ্রীঃ)। সেই সময় প্রশাসনিক কারণে মেদিনীপুর ওড়িশার মধ্যে ছিল। ওড়িশা ছিল পাঁচটি সরকারে বা প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। জলেশ্বর এর অন্যতম। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ (আঠাশটি মহলে বিভক্ত) ছিল সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত। এরপর শাহজাহানের আমলে (১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) ঐ পাঁচটি সরকারকে ভেঙ্গে বারটি সরকারে পুনর্গঠিত করা হয় এবং উত্তরাংশের ছ'টি সরকারকে সুবা বাংলার অধীন করা হয়। এর মধ্যে জলেশ্বর, মালঝিটা, মজকুরী ও গোয়ালপাড়া সরকার প্রধানতঃ বর্তমান মেদিনীপুরের এলাকাভুক্ত হয়।

মুর্শিদকুলী খাঁর (১৭২২ খ্রীঃ) আমলে রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা সংশোধন করে 'মহল'-এর বদলে 'পরগণা'র প্রচলন হয়। এই উপলক্ষে 'সরকার' নামীয় বিভাগকে ভেঙ্গে বিভিন্ন 'চাকলা'য় বিভক্ত করে দেওয়া হয়। চাকলাহিজলীর সমগ্র অংশ এবং চাকলা বালেশ্বরের কতক অংশ আজকের এই মেদিনীপুর জেলার মধ্যে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা অধিকারের পর চাকলা বালেশ্বরকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর এই দুইভাগে বিভক্ত করে দেওয়া হয়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাসেমকে বাংলার নবাবী প্রদান করেন তখন এই মর্যাদাপ্রাপ্তির মূল্য

হিসাবে মীরকাসিম এক চুক্তিবলে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে হস্তান্তরিত করেন। বলতে গেলে এই সময় থেকেই মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মীরকাসেম কর্তৃক হস্তান্তরিত মেদিনীপুর বর্তমান মেদিনীপুর জেলা থেকে অনেক পৃথক। তখন হস্তান্তরিত মেদিনীপুর জেলা তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সে বিভাগগুলি হল, চাকলা হিজলী, চাকলা মেদিনীপুর ও চাকলা জলেশ্বর। তারমধ্যে চাকলা হিজলী ছিল হুগলীর সংলগ্ন এবং চাকলা মেদিনীপুর ছিল পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকার সরকার গোয়ালপাড়ার কতকগুলি পরগণার অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজদের কাছে হস্তান্তরের সময় বালেশ্বর জেলার উত্তর অংশ (সুবর্ণরেখার উত্তরতীরে) সিংভূমের ধলভূম মহকুমা, মানভূমের জঙ্গলমহল, বরাহভূম ও মানভূম এবং বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল, ছাতনা ও অম্বিকানগর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরপক্ষে হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক, মারাঠাদের অধীন পটাশপুর, কামারডিচোর ও ভোগরাই পরগণা এবং বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত তখনকার ঘাটাল মহকুমা, সদর মহকুমার গড়বেতা ও শালবনি থানার কিছু অংশ এবং কেশপুর থানা এই হস্তান্তরের সময় বাদ থেকে যায়।

মেদিনীপুর ও জলেশ্বর এই দুটি চাকলার শাসনভার মিঃ জনস্টোন নামে জনৈক ইংরেজ অফিসারের অধীনে দেওয়া হয়। ইনি এই জেলার রাজস্ব, ফৌজদারী ও বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক এলাকার কমার্সিয়াল এজেন্ট, পলিটিক্যাল অফিসার ও মিলিটারী গভর্ণরও ছিলেন। এই সময়েই মেদিনীপুর শহরে মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই জনস্টোন মেদিনীপুর শহরে এক-টি কমার্সিয়াল ফ্যাক্টরীও নির্মাণ করেন। ১৭৭৪ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলা সরাসরি বর্ধমানের প্রাদেশিক কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরবর্তী ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এ জেলায় 'কালেক্টর'-এর পদ সৃষ্টি হওয়ায়, মিঃ জন পিয়ার্স এ পদে নিযুক্ত হন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়, হিজলী, মহিষাদল ও তমলুক ছিল সল্ট কালেক্টরের শাসনাধীন সল্ট এজেন্টের অধীন এবং সদর মহকুমা-উত্তর ও ঘাটাল এই দুই মহকুমা ছিল বর্ধমানের এলাকাধীন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সে সময়ের জঙ্গল মহলের অন্তর্গত গড়বেতার এলাকাধীন বগড়ী পরগণার বেশ কিছু অংশ বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরে হস্তান্তরিত করা হয়। এর ঠিক পাঁচ বছর পরে, বিশেষ এক আদেশবলে, বগড়ীর অবশিষ্ট অংশ, ব্রাহ্মণভূম ও চেতুয়া পরগণার অংশ তরফ দাসপুর হুগলী জেলা থেকে পৃথক করে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের অধিকারভুক্ত পটাশপুর ও সুবর্ণরেখার উত্তরে অন্য দুটি পরগণাও মেদিনীপুরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এর ঠিক দু'বৎসর পরেই জঙ্গলমহলে চুয়াড় বিদ্রোহজনিত অশান্তির কারণে জঙ্গলমহলের সাতটি এলাকা মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক একটি জঙ্গলমহল জেলার সৃষ্টি করা হয়। এর ঠিক পরের বৎসর, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, শাসনকাজের সুবিধার জন্য পটাশপুর, কামারডিচোর ও ভোগরাই পরগণা হিজলীর সল্ট এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তী ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পরগণাগুলিকে পুনরায় বালেশ্বর জেলার এলাকাধীন করে দেওয়া হয়।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপর জেলা পত্তনের সময় থেকেই আর্জকের ঘাটাল ও

চন্দ্রকোণা থানার এলাকা ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত ক্ষীরপাই মহকুমার অধীন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রকোণার অধিবাসীদের আবেদন অনুযায়ী, ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকারটি হুগলী জেলা থেকে মেদিনীপুর জেলার অধীনে চলে আসে। তবে রাজস্ব ক্ষেত্রাধিকার পূর্ববৎ থেকে যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরপাইকে হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমায় পরিণত করা হয় বটে, কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষীরপাই মহকুমা তুলে দিয়ে চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল থানা চূড়ান্তভাবে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়। বলা যেতে পারে, এই সময় থেকেই মেদিনীপুর জেলার সীমানা প্রায় পাকাপাকিভাবেনির্ধারিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালেও তেমন কিছু আর পরিবর্তন হয়নি।

ভূপ্রকৃতির দিক থেকে এ জেলার পুব অংশের সঙ্গে পশ্চিমের মিল নেই। বলতে গেলে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের মাটি কঙ্করময়, উচ্চাবচ এবং রঙ লালচে। কিন্তু পুবের অংশটি গড়ে উঠেছে হুগলী-ভাগীরথী এবং তার উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলি দিয়ে। মেদিনীপুর জেলার পূর্ব সীমানা চিহ্নিত করে হুগলী-ভাগীরথী প্রবাহিত। এছাড়া এই জেলার প্রধান নদনদী হিসাবে কংসাবতী, শীলাবতী, রূপনারায়ণ, সুবর্ণরেখা ও রসুলপুর উল্লেখযোগ্য। কংসাবতী (বা চলতি কথায় কাঁসাই) নদী পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থেকে উৎপন্ন হয়ে এ জেলার কেশপুর থানার কপাসটিকরীতে দুভাগ হয়ে একটি শাখা (সরকারীভাবে যার বর্তমান নামকরণ পলশপাই খাল) পুবমুখে রূপনারায়ণ নদে মিশেছে। মূল প্রবাহটি নীচের দিকে হলদী নামে হুগলী-ভাগীরথীতে মিশেছে। তারাফেনি ও কেলেঘাই কংসাবতীর উল্লেখযোগ্য উপনদী।

কাঁসাই ছাড়া এ জেলায় শীলাবতী বা শিলাই-এর ভূমিকাও কম নয়। এ নদীর অনেকগুলি উপনদী আছে তার মধ্যে বুড়িগাং, গোপা, বেতাল, তমাল, বিড়াই, পুরন্দর, কুবাই, পারাং, দোনাই, আমোদর, শাকরী ও কেটে উল্লেখযোগ্য। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত রসুলপুর বা বাগদা নদীটিও একদা বোরোজ নদীর (বর্তমানে সদরখাল নামে পরিচিত) সঙ্গে মিশে হুগলী-ভাগীরথীতে সঙ্গম হয়েছে। জেলার পশ্চিম সীমানা চিহ্নিত করে প্রবাহিত হয়েছে সুবর্ণরেখা ও তৎসংলগ্ন উপনদী ডুলং, যার কূলে কূলে বহু প্রাচীন সব ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। এ জেলার অন্যান্য নদীর মধ্যে ক্ষীরাই, পাঁচথুপি, চণ্ডী ও কপালেশ্বরী প্রভৃতির নাম করা যায়। কপালেশ্বরী এ জেলায় একদা খুব গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল। এ নদীতীরবর্তী স্থানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষই তার প্রমাণ।

উল্লিখিত এসব নদ-নদীর বিভিন্ন সময়ে নানান পরিবর্তন ঘটেছে এবং কতকগুলি নদনদীর গতি পরিবর্তনের ফলে, সেগুলির তীরবর্তী গ্রাম্য সমাজের বিকাশ ও বিলোপ দুই-ই ঘটেছে একই সঙ্গে। এর মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে কতকগুলি নদনদীর প্রবাহ লুপ্তপ্রায়; বর্তমানে এগুলি খালে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু এসব নদীর তীরে যেসব পুরাসম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকেই এদের গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমেয়।

মেদিনীপুর জেলায় বেশ কিছু প্রাচীন রাজপথের সন্ধান মেলে। সিংহলী ধর্মগ্রন্থ 'মহাবংশ'-তে উল্লিখিত হয়েছে যে, মৌর্য সম্রাট অশোক কয়েকজন দূতকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য পাটলিপুত্র থেকে এই বন্দরে নিজে উপস্থিত হয়েছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ (সপ্তম শতক) তাম্রলিপ্ত থেকে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত একটি পথের ইঙ্গিত

দিয়েছেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণ পাঠে জানা যায় যে, তিনি স্থলপথে সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি এবং তাম্রলিপ্তি থেকে কর্ণসুবর্ণ গিয়েছিলেন।

তবে পুঁথিপত্রের এ বিবরণ ছাড়া এ জেলার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত 'নন্দ কাপাসিয়ার জাঙ্গাল' নামে যে উঁচু বাঁধটির অস্তিত্ব আজও লক্ষ্য করা যায়, সেটিও যাতায়াতের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আনুমানিক পনের থেকে ষোল শতকে নির্মিত এ বাঁধটি ঘাটাল, ডেবরা, সবং প্রভৃতি থানা এলাকার স্থানে স্থানে এখনও বিদ্যমান। এছাড়া নারায়ণগড় থানা এলাকায় আরও একটি পরিত্যক্ত উঁচু বাঁধ দেখা যায়। বাঁধটি কেশিয়াড়ী-থেকে নারায়ণগড়ের উপর দিয়ে সবং থানায় 'নন্দ কাপাসিয়ার বাঁধে' যুক্ত হয়েছে। এ উঁচু বাঁধটি একদা প্রাচীন পথ ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। এর আশপাশে বহু গ্রামে বেশ কিছু পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এছাড়া বাদশাহী সড়ক নামে খ্যাত মোগল আমলে নির্মিত একটি রাজপথ বর্ধমান থেকে প্রসারিত হয়ে হুগলী জেলার গোঘাট থানার উপর দিয়ে এ জেলার চন্দ্রকোণা ও কেশপুর থানা বরাবর মেদিনীপুর শহরে পৌঁছেছে। এছাড়া রাণীগঞ্জ থেকে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি পথ এবং মেদিনীপুর শহর থেকে পশ্চিমে নাগপুর পর্যন্ত যোগসূত্রবাহী আর একটি পথ একদা ছিল এ জেলার গুরুত্বপূর্ণ দুটি সড়ক। পরবর্তী উনিশ শতকে পোস্তার রাজা সুখময় রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে ইংরেজ সরকার তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে এ জেলার উপর দিয়ে যে রাজপথটি নির্মাণ করেন, তাই একদা জগন্নাথ রাস্তা অথবা কটক রোড নামে পরিচিত হয়। সতরাং এই রাজপথগুলি যে মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ : মেদিনীপুরের একদিকে পাথুরে মাটি এবং অন্যদিকে পলিমাটি দিয়ে গঠিত বিস্তৃত ভূভাগ। সুতরাং আদিম মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে নদীমাতৃক সভ্যতার বিচিত্র আদানপ্রদান ঘটেছে এই জেলায়। স্বভাবতই সেজন্য প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন এ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গিয়েছে। এ জেলায় প্রবাহিত রূপনারায়ণ, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, শিলাই ও তারাফেণী প্রভৃতি নদীতীরবর্তী স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে যেসব প্রস্তরযুগের হাতিয়ারের নিদর্শন

পাওয়া গেছে, তা থেকে বেশ বোঝা যায়, এ জেলা এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানেও আদিপ্রস্তর যুগ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা বিভিন্ন পর্বের ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ জেলার বিভিন্ন এলাকায় তাম্রপ্রস্তর যুগেরও যে বিকাশ হয়েছিল তার প্রমাণ এ জেলার বিভিন্ন স্থানে তামার আয়ুধ ও অন্যবিধ প্রত্নসামগ্রী প্রাপ্তিতে। জেলার বীনপুর থানার এলাকাধীন তামাজুড়ি গ্রাম থেকে যে তামার কুঠারটি পাওয়া গেছে (বর্তমানে সেটি ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে সংরক্ষিত) সেটি নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক তাম্রসম্ভার যুগ সভ্যতার নিদর্শন। এছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে গড়বেতা থানার অন্তর্গত আগুইবনি, এগরা থানার এলাকাধীন চাতলা, সবং থানার অধীন পেরুয়া, জামবনী থানার অন্তর্ভুক্ত পরিহাটি এবং তমলুক থেকে যেসব তামার কুঠার ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে (যা পরবর্তী 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে) সেগুলি এ জেলার প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

প্রাগৈতিহাসিক তথা তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতা যে এ জেলায় প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে তারও বেশ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এ জেলার নানাস্থানে অনুসন্ধানকালে পাওয়া গেছে। তমলুক এলাকার বিভিন্ন স্থানে সন্ধান চালিয়ে এবং খননকার্য করে যেসব পুরাবস্তু পাওয়া গেছে সেগুলির কাল নির্ণয় করে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খ্রীষ্টপূর্ব ১ম সহস্রক থেকে সুরু করে ১০ম-১১শ শতকের প্রত্নদ্রব্য বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাথরের যেসব মূর্তি-ভাস্কর্য পাওয়া গেছে (যেগুলি প্রসঙ্গতঃ পরবর্তী 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) সেগুলিও এ জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বলেই গণ্য হতে পারে।

একদা তাম্রলিপ্তের খ্যাতি যে এই সামুদ্রিক বন্দরের জন্য সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে এবং বিদেশীদের প্রদত্ত বিবরণেও জানা গেছে। বর্তমান তমলুক ও তার আশপাশ থেকে প্রাপ্ত বেশ কিছু পুরাবস্তুর নজিরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সেকালের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ও বিদেশীদের বিবরণে উল্লিখিত সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত হয়ত বা আজকের এই তমলুক। বর্তমান তমলুকের অদূরে রূপনারায়ণ নদের অপর তীরে হাওড়া জেলার চর-রাধাপুরে (থানা: শ্যামপুর) রোমান শিরস্ত্রাণ পরিহিত, দ্বিমুখবিশিষ্ট হাতলযুক্ত পোড়ামাটির এক অদ্ভুত মূর্তি (বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত) সম্পর্কে গবেষকদের মতামত হল, সেটি প্রাচীন রোমক যুদ্ধদেবতা 'জানুস'-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অতএব প্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তের সঙ্গে দেশবিদেশের যোগাযোগ থাকার এটি এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাম্রলিপ্তির বাণিজ্য সমৃদ্ধির কথা প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থেও উল্লিখিত হয়েছে। 'কথাসরিৎ সাগরের' একটি কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে তাম্রলিপ্তিকা পূর্বাম্বুধির

অদূরে অবস্থিত এক নগরী। 'দশকুমার চরিতে'র মতে দামলিপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙও উল্লেখ করেছেন তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের খাড়ীর উপর অবস্থিত এবং এই বন্দর থেকেই ৫ম শতকে ফা-হিয়েন সিংহল এবং ৭ম শতকে ইৎসিং সুমাত্রা-যবদ্বীপ যাবার জন্য জাহাজে উঠেছিলেন।

মেদিনীপুর জেলায় প্রাপ্ত এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ছাড়াও অদ্যাবধি সংগৃহীত বিবিধ প্রাচীন পুঁথিপত্রের ও লিপিফলকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বর্তমান (এ জেলার) তমলুক সন্নিহিত ভূভাগ প্রাচীনকালের সুহ্ম বা তাম্রলিপ্তি জনপদের (বিভাগের) অন্তর্গত ছিল। 'রাঢ়' জনপদের দুটি বিভাগের মধ্যে সুহ্ম বিভাগ সমধিক প্রসিদ্ধ। 'মহাভারতে' ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ভীম মুদ্গগিরি, পুণ্ড্র, বঙ্গ, তাম্রলিপ্তি ও সুহ্মের রাজাদের পরাজিত করেন। 'দশকুমার চরিত' গ্রন্থে সুহ্ম ও তাম্রলিপ্তিকে পৃথক জনপদ না বলে বরং তাম্রলিপ্তিকে সুহ্মের অন্তর্ভুক্ত বলে বলা হয়েছে। 'জৈন কল্পসূত্র' গ্রন্থে গোদাসগণ নামীয় জৈন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখার নাম 'তাম্রলিপ্তিক' শাখা। 'জৈন প্রজ্ঞাপনা' গ্রন্থেও তামলিত্তি বঙ্গজনপদের অধিকারে ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকে বরাহমিহির 'তাম্রলিপ্তিক' জনপদকে গৌড়ক ও বর্ধমান থেকে পৃথক জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মেদিনীপুর জেলায় আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের শশাঙ্ক প্রদত্ত তিনটি তাম্রপট্ট থেকে জানা যায়, দণ্ডভুক্তি গৌড়রাজ শশাঙ্কের অধীনে এবং উৎকলদেশ এই রাষ্ট্রবিভাগের অন্তর্গত। এছাড়া খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকের 'ইর্দা লিপি'তে যে বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ করা হয়েছে, তার সীমানা ছিল দণ্ডভুক্তি মণ্ডল অর্থাৎ আজকের দাঁতন পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে (১১শ শতক) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে (আঃ ১১-১২ শতক) যথাক্রমে তণ্ডবুত্তি=দণ্ডভুক্তি ও দণ্ডভুক্তি মণ্ডলের উল্লেখ আছে। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' প্রণেতা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন যে, দণ্ডভুক্তি বর্তমান মেদিনীপুর (প্রাচীন মিধুনপুর) জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অংশ; বর্তমান দাঁতন প্রাচীন দণ্ডভুক্তির স্মৃতিবহ।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে জানা যায়, আজকের পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অংশ তার অধীনস্থ ছিল। ওড্ড বিষয় (ওড়িশা) এবং কোসলৈনাড়ু (দক্ষিণ কোশল) জয়ের পর তাঁর সেনাবাহিনী ধর্মপালকে পরাজিত করে তণ্ডবুত্তি (দণ্ডভুক্তি) এবং রণসূরকে পরাজিত করে তক্কণলাড়ম (দক্ষিণ রাঢ়) অধিকার করেন।

ওড়িশার কেন্দুয়া পাটনা, পাঞ্জাবী মঠ এবং শঙ্করানন্দ মঠে রক্ষিত তাম্রপট্টের বিবরণে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় বার শতকে রামপালের পুত্র কুমারপালের দুর্বলতার সুযোগে ওড়িশার অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গ রাঢ় আক্রমণ করে মান্দারের রাজাকে পরাজিত করে তার দুর্গনগর আরম্য ধ্বংস করেন এবং মিধুনপুরের (মেদিনীপুর) ভিতর দিয়ে গঙ্গাতীর পর্যন্ত দখল করেন। এই মান্দার যে গড় মান্দারণ, আরম্য যে আরামবাগ এবং মিধুনপুর যে মেদিনীপুর, সেকথা ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত 'মাদলা পঞ্জী'র বিবরণ অনুসারে ওড়িশার পরবর্তী নৃপতি অনঙ্গভীমদেব রাঢ়দেশের দামোদরতীর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম থেকে বাংলায় মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হতে শুরু হবার পরেও বহুদিন পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার ভূভাগ ওড়িশার অধীনস্থ ছিল বলে মনে

হয়। ওড়িশার রাজা কপিলেন্দ্রদেব পনের শতকে মেদিনীপুরের কুরুমবেড়ায় যে পাথরের স্থাপত্যসৌধটি নির্মাণ করেন, সেটি থেকেই প্রমাণ হয়, মেদিনীপুরের এই এলাকাটি তখনও ওড়িশার রাজাদের শাসনাধীন রয়েছে।

পরবর্তী পনের শতকের শেষদিকে বর্তমান মেদিনীপুর জেলা বাংলার স্বাধীন সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। তবে ষোল শতকের মধ্যভাগে ওড়িশারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দন বাংলা আক্রমণ করে মেদিনীপুর ও হাওড়ার অংশসহ হুগলীর ত্রিবেণী পর্যন্ত দখল করে নেন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগান বংশীয় সুলেমান কারনানি মুকুন্দদেবকে পরাজিত ও নিহত করে মেদিনীপুর সমেত চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত ওড়িশার এই বিস্তীর্ণ এলাকা অধিকার করেন।

সুলেমান কাররানি ওড়িশায় বিদ্রোহ দমনেই তার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কারনানিও আকবর বাদশাহের অধীনতা স্বীকার না করায় এ জেলায় প্রায় তিরিশ বছর ধরে মোগল ও পাঠানে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকে। মোগল-পাঠান যুদ্ধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের তুকারই যুদ্ধ। তুকারই দাঁতনের প্রায় তের কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। সে যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়ে মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন বটে, কিন্তু মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর আবার বিদ্রোহী হওয়ায় রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হন।

পরবর্তী ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলদের ঘরোয়া বিবাদের সুযোগে দাউদ খাঁর সেনাপতি কতলু খাঁ ওড়িশা এবং মেদিনীপুর সহ বাংলার দক্ষিণপশ্চিম এলাকার দামোদর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করলেও শেষ পর্যন্ত মোগলদের সঙ্গে এক চুক্তিবলে মেদিনীপুর সহ ওড়িশার করদ-রাজ হিসাবে পরিগণিত হন। এরপর পুনরায় আফগান শক্তি বিদ্রোহী হলে মোগল সেনাপতি মানসিংহ ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সে বিদ্রোহ দমন করে মেদিনীপুর সহ ওড়িশা দখল করেন।

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একদা ছোট বড় বেশ কিছু অর্ধ স্বাধীন সামন্ত নৃপতির রাজত্ব ছিল। এঁদের স্মারক হিসাবে পরিখাবৃত গড়বাড়ি বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরে যে দুটি দুর্গের উল্লেখ রয়েছে সে সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ মনোমোহন চক্রবর্তীর অনুমান যে, সে দুটি দুর্গের মধ্যে একটি গোপগড় ও অন্যটি বর্তমানের পুরাতন জেলখানা। এছাড়া এ জেলার আড়ঢ়া তোড়িয়া, আলিশাগড়, চাঙ্গুয়াল, খেলাড়গড়, চন্দ্ররেখাগড়, কর্ণগড়, ময়নাগড় প্রভৃতি প্রাচীন গড় বা দুর্গগুলি বর্তমানে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হলেও সেগুলি আজও প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে।

মোগল বিজয়ের পর মেদিনীপুর সুবা ওড়িশার অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে বাংলার শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত শাহজাহানের পুত্র শাহসুজার শাসনকালে সরকার জলেশ্বরকে ওড়িশা থেকে পৃথক করে বাংলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণের হাত থেকে সরকার জলেশ্বরের সমুদ্রউপকূলভাগ রক্ষা করা।

সপ্তদশ শতকে মেদিনীপুরের ইতিহাসে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাদা খুররম (পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান) বিদ্রোহী হয়ে মেদিনীপুরের মধ্য দিয়েই দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির

মধ্যে এক সড়ক নির্মাণ করে খুররমকে সাহায্য করেন। পরে খুররম বাদশাহ শাহজাহান হয়ে শ্যামবল্লভকে 'মাড়ী সুলতান' বা 'পথের রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা, জোব চার্ণকের সঙ্গে মোগলদের বিরোধ এবং তারই পরিণতিতে ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীতে ইংরেজ ও মোগলের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিত ইংরেজদের সঙ্গে মোগলদের শর্তসাপেক্ষে সন্ধি হয়। তৃতীয় ঘটনাটি হল, ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদার তালুকদার শোভা সিংহের বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহে বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরাম নিহত হলেও, শেষপর্যন্ত বর্ধমানে কোন এক অজ্ঞাত কারণে শোভা সিংহের মৃত্যু ঘটে। সেজন্য তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হেম্মত সিংহ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হন এবং পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে একত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করায়, বাংলার শাসনকর্তা আজিমুশ্বানের হাতে তাদের পরাজয় ঘটে। ফলে এই বিদ্রোহের অবসানে দেশে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে আসে।

আঠার শতকের সুরুতে বাংলা ও ওড়িশার দেওয়ান হন মুর্শীদকুলী খাঁ। তিনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা সংস্কার করেন, তদনুযায়ী বাংলাকে তেরটি চাকলায় ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি চাকলাকে কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করা হয়।

নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে মারাঠা আক্রমণ শুরু হয়। ইতিহাসে এটি বর্গী হাঙ্গামা নামে খ্যাত। আলীবর্দী এই মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রতিরোধ চালিয়ে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। সে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, নবাব সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণ পার পর্যন্ত সমগ্র ওড়িশা মারাঠাদের ছেড়ে দেবেন এবং বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দেবেন। চুক্তি সত্ত্বেও সুবর্ণরেখার উত্তর-পুব এলাকায় ভোগরাই, কামারডিচোর, পটাশপুর ও সাহাবন্ধ পরগণা মারাঠাদের অধিকারে থেকে যায়।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাসিমকে বাংলার নবাব করে দেওয়ার বিনিময়ে এক চুক্তিবলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান যে হস্তান্তরিত করে দেওয়া হয়, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় কোম্পানি মেদিনীপুর শহরে বস্ত্রশিল্পের আড়ং স্থাপন করে। ক্ষীরপাই, রাধানগর ও ঘাটাল এলাকাতে ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য বিদেশী বণিকরাও রেশম শিল্পের ব্যবসা শুরু করে এবং হিজলীতে দেশীয় প্রথায় লবণ শিল্পটিও ইংরেজ কোম্পানি অধিকার করে।

পৌনঃপুনিক মারাঠা আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন চলতে থাকায় এ জেলায় শিল্প-বাণিজ্য ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। বাংলা থেকে অর্থশোষণ করাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য। তাই কোম্পানি নগদ খাজনা দাবি ও সেইসঙ্গে খাজনার হার বৃদ্ধি এবং লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় জঙ্গলমহল এলাকার জমিদারদের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধ সুরু হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হওয়ায়, বহু নিষ্কর জমি স্থানীয় জমিদারদের আশ্রিত পাইক বরকন্দাজদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে গোটা মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ জুড়ে যে বিদ্রোহ সুরু হয়, তাই ইতিহাসে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। বহু ক্ষয়ক্ষতি ও জীবননাশের পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কোম্পানি এই বিদ্রোহ

নৃশংসভাবে দমন করেন। এরপর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জঙ্গলমহলের নায়েক বিদ্রোহীরা পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করে এবং এই বিদ্রোহীদের দমনে ইংরেজ শাসকদের প্রায় দশবছর সময় লাগে।

এরপর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের জের এসে পৌঁছায় মেদিনীপুরে এবং জনৈক তেওয়ারী ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে এক ব্যাটালিয়ান রাজপুত সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জনশ্রুতি যে, ঐ বিদ্রোহী রাজপুত সৈন্যটিকে এখানকার কলেজিয়েট স্কুলের সামনে ফাঁসী দেওয়া হয়। অশান্তি ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মেদিনীপুরের জনজীবন এইভাবেই দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়েছে এবং বিশ শতকের সুরু থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ জেলায় স্বাধীনতার যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হয়েছিল, সে গণ-বিদ্রোহের ইতিহাস বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু নয় বলেই তা থেকে বিরত থাকা গেল।

মেদিনীপুর জেলার ধর্মীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য :

এ জেলার আয়তনের পরিধি যেমন বিশাল, তেমনি জেলার নানাস্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্মিত বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপত্যের সংখ্যাও অজস্র। এ জেলায় অতি প্রাচীন মন্দির-দেবালয়ের অস্তিত্ব আজ আর না থাকলেও, সেগুলির কেবলমাত্র উল্লেখ পাওয়া যায় কয়েকজন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী থেকে। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত যখন বন্দর হিসাবে খ্যাত, সে সময় ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্ প্রভৃতি পরিব্রাজক এখানে বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে বহু হিন্দু মন্দিরও লক্ষ্য করেছিলেন। তবে সে সব মন্দিরের গঠন স্থাপত্য যে কোন্ রীতির ছিল তা স্পষ্টতঃ জানা না গেলেও, প্রাচীন বাংলায় মোটামুটি যে চার শ্রেণীর মন্দিরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সেগুলি হল, পীঢ়া, শিখর, স্তূপশীর্ষ পীঢ়া ও শিখরশীর্ষ পীঢ়া দেউল। আলোচ্য এই চার প্রকরণের মন্দিরের মধ্যে শেষোক্ত দুটি রীতির কোন মন্দিরের নিদর্শন এ জেলায় দেখা না গেলেও, প্রাচীন বাংলার দণ্ডভুক্তিতে যে স্তূপশীর্ষ পীঢ়ারীতির মন্দির প্রচলিত ছিল, সে সম্পর্কে অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতী খ্রীষ্টীয় এগার শতকের 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথিতে চিত্রিত সেখানকার এক মন্দিরের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। প্রাচীন দণ্ডভুক্তি এলাকা যে বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত প্রাচীন রীতির এই চার প্রকরণ ছাড়াও এ জেলায় আরও এক অভিনব স্থাপত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এ জেলায় অভূতপূর্ব রীতির এই মন্দিরটি খড়্গপুর থানার এলাকাধীন বালিহাটি গ্রামে অবস্থিত। মাকড়া পাথরে নির্মিত ও ভগ্নাবস্থায় পতিত এই স্থাপত্যটির শীর্ষদেশ ভগ্ন এবং জঙ্গলে ঢাকা। সেজন্য আলোচ্য এ মন্দিরটির রীতিপ্রকরণ বেশ অবোধ্য হলেও, এটির গর্ভগৃহের চর্তুদিকে এক ঘেরা প্রদক্ষিণপথসহ মূল প্রবেশপথের দুধারে দুটি প্রকোষ্ঠ দেখা যায়। সুতরাং এ মন্দিরটির গঠন পরিকল্পনায় যে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় অন্যান্য মন্দিরে অনুপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বালিহাটির এই মন্দিরটির নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয়

দশম শতকের বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু এই কাল নির্ণয় হয়ত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হলেও এখানকার এই মন্দিরটি যে মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনতম এক মন্দির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লিখিত মন্দিরটি ছাড়া প্রাক্-মুসলিম যুগের আরও যে একটি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটি বীনপুর থানার এলাকাধীন ডাইনটিকরিতে অবস্থিত। কাঁসাই নদী তীরবর্তী সে মন্দিরটি মাকড়া পাথরে নির্মিত একটি পীঢ়া দেউল এবং বর্তমানে পরিত্যক্ত। সেটির গঠনস্থাপত্য অনুযায়ী অনুমান যে, খ্রীষ্টীয় বার-তের শতকে সম্ভবতঃ এর প্রতিষ্ঠাকাল।

তবে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলার মত, বিশেষ করে বাঁকুড়ার বাহুলাড়া ও সোনাতপল, পুরুলিয়ার বড়াম-দেউলঘাটা, পারা, বর্ধমানের দেউলিয়া এবং চব্বিশ পরগণার পশ্চিম জটা গ্রামের মত, ইটের উচ্চ শিখরযুক্ত মন্দির এ জেলায় নির্মিত হয়েছিল কিনা, তার কোন হদিশ পাওয়া না গেলেও, এ জেলায় খ্রীষ্টীয় দশ থেকে তের শতকের মধ্যে পূর্বোক্ত দুটি মন্দির ছাড়া এ জেলায় আরও অনেক মন্দির যে নির্মিত হয়েছিল তার কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ এবং সে সব মন্দিরে পূজিত বিগ্রহাদির নির্দশন নানাস্থানে পাওয়া গেছে। অতীতে এ জেলার উপর দিয়ে যেভাবে ক্রমাগত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হাঙ্গামার স্রোত বয়ে গেছে, তার ফলে এইসব ধর্মীয় সৌধগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকার কথা নয়। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে এইসব মন্দির-দেবালয় এবং সে সব দেবালয়ে পূজিত বিগ্রহাদির নির্দশন প্রাপ্তিতে এ জেলার প্রাচীন মন্দির-দেবালয়গুলির অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গড়ে তোলা সম্ভব।

মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলি এ জেলার যেসব স্থানে কেন্দ্রীভূত সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল কেলেঘাই নদী তীরবর্তী পাথরঘাটা। এখানে প্রাপ্ত ঘণ্টা ও পদ্মকোবক উৎকীর্ণ পাথরের স্তম্ভগুলি যে কোন এক প্রাচীন দেবালয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল তেমন অনুমান মোটেই অসঙ্গত নয়। প্রাপ্ত এসব নিদর্শনগুলি দেখে অনুমান করা যায় সেগুলি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দশ-এগারো শতকের কোন পুরাকীর্তি।

এছাড়া এ জেলায় যে এককালে বহু শিখর ও পীঢ়ারীতির মন্দির-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলি আজ বিদ্যমান না থাকলেও সে সব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও সেগুলিতে ব্যবহৃত বিরাটাকার আমলকশিলাগুলি আজ অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ, এ জেলার কিয়ারচন্দ্র, মৎনগর, রণবনিয়া, ওড়গোঁদা, জিনশহর,ঝাকরা, চাঙ্গুয়াল, বাড়ুয়া,ভৈরবপুর, রসকুণ্ড, রাউতমনি, রোহিণী, পাকুড়সেনী, হীরাপাড়ি, বালীহাটি প্রভৃতি গ্রামগুলিতে যেসব আমলকশিলার নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি যে সেখানকার কোন শিখর বা পীঢ়ারীতির মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবে মুসলমান শাসনের প্রথমভাগে এ জেলার নানাস্থানে ছোট-বড় বেশ কিছু অর্ধস্বাধীন অথবা করদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সেখানকার ভূস্বামীদের কৃত বেশ কিছু মন্দির-দেবালয়ের উদাহরণ দেখা যায়। বিশেষ করে, পনের থেকে ষোল শতকের মধ্যে এ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের বেশ কিছুটা অংশ ওড়িশার প্রভাবাধীনে থাকায়, সেইসব এলাকায় বেশ কিছু শিখর ও পীঢ়া মন্দির নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, এ জেলার গগণেশ্বর, এগরা, দেউলবাড়, সহস্রলিঙ্গ, বাহিরী-দেউলবাড়, ঢেকিয়া, কেদার

ও গড়বেতা প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিখর দেউল এবং দাঁতন, সেঁকুয়া, বেলদা ও গড়বেতায় নির্মিত পীঢ়া দেউলগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে উল্লিখিত মন্দিরগুলি ছাড়া পনের শতকের শেষ ও ষোল শতকের প্রারম্ভে একটি মাত্র ইটের চারচালা মন্দিরের নিদর্শন দেখা যায় ঘাটালে, যা সিংহবাহিনীর মন্দির নামে পরিচিত।

এ জেলায় সতের শতকে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র দুটি মন্দিরেই প্রতিষ্ঠালিপি পাওয়া গেছে এবং সে দুটি মন্দির হল, কেশিয়াড়ীর সর্বমঙ্গলা এবং চন্দ্রকোণার লালগড়ের নবরত্ন। শেষোক্ত মন্দিরটির অবশ্য কোন অস্তিত্বই আজ আর নেই। লিপিপ্রমাণযুক্ত এ দুটি মন্দির ছাড়া অনুমানভিত্তিক সতের শতকে নির্মিত মন্দিরগুলির অধিকাংশই পাথরের তৈরী এবং বহুক্ষেত্রে এগুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্থানীয় ভূস্বামী ও রাজা প্রভৃতি।

আঠার শতকে এ জেলায় দীর্ঘদিন ধরে মারাঠা-বর্গীরঅত্যাচার চলতে থাকায় এবং সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ, সন্ন্যাসী ও চুয়াড় বিদ্রোহের দরুণ, গোটা জেলা জুড়ে একটা অস্থির অবস্থা দেখা যায়। সুতরাং এই শতকে এ জেলায় মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ বেশ হ্রাস পায়। তবু এই শতকে নির্মিত যে কটি মন্দির-দেবালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলির সংখ্যাও কম নয় এবং স্থাপত্য ও অলঙ্করণ বৈচিত্র্যেও তা বেশ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই শতকের শেষদিকে রেশম এবং অন্যান্য আরও কতকগুলি শিল্পে উন্নতি ঘটায় বেশ ব্যাপকভাবে মন্দির নির্মাণের উদ্যোগ সুরু হয়। সে কারণে আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শেষ অবধি এ জেলায় যে ব্যাপকহারে মন্দির নির্মাণ হয়েছে তার একটি সামাজিক ভিত্তিও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কারণ এ সময়ের মন্দির প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন ছোটখাট জমির উপস্বত্বভোগী, রেশম ও সূতীবস্ত্র, লবণ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, গুড় ও পিতলকাঁসা প্রভৃতির উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এবং যাজনক্রিয়ারত পূজারী বা কুলপুরোহিত। সুতরাং এইসব প্রতিষ্ঠাতারা তাঁদের বিত্তের অনুপাতে মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের যোগসাধন করে যেসব নিদর্শন রেখে গেছেন, তা আঞ্চলিক পুরাকীর্তির স্থাপত্য ভাস্কর্যের তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণার সহায়ক হয়েছে।

এ জেলার দেবালয়গুলিকে প্রধানতঃ শিখর, চালা, রত্ন ও দালান এই চার রীতিপ্রকরণে বিভক্ত করা যায়। ভারতীয় দেবালয় স্থাপত্যের 'নাগর' শৈলী অনুসারী শিখর মন্দিরের যে স্থাপত্যরূপ এ জেলায় দেখা যায় তা ওড়িশায় বিবর্তিত শিখর মন্দিরশৈলীর অনুরূপ প্রভাবযুক্ত। কারণ এ জেলাটির সঙ্গে একদা ওড়িশার যোগসূত্র খুব ঘনিষ্ঠ থাকায়, এ রীতিটি যে বহুলাংশে এ জেলায় প্রসারিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে খাঁটি ওড়িশা শৈলীর জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপযুক্ত শিখর মন্দিরের অনুরূপ মন্দিরাদি এ জেলায় তেমন অধিক সংখ্যক দেখা না গেলেও, নয়াগ্রাম থানার দেউলবাড়ের রামেশ্বরনাথের মন্দিরটি এই প্রসঙ্গের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে, মূল মন্দিরটি শিখর ও তৎসহ জগমোহনটি পীঢ়ারীতির না হয়ে, গোটাটাই যে পীঢ়ারীতির রূপ গ্রহণ করেছে তেমন মন্দিরের উদাহরণ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য এ জেলার শিখর মন্দিরের ক্ষেত্রে দেখা যায় পীঢ়া জগমোহনের বদলে নির্মাণ করা হয়েছে আঞ্চলিক শৈলীর দোচালা, তিনচালা ও চারচালা রীতির মণ্ডপ, যা বাংলা ও ওড়িশী স্থাপত্যের এক সংমিশ্রিত রূপ।

অন্যদিকে, বিশেষ করে এ জেলার কাঁথি মহকুমায়, কতকগুলি শিখর মন্দিরের জগমোহন প্রথাগত পীঢ়ারীতির বদলে শিখরের মতই উচ্চতাসম্পন্ন করে নির্মাণ করা হয়েছে, যা প্রথম দর্শনে জোড়া শিখর-দেউল বলেই ভ্রম হয় এবং এ জাতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন হল, দেউলবাড় (কাঁথি), খারড় (খেজুরী) ও বাসুদেবপুর (এগরা) প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলি।

এছাড়া, ওড়িশা মন্দিরশৈলী প্রভাবিত প্রাচীন শিখর মন্দিরের এই রীতিপ্রকরণ খ্রীষ্টীয় সতের শতকের পর থেকে এ জেলায় পরিবর্তিত হয়ে এক সরলীকৃতরূপে এসে পৌঁছেছে এবং এই রীতি অনুসরণ করে জেলার নানাস্থানে জগমোহন ছাড়াই অসংখ্য শিখর-দেউল নির্মিত হয়েছে। যদিও ওড়িশী শিখর রীতির অংশভাগের নামানুযায়ী 'বাঢ়' ও 'গণ্ডী'—এই দুটি অংশ কেবল নামমাত্রই এসব মন্দিরে দেখা যায় এবং কোথাও কোথাও 'মস্তক' অংশে আমলকটিকে একেবারে ক্ষুদ্রাকার করেই নির্মাণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের শিখর মন্দিরের এই পরিবর্তিত ও সরলীকৃত রূপায়ণটিকে অনেকে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এ বিকশিত ওড়িশী মন্দিরশৈলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল বলেই উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এ মতটি কতটা গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো না গেলেও, বাংলার মাটিতে সহজ-সরল করে পরিবর্তিত এই শিখর মন্দিরগুলিও যে চালা ও রত্নমন্দিরের মতই স্বতন্ত্র এক আঞ্চলিক শৈলীতে পরিণত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিখর রীতির পর চালা রীতির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যেতে পারে, এ রীতিটি বাংলার নিজস্ব। গ্রাম-বাংলায় বাঁশ, কাঠকুটো ও খড়ের ছাউনী দিয়ে নির্মিত দোচালা কুঁড়ে ঘরের আদলে বাঙ্গালী শিল্পী-স্থপতিরাও সেইভাবে দোচালা মন্দির নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন। পশ্চিমবাংলার অন্যত্র এই ধরনের দোচালা মন্দিরের বহু উদাহরণ থাকলেও, এই জেলায় বর্তমানে এই রীতির মন্দিরের দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। কেবলমাত্র রামপুর গ্রামেই এর একটিমাত্র নিদর্শন রয়েছে। তবে এককভাবে দোচালা মন্দিরের তেমন কোন নজির না থাকলেও, শিখর বা একরত্ন মন্দিরের সম্মুখভাগে লাগোয়া মুখমণ্ডপ হিসাবে, অথবা চারচালা মন্দিরের সংলগ্ন জগমোহন হিসাবে নির্মিত এমন দোচালার কিছু কিছু উদাহরণ এ জেলায় দেখা যায়। সে সব মন্দিরের মধ্যে প্রথমোক্তটির উদাহরণ হল, এরাপুর ও মোহনপুর এবং শেষোক্তটির নিদর্শন হল আমোদপুর।

অন্যদিকে দুটি দোচালাকে পাশাপাশি স্থাপন করে এবং শীর্ষে কখনও চূড়া সংযোগ করে যে দেবালয়টি নির্মাণ করা হত, সেগুলিকেই বলা হয় জোড়বাংলা। এ জেলায় এ রীতির উদাহরণ খুব বেশী না হলেও, এ শৈলীর উল্লেখযোগ্য মন্দিরটি হল, চন্দ্রকোণার দক্ষিণবাজারে অবস্থিত মাকড়া পাথরের জোড়বাংলা, যা সতের শতকের প্রাচীন বলেই অনুমান করা যায়। এছাড়া মাকড়া পাথরের আরও যে দুটি জোড়বাংলা দেখা যায়, সেগুলি হল লালগড়ের রাধামোহনজীউর এবং বসনছোড়ায় রাধাগোবিন্দের মন্দির। এ জেলায় বাদবাকী ইটের জোড়বাংলা মন্দিরগুলি রানীচক, মেদিনীপুর-বড়বাজার ও মীরজাবাজার এবং পাইকপাড়িতে অবস্থিত।

আটচালা খোড়ো ঘরের সামনে যেমন তিনচালাযুক্ত বারান্দা নির্মাণ করা হয়, তেমনি আটচালা মন্দিরের সঙ্গে তিনচালা মুখমণ্ডপ নির্মাণের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে পাশাপাশি

হাওড়া জেলায়। এ জেলায় সে ধরনের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখা যায় জনার্দনপুর গ্রামে। তবে এ জেলায় শিখর মন্দির নির্মাণের ধারাবাহিকতা থাকায়, শিখর মন্দিরের সঙ্গে তিনচালা মুখমণ্ডপ জুড়ে দিয়ে যে জগমোহন নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তার নিদর্শন দেখা যায় লোয়াদা, বলরামপুর ও সুজাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলিতে।

অন্যদিকে চালা মন্দিরের আর এক উদাহরণ হল চারচালা মন্দির, যা গ্রামের চারচালা কুঁড়ে ঘরের আদলে গঠিত। তবে এ রীতির মন্দির এ জেলায় তেমন আদৃত হয়নি বটে, কিন্তু ঘাটালের সিংহবাহিনীর চারচালা জগমোহনসহ চারচালা মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় পনের শতকের শেষে নির্মিত এক প্রাচীন চারচালা মন্দিরের দৃষ্টান্ত। পরবর্তী আনুমানিক সতের শতকের পাথরের একটি চারচালা মন্দিরের দৃষ্টান্ত হল, গোয়ালতোড়ের সনকা মায়ের মন্দির। পাথরের আরও যে কটি চারচালা মন্দির দেখা যায়, সেগুলির অবস্থান হল, জয়ন্তীপুর, রঘুনাথপুর, আমনপুর ও মোষদায়। এছাড়া আমনপুর, দেউলি, গোপগড়, আমোদপুর ও শিলদা প্রভৃতি স্থানে ইঁটের চারচালা মন্দিরও দেখা যায়। নাটমণ্ডপ ও দোলমঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত চারচালা রীতির ইমারত এ জেলায় আরও যে সব স্থানে দেখা যায়, সেগুলি হল, বনপাটনা, খণ্ডরুই এবং পাইকপাড়ি। অন্যদিকে শিখর-দেউলের সঙ্গে জগমোহন হিসাবে চারচালার ব্যবহার দেখা যায়, বেংদা, সারতা, পাইকভেড়ি ও দামোদরপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলিতে।

গ্রামের আটচালা কুঁড়েঘরের অনুকরণে নির্মিত আটচালা মন্দিরের সংখ্যাও এ জেলায় কম নয়। জেলার বৃহদায়তন ইঁটের আটচালাগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে চাঁইপাট, খুকুড়দহ, তমলুক, মহিষাদল, দেউলপোতা, রামবাগ, ভবানীপুর, ক্ষীরপাই, মালঞ্চ এবং মনোহরপুর প্রভৃতি স্থানের মন্দির। এই পর্যায়ের ঝামাপাথরের আটচালা মন্দিরের নিদর্শন রয়েছে চন্দ্রকোণা, গড়বেতা, পাথরবেড়িয়া ও ব্রাহ্মণগ্রাম প্রভৃতি স্থানে। তবে এ জেলায় আটচালা মন্দির-স্থাপত্যের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। সে সব অভিনব মন্দিরগুলির উপর ও নীচের চালের মধ্যবর্তী স্থানে সামান্য ফাঁক থাকে; দৃশতঃ মনে হয় যেন চারচালা মন্দিরের টানা চালের দেওয়ালে আড়াআড়িভাবে কোন রেখা টেনে আটচালার রূপ দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে এবং সে জেলার সংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা থানা এলাকার বেশ কিছু অংশে এই স্থাপত্যরীতির মন্দির দেবালয় গড়ে উঠেছে। এ রীতির উদাহরণযুক্ত মন্দির হল, গড়বেতা, ব্রাহ্মণগ্রাম, চন্দ্রকোণা, শিলদা ও কর্ণগড় প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, এ জেলায় একদুয়ারী কতকগুলি আটচালা মন্দির আবার শিখর-দেউলের মতই রথপগ বিন্যাসযুক্ত, যার দৃষ্টান্ত হল, সত্যপুর, গোপালনগর প্রভৃতি।

এ জেলায় বহুস্থানে বারোচালা বাড়িরও বেশ কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে এবং তারই অনুকরণে নির্মিত বারোচালা মন্দিরের উদাহরণও এ জেলায় দেখা যায়। তবে এ জাতীয় মন্দিরগুলির আটচালার উপর ক্ষুদ্রাকার একটি চারচালা সংযুক্ত করে বারোচালায় পরিণত করা ছাড়াও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিখর মন্দিরের মত সেগুলিকেও রথপগ করা হয়েছে এবং এ জাতীয় মন্দির শৈলীর নিদর্শন হল, নতুক জয়কৃষ্ণপুর, জলসরা ও চিরুলিয়া গ্রামের মন্দির।

চালা মন্দিরের মত 'রত্ন' মন্দিরের কার্নিসও বাঁকানো আকারের এবং ছাদও সেইমত

ঢালু হলেও তার স্থাপত্যরীতিতে বেশ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে চূড়া হল রত্ন কথাটির সমার্থক। সুতরাং ছাদের কেন্দ্রে একটি চূড়া নির্মাণ করলে হয় একরত্ন এবং সেটিকে ঘিরে ছাদের চারকোণে ক্ষুদ্রতর আর চারটি চূড়া স্থাপন করলে সেটি হয় পঞ্চরত্ন মন্দির। এইভাবে মন্দিরতলের সংখ্যা বাড়িয়ে বা প্রতি তলের কোণে কোণে চূড়ার সংখ্যা বর্ধিত করে তের বা সতের থেকে পঁচিশ চূড়া মন্দিরও নির্মিত হতে পারে। এ জেলার মন্দিরের এইসব রত্নগুলির স্থাপত্যও অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'রথপগ' করা শিখর-দেউলের মতই, যেন বাংলা ও ওড়িশা সংস্কৃতির এক মিশ্ররূপ এই রত্ন রীতির মন্দির। সমীক্ষায় দেখা যায় এ জেলার উত্তরপূর্বাংশে এ রীতির মন্দির যেন বেশী আদৃত হয়েছে।

তবে একরত্ন মন্দিরের সংখ্যা এ জেলায় ঠিক কত তা জানা সম্ভব নয়। কারণ প্রাচীন একরত্নগুলির অধিকাংশই বিধ্বস্ত নয়ত বা সেগুলি ভগ্নদশায় পতিত। এছাড়া এ জেলার দক্ষিণাংশে একরত্ন মন্দিরের রত্নটি এমন বৃহদাকার পরিসরে নির্মাণ করা হয়েছে, যেন প্রথম দর্শনেই মনে হয় কোন রত্ন মন্দিরের বদলে শিখর মন্দির। এ ধরনের মন্দিরের দৃষ্টান্ত দেখা যায় হরিপুর, গোপালপুর, আলংগিরি ও মোহনপুর প্রভৃতি গ্রামে।

এ জেলায় একরত্ন অপেক্ষা পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন রীতির মন্দিরই নির্মিত হয়েছে সর্বাধিক। এর মধ্যে লিপিযুক্ত প্রাচীন দুটি পঞ্চরত্ন মন্দিরই ঘাটাল থানায় নবগ্রাম ও রাধানগরে অবস্থিত। সতের শতকে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রকোণার পাথরের নবরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে বিধ্বস্ত হলেও সেটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে এ মন্দিরটির স্থাপয়িতা ও প্রতিষ্ঠা তারিখ জানা যায়।

রত্ন মন্দিরের মধ্যে পরবর্তী তের রত্ন রীতির মন্দিরের নিদর্শন এ জেলায় খুবই কম এবং উদাহরণ হিসাবে রামগড় ও উদয়গঞ্জের মন্দিরের কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া সতের রত্ন মন্দিরের একটিমাত্র নিদর্শন হল চন্দ্রকোণার রঘুনাথপুরের পার্বতীনাথ শিব মন্দির।

বাংলা মন্দির শৈলীর সাধারণ আর এক রূপ হল দালান রীতির মন্দির। সামনে স্তম্ভের উপর অলিন্দ সমেত সমতল ছাদযুক্ত আয়তাকার বা বর্গাকার ধরনের মন্দির গুপ্তযুগেও (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে) যে প্রচলিত ছিল তার নিদর্শন দেখা যায় সাঁচীতে। পশ্চিমবাংলায় তথা মেদিনীপুর জেলাতেও এ জাতীয় সামনে খিলানযুক্ত অলিন্দসমেত সমতল ছাদের অসংখ্য দেবালয় দেখা যায়। এ রীতির মন্দির যে সাধারণভাবে 'দালান' রীতির মন্দির নামে পরিচিত ছিল, তা বাঁকুড়া জেলার ভগলপুর গ্রামের মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিতে (দ্র : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, ২য় সংস্করণ, পৃ: ১০০) এবং এ জেলার জাড়া গ্রামের এক মন্দিরলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। অন্যদিকে স্নানের ঘাটে চারদিক খোলা শুধুমাত্র থামের উপর স্থাপিত সমতল ছাদযুক্ত ইমারতগুলিকে সাধারণভাবে 'চাঁদনি' বলা হয়ে থাকে এবং যেজন্য এই ধরনের *দেওয়ালবিহীন শুধুমাত্র থামযুক্ত 'চাঁদনী' আঁটা প্রশস্ত চক বা বাজার নানাস্থানে চাঁদনীচক* নামেও অভিহিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত নাটমন্দিরগুলিকেও যে 'চাঁদনী-মণ্ডপ' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল, তারও কিছু কিছু লিপি সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

শুধুমাত্র একতলা দালান রীতির মন্দিরই যে এ জেলায় নির্মিত হয়েছে এমন নয়, দোতলা দালান মন্দিরও যে এ জেলার উত্তর-পূর্বাংশে সমাদৃত হয়েছিল তার প্রমাণ হল,

নতুক জয়কৃষ্ণপুর, মনোহরপুর ও কাটান গ্রামের মন্দির। শেষোক্ত মন্দিরটিতে পোড়ামাটির উৎকৃষ্ট অলঙ্করণ-সজ্জা বিদ্যমান। এছাড়া, মেদিনীপুর জেলায় মন্দির স্থাপত্য বিষয়ে দালান মন্দিরের সঙ্গে আটচালা, পঞ্চরত্ন ও শিখর মন্দির সংস্থাপন করে এক অভিনব স্থাপত্যের রূপ দেওয়া হয়েছে। গড়ময়না, পিংলা, ঈশ্বরপুর, পাইকভেড়ী ও বসন্তপুর প্রভৃতি স্থানের পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যান্য জেলাগুলির মতই এ জেলায় আটকোণা ন'চূড়াযুক্ত রাসমঞ্চও নির্মিত হয়েছে বহুল পরিমাণে। কতকগুলি স্থানে রাসমঞ্চের চূড়া শিখর-দেউলাকৃতি না হয়ে 'রসুন'-এর মত আকৃতিসদৃশ হওয়ায় সেগুলিকে 'রসুনচূড়া' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রথাগতভাবে ন'চূড়া রাসমঞ্চ ছাড়াও সতের চূড়া ও পঁচিশ চূড়া রাসমঞ্চও দেখা যায়। অন্যদিকে দাসপুর থানা এলাকার গোপালপুর ও ডিহিবলিহারপুর গ্রামের রাসমঞ্চ দুটি প্রথাগত না হয়ে সেগুলি নবরত্ন মন্দির সদৃশ দেখা যায়। এছাড়া প্রায় আধ মিটার থেকে এক মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট পোড়ামাটির বিভিন্ন বাদিকা ও দ্বারপালের মূর্তি এইসব রাসমঞ্চে নিবদ্ধ ছাড়াও, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ পোড়ামাটির অলঙ্করণও দেখা যায়। এই ধরনের তিনটি রাসমঞ্চের উদাহরণ হল, মাংলোই, চাউলি এবং ক্ষীরাটি। এছাড়া পঞ্চরত্ন রীতির চারদিক খোলা তুলসীমঞ্চের উদাহরণ দেখা যায় ঘাটাল-গম্ভীরনগর এবং হুসেনীবাজার প্রভৃতি স্থানে।

এ জেলায় বেশ কিছু মন্দির-দেবালয়ের বহিরঙ্গ সজ্জায় 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে মন্দিরের শুধু সামনের দেওয়ালই নয়, মন্দিরের দুপাশে এবং গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দেওয়ালেও 'টেরাকোটা'-সজ্জা দেখা যায়। দাঁতন থানা এলাকার দামোদরপুর গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্রের শিখর মন্দিরের ভিত্তিবেদীতে বৃহদাকার পোড়ামাটির ফলক সংস্থাপন একান্তই অভিনব এবং সেটি পাল-সেন আমলের পাহাড়পুর বিহারের ভিত্তিগাত্রে অনুরূপ পোড়ামাটির অলঙ্করণ বিন্যাসের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। মেদিনীপুর জেলার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকসজ্জার প্রধান বিষয়বস্তু হল, কৃষ্ণলীলা, বিষ্ণুর দশাবতার ও রাম রাবণের যুদ্ধ দৃশ্যসহ নানাবিধ পৌরাণিক কাহিনী। সেকালের সাধারণ মানুষের ও মন্দিরের পরিচালক মোহন্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার চিত্র, সমকালীন ফিরিঙ্গী জীবনচিত্র, ধনী ভূস্বামীদের বিলাসবহুল জীবনের ভাস্কর্য, মিথুন দৃশ্য, ফুলকারি ও জ্যামিতিক নকশাও এইসব পোড়ামাটির ফলকে স্থান পেয়েছে।

পোড়ামাটির অলঙ্করণের সঙ্গে পঙ্খের অলঙ্করণও এ জেলায় ব্যবহৃত হয়েছে বহুল পরিমাণে। একই মন্দিরে পোড়ামাটি ও পঙ্খের যুগপৎ ব্যবহারের নিদর্শনও এ জেলায় বহু মন্দিরে দেখা যায় এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি মন্দির হল, তিলন্তপাড়া এবং আনন্দপুর।

পোড়ামাটির অলঙ্করণসদৃশ কাঠখোদাইয়ের কাজেও সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন এ জেলার শিল্পী-স্থপতিরা। এসব কাঠের ভাস্কর্যের নিদর্শন বেশিরভাগ দেখা যায় মন্দিরে নিবদ্ধ কাঠের দরজার পাল্লায় ও চৌকাঠে। এছাড়া রামগড়ের আটচালায় কাঠের খুঁটি ও কাঠামোয় যে ভাস্কর্য-অলঙ্করণ দেখা যায় তা একান্তই উল্লেখযোগ্য।

ইতিপূর্বে যে মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং দারুতক্ষণশিল্পের উল্লেখ করা হল, সেগুলির স্থপতি ও কারিগরদের সম্পর্কেও বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে। সে সব লিপিতে এইসব শিল্পীদের নাম ও নিবাস উল্লিখিত

হওয়ায় তাঁদের কেন্দ্রীভূত বাসস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। দেখা গেছে এসব শিল্পীগোষ্ঠী নিজেদের 'সূত্রধর' অথবা 'মিস্ত্রী' বা 'কারিকর' বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং বহুক্ষেত্রে তাঁদের পদবী চন্দ্র, দে, শীল, দাস, সাঁই ও কুণ্ডু প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। এইসব মন্দিরের উৎসর্গলিপিতে তাঁদের নিবাস সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যায় তাঁরা সাধারণতঃ এ জেলার দাসপুর, রাজহাটি, তোড়াপাড়া, নির্মলবাজার, বরদা, কলমীজোড়, গৌরা, আজুড়িয়া, হবিবপুর, ক্ষীরপাই ও চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করতেন। একসময় এ জেলার ঘাটাল মহকুমার বেশ কিছু অংশ হুগলী জেলার অধীনে থাকায়, সেখানকার সেনহাটি, খানাকুল, ঘোসপুর প্রভৃতি স্থান থেকে আগত মন্দির স্থপতিরাও এ জেলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন। অনুরূপ, পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এলাকার এমন বহু শিল্পীও এ জেলার মন্দির তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছেন। দাসপুরের বিখ্যাত মন্দির স্থপতিদের মধ্যে ঠাকুরদাস শীল এ জেলায় মোট পাঁচটি, হরহরি চন্দ্র, বৃন্দাবন চন্দ্র, আনন্দ মিস্ত্রী প্রত্যেকে দুটি করে মন্দির নির্মাণ করেছেন বলে প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা গেছে। এছাড়া এ জেলায় সেনহাটের মাহিন্দ মিস্ত্রী তিনটি ও তিনকড়ি মিস্ত্রী দুটি মন্দির যে নির্মান করেছেন তার লিপি প্রমাণ বিদ্যমান। অন্যদিকে পাথরের মন্দির-নির্মাণ কারিগর হিসাবে পাত্র পদবীধারী যে শিল্পীর পরিচয় মারকুণ্ডা ও বনপাটনা গ্রামের মন্দিরলিপিতে পাওয়া যায়, তাঁর নিবাসের কোন উল্লেখ অবশ্য পাওয়া যায় না।

এ জেলার মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতিষ্ঠিত বহু মসজিদ, ইদগা, দরগা ও মাজার দেখা যায় এবং পুরাকীর্তি হিসাবে সেগুলিও বেশ উল্লেখযোগ্য। তবে 'টেরাকোটা'-সজ্জা সমন্বিত কোন মসজিদ এ জেলায় দেখা না গেলেও সতের শতকে ইঁট ও মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি মসজিদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ জেলার কেরানীটোলায় রোমান ক্যাথলিকদের গীর্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে চার্চ অফ্ ইংলণ্ডের উদ্যোগে 'সেণ্ট জনস চার্চ' গীর্জাটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর রেল স্টেশনের নিকটবর্তী সেকপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী উনিশ শতকের শেষদিকে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্প্রদায়ের গীর্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয় আবাসগড়ে।

পরবর্তী অধ্যায়ে মেদিনীপুরের যাবতীয় পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তু তাদের অবস্থান অনুযায়ী 'পুরাকীর্তি পরিচিতি' প্রসঙ্গে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

পুরাকীর্তি পরিচিতি

অমর্ষি-কসবা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা স্টেশন থেকে বাজকুল হয়ে মেছেদা-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পটাশপুর থানার অন্তর্গত অমর্ষি-কসবা গ্রাম (জে· এল· নং ১৩৪)। পীর খাজা মখদুম শিহাবুদ্দিন চিসতি সাহেবের মাজার ও একটি তিন গম্বুজ মসজিদ এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এখানের এ মসজিদটি যে খ্রীষ্টীয় সতের শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় মসজিদগাত্রে নিবদ্ধ এক ফার্সী প্রতিষ্ঠালিপি থেকে। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৪৯′ (১৪·৯ মি·), প্রস্থে ১৯′ (৫·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)। আলোচ্য মখদুম পীর সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এখানকার খাদিমদের মতে, অতীতে এই এলাকায় অমর সিংহ নামে এক দাম্ভিক নৃপতি ছিলেন এবং কোন এক সময়ে প্রচলিত নিয়মভঙ্গের দায়ে সাক্ষাৎপ্রার্থী পীর মখদুম সাহেবের শিরচ্ছেদের আদেশ দেন। কিন্তু পীর সাহেব সম্মুখসমরে রাজাকে পরাজিত করে তার সমগ্র রাজ্য অধিকার করেন। অবশ্য কিংবদন্তী যাই হোক না কেন, অমর সিংহের নামেই যে এলাকার নাম অপভ্রংশে অমর্ষি হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজও এই বিখ্যাত পীর সাহেবের আস্তানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ফুল, সিন্নি ও প্রদীপ নিবেদন করে থাকেন।

অযোধ্যা : দ্রষ্টব্য 'চন্দ্রকোণা।'

অযোধ্যাবাড় : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-তাবাগেড়িয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা হয়ে তাবাগেড়িয়া ; সেখান থেকে কাঁসাই নদীর বাঁধ ধরে পশ্চিমে হাঁটাপথে সাত কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার অন্তর্গত অযোধ্যাবাড় গ্রাম (জে· এল· নং ৫২৯)। এখানে কাঁসাইয়ের শাখা নদীর ধারে চণ্ডীবুড়ি নামে উপাসিত লৌকিক দেবীর বিগ্রহটি যে দশ-এগারো শতকের কোন এক প্রাচীন লোকেশ্বর বিষ্ণু (বলরাম) বা পার্শ্বনাথের মূর্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব বেশি সিঁদুর লিপ্ত হওয়ায় মূর্তিটিকে সঠিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব নয়। বর্তমানে আলোচ্য এই দেবীর দুর্গার ধ্যানে পূজা হয় এবং শনি ও মঙ্গলবার মানসিক পূজা ছাড়া, দুর্গা-নবমীতে দেবীর কাছে পশুবলিও দেওয়া হয়ে থাকে।

অর্জুননগর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা স্টেশন থেকে মেছেদা-কাঁথি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কালীনগর; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ৬ কি· মি· দূরত্বে ভগবানপুর থানার অন্তর্গত অর্জুননগর গ্রাম (জে· এল· নং ২৯৯)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, মদনগোপালজীউর ইটের একটি শিখর-দেউল। জনশ্রুতি যে, মদনগোপালজীউর প্রতিষ্ঠাতা মাজনামুঠা রাজবংশের রাজা যাদবরাম হলেও, আলোচ্য মন্দিরটি কিন্তু নির্মাণ করেন তাঁরই পুত্রবধু রাণী সুগন্ধা। সুতরাং সে হিসেবে এবং আকারপ্রকারে প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি আঠার শতকের বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০′ (৬·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·)। একদুয়ারী

এ মন্দিরটির ভূমি থেকে বরণ্ড পর্যন্ত ইটের খাঁজকাটা অলঙ্করণ একান্তই অভিনব। কেননা অন্যত্র এই ধরনের শিখর মন্দিরে বরণ্ড থেকে বেকী পর্যন্ত উপরিভাগেই অনুরূপ অলঙ্করণ সংস্থাপিত দেখা যায়।

আগুইবনি : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর স্টেশন থেকে খড়্গপুর-বাঁকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গড়বেতা শহর। সেখান থেকে উত্তরে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার আগুইবনি গ্রাম (জে· এল· নং ৬১৫)। কয়েক বৎসর পূর্বে মৃত্তিকা খননের সময় এ গ্রাম থেকে প্রাগৈতিহাসিক কালের বেশ কিছু পুরাবস্তু (তাম্রায়ুধ সম্ভার) পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত সে সব বস্তুগুলি হল, একটি সস্কন্ধ তামার কুঠার, এগারোটি তামার বালা এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার তামার পাত (কুঠার তৈরীর জন্য)। পশ্চিমবাংলায় প্রাগৈতিহাসিক কালে তাম্রযুগীয় সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে এসব পুবাবস্তুগুলি যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমানে এসব দ্রব্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতাত্ত্বিক অধিকারের সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে।

আজুড়িয়া : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গৌরা; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে মোরাম রাস্তায় (রিক্সা চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন আজুড়িয়া গ্রাম (জে· এল· নং ১৬০)। এ গ্রামে 'চরণ' পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের নবরত্ন রীতির মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি পুবমুখী এবং ত্রিখিলানের উপরে কার্নিসের নিচে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৭৯৩ শকাব্দে নির্মিত। অতএব ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে যে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়, সেগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও লঙ্কাযুদ্ধ প্রভৃতি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০'৪" (৬·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·২ মি·)। মন্দিরটি অবিলম্বে সংরক্ষিত না হলে, এটির গায়ে উৎকীর্ণ উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলংকরণ-সজ্জাগুলি বিনষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি। মন্দিরটির কাছাকাছি স্থাপিত ন'চূড়া রাসমঞ্চটির প্রতি খিলানের স্তম্ভে যে বাদিকামূর্তিগুলি দেখা যায়, তা একান্তই মনোরম।

গ্রামের হাটপুকুরের নিকটবর্তী সাঁই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী মনসা মন্দিরটি দৃশ্যতঃ চারচালা রীতির হলেও, সেটিতে রথপগ সংযুক্ত হওয়ায় তা শিখর–দেউল হিসাবে গণ্য করা যায়। প্রায় ২৫' (৭·৬ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট, এ মন্দিরটির দেওয়ালে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং মন্দির দেওয়ালে একসারি করে যে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায় তার কারিগরি তেমন উৎকৃষ্ট নয়।

গ্রামের শীতলা মন্দিরটিও এক শিখর-দেউল এবং পুবমুখী সে মন্দিরটির বরণ্ডের উপরিভাগে সামান্য 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু, দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠাফলকবিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান করা যেতে পারে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭·৬ মি·)।

আঁতরা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাদপুর স্টেশন থেকে ক্যানেল বাঁধ ধরে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত আঁতরা গ্রাম (জে· এন· নং ৬০৯)। এ গ্রামের হাটপাড়ায় চন্দ্রেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী পঞ্চরথ শিখর দেউলটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। একদুয়ারী প্রবেশপথের উপরে পঙ্খের অলঙ্করণ-সজ্জার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ ছিল, তা বর্তমানে অস্পষ্ট হলেও স্থাপত্যবিচারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়। প্রায় ৫′ (১·৫ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ২০′ (৬·১ মি·) এবং মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়াল কোণে উদগত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

এছাড়া, গ্রামটির চতুর্দিকে অসংখ্য প্রাচীন মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ লক্ষ্য করা যায় এবং পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সেগুলি যে একান্তই প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ বিষয়ে আরও বিশদ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

আদলাবাদ : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা বা খড়্গপুর স্টেশন থেকে যথাক্রমে মেছেদা-এগরা বা খড়গপুর-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) এগরা; সেখান থেকে উত্তরপুবে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে এগরা থানার এলাকাধীন আদলাবাদ গ্রাম (জে· এল· নং ২৮)। এ গ্রামে রাধারমণের শিখর-দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মূল মন্দিরটির বরণ্ডের উপরিভাগ যেমন খাঁজকাটা অলঙ্করণযুক্ত, তেমনি সংলগ্ন তিনচালা জগমোহনটির ছাদও ঐভাবে খাঁজকাটা করে সজ্জিত। অবশ্য এই স্থাপত্যরীতির অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় এ জেলার মেদিনীপুর ও লোয়াদায়। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন দ্রষ্টব্য নেই। মূল মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৪৫′ (১৩·৭ মি·) এবং মন্দিরটির গর্ভগৃহ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০′ (৬·১ মি·) ও জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১৯′৯″ (৬·০ মি·) ও প্রস্থে ১১′৬″ (৩·৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় স্থাপত্য বিচারে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

আদাসিমলা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-দেহাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বড়চারা গ্রাম; সেখান থেকে পুবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার এলাকাধীন আদাসিমলা গ্রাম (জে· এল· নং ৩৩৪)। গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় কোন এক বিত্তশালী ভূঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রুদ্রেশ্বর শিবের পরিত্যক্ত একরত্ন মন্দিরটির স্থাপত্যরীতি একান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ মন্দিরটির উপরের অংশে শিখর-দেউল সদৃশ রত্নের আকারটি এতই বৃহৎ, যা প্রথম দর্শনে এটিকে রত্ন মন্দিরের বদলে কোন শিখর-দেউল বলেই ভ্রম হয়। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান করা যেতে পারে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৩′ (৪ মি·) এবং উচ্চতায় ২৩′ (৭·০ মি·)। একদুয়ারী প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির একটি মিথুন ফলক ছাড়া, রত্নটির চারদিকের দেওয়ালে পঙ্খ পলস্তারায় উৎকীর্ণ বাতায়নবর্তিনীর মূর্তি দেখা যায়।

আনন্দপুর : মেদিনীপুর-আনন্দপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশপুর থানার

এলাকাধীন আনন্দপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩৭৮)। একসময়ে তসর বস্ত্রশিল্পের দৌলতে সমৃদ্ধ এই গ্রামটিতে যেসব পুরাকীর্তির নিদর্শন দেখা যায়, তার মধ্যে স্থানীয় কুণ্ডু পরিবারের রাধামাধব ও রাজরাজেশ্বরের মাকড়াপাথরের তৈরি একরত্ন মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। পুবমুখী এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০'৬" (৬·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের শেষভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

গ্রামের হেটেলাপাড়ায় সরকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বিগত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হলেও, সেটির পোড়ামাটির অলঙ্করণ ও পঙ্খ সজ্জা একান্তই দর্শনীয়। আলোচ্য এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০·৬ মি·)।

মধ্যপাড়ায়, স্থানীয় বাগ পরিবারের স্থাপিত দামোদরের আরও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরের ত্রিখিলানের উপরে ও বাঁকানো কার্নিসে যে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু মূলতঃ কৃষ্ণলীলা ও রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে নিবদ্ধ দুটি প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১২৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং মন্দির নির্মাণে চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী রঘুনাথবাড়ি গ্রামের রাম মিস্ত্রী এবং কাছাকাছি ইলামবাজার গ্রামের ভক্তারাম দাস মিস্ত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া পুব ও দক্ষিণের প্রবেশপথে কাঠের দরজার পাল্লার উপরেও কৃষ্ণলীলা ও সাহেব-মেম বিষয়ক নানাবিধ দৃশ্য খোদিত দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭' (৫·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·০ মি·)।

আমড়াকুচি: মেদিনীপুর-কেশপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশপুর থানার এলাকাধীন আমড়াকুচি গ্রাম (জে· এল· নং ৪৩৪)। এ গ্রামে কামেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, এবং মন্দিরের মধ্যের চূড়াটি শিখর-দেউলের হুবহু অনুকরণ করে নির্মিত। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্যশৈলী নিরিখে এটি আনুমানিক উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। মন্দিরের গর্ভগৃহের সামনের ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত দালানটির ছাদ 'ভল্ট' করে নির্মিত এবং গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানের উপর স্থাপিত লহরানির্ভর গম্বুজ দিয়ে গঠিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮'৫" (৫·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

আমনপুর: কেশপুর হয়ে মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কুঁয়াপুর গ্রাম; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার এলাকাধীন আমনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১২৫)। এ গ্রামে একদা বিভিন্ন সময়ে যেসব মন্দির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দক্ষিণপাড়ায় বসু পরিবারের বুড়ো শিবের জগমোহনযুক্ত সপ্তরথ শিখর দেউল। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরটি মাকড়া পাথরের হলেও, এটির প্রবেশপথের দুপাশে ও বরণ্ডের নীচ বরাবর এক সারি করে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা রয়েছে, যার বিষয়বস্তু দশাবতার প্রভৃতি। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। মন্দিরের জগমোহনের ছাদটি 'ভল্ট' করে এবং

গর্ভগৃহের ছাদ লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। গর্ভগৃহটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১৮′ (৫·৫ মি·), প্রস্থে ৬′ (১·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৪′ (৪·২ মি·)। এই মন্দিরটির কাছাকাছি আলোচ্য বসু পরিবারের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি অবস্থিত। সে মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির সজ্জা থাকলেও কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে পাশাপাশি রাধাবল্লভের ন'চূড়াযুক্ত আটকোণা রাসমঞ্চটিতে যে উৎসর্গলিপিটি আছে, তা থেকে বেশ বোঝা যায় মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। রাসমঞ্চের লিপিটি নিম্নরূপ :

শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ চরণং / সেবাইত শ্রীগোপিমোহন দাস বসু/ শকাব্দা ১৭৫৫। ১২৪১ ষাল মিস্ত্রী / শ্রীহরিদাষ দত্ত সাং নেহড়পাড়া।"

অতএব ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ রাসমঞ্চটির মিস্ত্রী যে মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্তী নেহড়পাড়া গ্রাম থেকে এসেছিলেন তা এই লিপিফলকে উল্লিখিত হয়েছে।

এ রাসমঞ্চটির সামান্য পুবে স্থানীয় বসুদের প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি দক্ষিণমুখী জোড়া চারচালা মন্দির দেখা যায়। পশ্চিম পাশের মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে তা থেকে জানা যায় এদুটি মন্দিরই ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে গৌরদাস বৈরাগী মিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত। অতএব সে লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ চরণ পরায়ণ/ শ্রীব্রজমোহন দাস বষু/ সন ১২২৭ সাল মাহ জৈষ্টী/ মিস্ত্রি শ্রীগৌর দাস বৈরাগী/ সকাব্দ ১৭৪১ সতরস একচল্লীস।"

দুঃখের কথা, এ লিপিতে মন্দির দুটির স্থপতির নাম পাওয়া গেলেও, তাঁর নিবাস কিন্তু অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জগদীশ্বর শিবের পঞ্চরথ শিখর-মন্দিরটিতেও কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। পুবমুখী সে মন্দিরটি আকারপ্রকারে অবশ্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)। এ মন্দিরের কাছেই আলোচ্য ঐ পরিবারেরই প্রতিষ্ঠিত একটি রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ পাশাপাশি অবস্থিত। রাসমঞ্চে যে দুটি উৎসর্গলিপি আছে তার পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী৺	"পঃ শ্রীমহে
দধিপাব	শ চন্দ্র রায়
ন চন্দ্র জী	সন ১২৯৭
উ স্বহায়"	সাল সাঙ্গ
	সকাব্দা ১৮১২"।

এ গ্রামের মাঝপাড়ায় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের চারচালা মন্দিরটি মাকড়া পাথরের হলেও, সেটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ হয়েছে। এ মন্দিরটিও দৈর্ঘ্যে ১২′৯″ (৩·৯ মি·) প্রস্থে ১১′ ১০″ (৩·৬ মি·) এবং উচ্চতায় ১৪′ (৪·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে আকারপ্রকারে এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

আমনপুর গ্রামের উত্তরপাড়ায় যেসব মন্দির-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারমধ্যে পুরাকীর্তি হিসাবে স্থানীয় বক্‌সী পরিবারের দধিপাবনজীউর দক্ষিণমুখী চারচালা মন্দিরটি গণ্য হতে পারে। সে মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭′ (৫·২ মি·), প্রস্থে ১৮′ (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)। এ মন্দিরে কোন উৎসর্গলিপি নেই বটে, তবে স্থাপত্য বিচারে এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত। তবে উত্তরপাড়ায় রাস্তার ধারেই স্থাপিত ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত একটি সূর্যমূর্তি এগ্রামের এক উল্লেখযোগ্য পুরাসম্পদ এবং ভাস্কর্যবিচারে এটি খ্রীষ্টীয় দশ-এগারো শতকের প্রাচীন বলেই মনে হয়।

আমোদপুর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বসন্তপুর; সেখান থেকে উত্তরে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন আমোদপুর গ্রাম (জে এল নং ৩২২)। গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের পঞ্চরত্ন রীতির মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি পুবমুখী এবং এটির প্রবেশপথের দুপাশে ও কার্নিসে একসারি করে যে পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু হল দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা। ত্রিখিলানের উপর নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

এ মন্দিরের কিছুটা দক্ষিণে পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সীতারামজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটির সম্মুখভাগে বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায়। ত্রিখিলানের উপরে নিবদ্ধ দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকগুলি তেমন উৎকৃষ্ট না হলেও বেশ দর্শনীয়। কিন্তু এ মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকায়, আকার প্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় জানা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং মন্দিরটির কার্নিস বরাবর যে এক লাইন লিপি খোদাই রয়েছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "পরিচারক শ্রীগোপালকৃষ্ণ জানা শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ শ্রীরামপদ দে মিস্ত্রী সাং চেতুয়া দাসপুর।"

কিন্তু উল্লিখিত এ লিপিতে প্রতিষ্ঠাসনের কোন উল্লেখ নেই বটে, তবে স্থাপত্য নিরিখে এ মন্দিরটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

এ গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় ধর্মরাজের চারচালা মন্দিরটির স্থাপত্য বেশ অভিনিবেশযোগ্য। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরটির সামনে যে দোচালা রীতির জগমোহনটি ছিল বর্তমানে সেটি ভূপতিত হলেও, স্থাপত্যবিচারে আনুমানিক আঠার শতকের শেষ দিকে মন্দিরটি নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরের বিগ্রহ পাথরের কূর্মমূর্তি হলেও, এখানে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট এক ক্ষুদ্রাকার বুদ্ধমূর্তিও এইসঙ্গে পূজিত হতে দেখা যায়।

আলঙ্গিরী : 'আদলাবাদ' নিবন্ধে এগরা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে এগরা-মোহনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) এগরা থানার এলাকাধীন

আলঙ্গিরী গ্রাম (জে এল নং ৪৮)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজীউর পুবমুখী এক নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির অলঙ্করণসজ্জা, যাতে মূলতঃ কমলেকামিনী, কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্যাবলী রূপায়িত হয়েছে। মন্দির দেওয়ালে উৎকীর্ণ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, এটি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২৯′ (৮·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)। এ মন্দিরের কাছাকাছি রঘুনাথের আটকোণা রাসমঞ্চটিও একান্ত চিত্তাকর্ষক এবং এটির প্রতি কোণের থামে পোড়ামাটির ভাস্কর্যসজ্জা বিদ্যমান।

গ্রামের উত্তরে রাধাগোকুলানন্দজীউর পুবমুখী একরত্ন মন্দিরটিও এখানের এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি একরত্ন রীতির হলেও এটির সংলগ্ন আটচালা রীতির জগমোহনটি একান্তই অভিনব। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও এই বৈষ্ণব মঠের সেবাইতদের মতে, স্থানীয় ভূস্বামী নরহরি করমহাপাত্রের আনুকূল্যে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে মন্দিরটি নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭′৬″ (৫·৩ মি·) ও প্রস্থে ১৫′৬″ (৪·৭ মি·), জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ২১′ (৬·৪ মি), প্রস্থে ১৩′১০″ (৪·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৬′ (৮ মি·)।

গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে, ভৈরবনাথ শিবের দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটিও এক পুরাকীর্তি এবং আকারপ্রকারে এটিও উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন কষ্টিপাথরের ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে, যেটি আনুমানিক বারো-তের শতকের এক প্রাচীন পুরাবস্তুর নিদর্শন।

আলীশাগড়: বালীচক রেল স্টেশন থেকে বালীচক-ডেবরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার এলাকাধীন আলীশাগড় (জে এল নং ৩৪১)। এখানে বেশ উঁচু বিরাট এক মাটির প্রাচীর ঘেরা বিস্তৃত গড়ের ধ্বংসাবশেষই হল চলতি কথায় আলসেগড় অর্থাৎ আলীশাহের গড়। কথিত এই আলীশাহ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও, জনশ্রুতি যে, ডেবরা থানার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে শাহজী নামে যে মুসলমান ফকিরের আস্তানা ছিল, তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন এই আলীশাহ। অনুমান করা যায় যে, এই খ্যাতিমান ফকির শাহজীর নামেই সাহাপুর পরগণার নামকরণ হয়ে থাকবে। অতএব খ্রীষ্টীয় ষোল শতকেই শাহজী ও আলীশাহ যে বর্তমান ছিলেন তেমন ধারণা করা যেতে পারে। এখানকার এই আলীশাহের গড় সম্পর্কে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছেন, "আলিশার গড়টি আলি সাহ্ নামক জনৈক পরাক্রান্ত মুসলমান জমিদার কর্তৃক অনুমান প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামটির নাম আলিশা গ্রাম হয়। আলিসাহর কীর্তিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। গড়টির চতুর্দিকে যে পরিখা ও মৃত্তিকাস্তূপের প্রাচীর ছিল অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর হইল এই গড়ের অভ্যন্তরে পুষ্করিণী খননকালে একটি কূপ বাহির হয়। তন্মধ্য হইতে সম্রান্ত মুসলমানদিগের ব্যবহার্য কয়েকটি তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছিল।"

আলুই: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে ঘাটাল-পাঁশকুড়া পিচের সড়কে ঘাটাল হয়ে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) রাধানগর; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় শ্যামপুর হয়ে ৪ কিলোমিটার দূরত্বে আলুই গ্রাম (জে এল নং ৮৩)। এ গ্রামের উত্তরপাড়ায় রায় পরিবারের শ্রীধরজীউর পুবমুখী নবরত্ন মন্দিরটি যে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, তা ঐ মন্দির দেওয়ালে নিবদ্ধ নিম্নোক্ত লিপিফলক থেকে জানা যায়। সেটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রী৺ সিধর জিউ/ পরিচারক শ্রীমাধবচন্দ্র রায় সন/ ১২৮৭ সাল তাং ৩০ বৈশ্যাখ।"

মন্দিরটিতে দশাবতার ও পুত্রকন্যাসহ মহিষমর্দিনীর পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৪′ (৪·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)।

গ্রামের ভূঁঞা পাড়ায় ভূঁঞা পরিবারের পুবমুখী রাধাদামোদরের নবরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরেও যে সব পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলির বিষয়বস্তু হল, দশাবতার, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, রামসীতা ও দুর্গা প্রভৃতি। মন্দিরটিতে মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ এক সংস্কারলিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে পুবমুখী যে তিনটি আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে সর্ব উত্তরের মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির ফলকসজ্জা বর্তমান। এ মন্দিরটির উত্তর দেওয়ালে চুনবালির পলস্তারার উপর খোদিত লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রী মহাদে/ব সন ১২৭৪ সাল/ শ্রীরূপচাঁদ ভূঁঞে/ তাহার কিত্রি বড়দা প/রগণে জেলা হুগ্লি সাকি/ম আলোয়ে শ্রীগণেশ চ/ন্দ্র কুণ্ডু শ্রীমাহিন্দ্র / নাথ কুণ্ডু সাকি/ম সেনহাটি হুগ্লি।"

সুতরাং এ লিপি থেকে বেশ বোঝা যায়, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘাটাল থানার এলাকাধীন এ গ্রামটি বর্তমানে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হলেও, একসময়ে এটি হুগলী জেলার এলাকাধীন ছিল।

এ গ্রামের শিবতলায় শীতলানন্দ শিবের দক্ষিণমুখী মন্দিরটি সপ্তরথ শিখর রীতির এবং সে মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

ইন্দা: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর স্টেশন থেকে খড়্গপুর-মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর টাউন থানার এলাকাধীন ইন্দা (জে এল নং ২৩২)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি হল, খড়্গেশ্বর শিবের পুবমুখী জগমোহনযুক্ত সপ্তরথ শিখর মন্দির। জনশ্রুতি যে, এই খড়্গেশ্বর শিবের নামানুসারেই খড়্গপুরের নামকরণ হয়েছে। মন্দিরটি ঝামাপাথরের, কিন্তু মূল মন্দিরের উপরিভাগ বিধ্বস্ত হওয়ায় বর্তমানে সেটিকে অবৈজ্ঞানিকভাবে মেরামত করা হয়েছে। তবে পীঢ়ারীতির জগমোহনটির সাবেক আকৃতি মোটামুটি বজায় রয়েছে। মূল মন্দির ও জগমোহনের ছাদ লহরাযুক্ত চালা করেই নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় সতের শতকে নির্মিত বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

ইন্দ্রা : ঘাটাল-রামজীবনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শ্রীনগর; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ইন্দ্রা গ্রাম (জে এল নং ৩৩)। এ গ্রামের প্রধান সড়কটির পুব পাশে একটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দিরের পাশাপাশি অবস্থিত মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের একটি ইদগা অভিনব পুরাকীর্তি বলেই গণ্য হতে পারে। আকারপ্রকারে আলোচ্য মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এবং ইদগাটি তারও অনেক পরে নির্মিত বলেই মনে হয়। সেকালে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি যে বজায় ছিল, তার নিদর্শন হল পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত এই দুই পুরাকীর্তি।

ইয়াকুবপুর : 'আলুই' নিবন্ধে ঘাটাল পৌঁছবার পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে রাধানগর হয়ে দক্ষিণে মোরাম রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার অন্তর্গত ইয়াকুবপুর গ্রাম (জে এল নং ৮০)। প্রধান পথের উপরেই প্রতিষ্ঠিত শিবের সপ্তরথ শিখর এবং পাশাপাশি শীতলার দালান মন্দির দুটি এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। দুটি মন্দিরই দক্ষিণমুখী এবং এ মন্দিরগুলিতে তেমন কোন ভাস্কর্য-অলংকরণ না থাকলেও, শীতলা মন্দিরে নিবদ্ধ কাঠের কপাটটিতে উৎকীর্ণ খোদাই কাজ একান্তই মনোরম। কপাটের পাল্লায় কাঠের এই ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হল কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ ও শিবদুর্গা প্রভৃতি। মন্দির দুটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, গঠনশৈলী অনুযায়ী এগুলি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় পাড়ুই পরিবারের শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও একান্ত উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটিতে সামান্য কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক ছাড়াও, বেশ কিছু পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ দেখা যায়। তাছাড়া, এ মন্দিরটির দরজার কাঠের পাল্লাতেও যে কাঠ খোদাইয়ের নিদর্শন রয়েছে, তার বিষয়বস্তু হল, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণকালী ও যুদ্ধরত রাম-লক্ষ্মণ ও রাবণ প্রভৃতি। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক সংস্কারলিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির ত্রিখিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' করে এবং গর্ভগৃহের ছাদ লহরানির্ভর গম্বুজ করে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৩′ (৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে পান পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী দালান মন্দিরটিতেও বেশ কিছু পোড়ামাটির সজ্জা দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু হল মূলতঃ কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত বিবিধ দৃশ্য। লিপিফলকবিহীন, এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরটির সমসাময়িক এবং দৈর্ঘ্যে ১৪′ (৪·৩ মি·) প্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

গ্রামের পশ্চিমসীমায় ঘোষ পরিবারের গৃহদেবতার দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও, সেটির বাঁকানো কার্নিসে বন্দুক হাতে সাহেব এবং পাগড়ী পরিহিত ঢালতলোয়ারধারীর ক্ষুদ্রাকার পোড়ামাটির একই ধরনের মূর্তির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। মন্দিরটির ত্রিখিলান দালানের ছাদ 'ভল্ট' করে এবং গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলনার উপর সংস্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

ঈশ্বরপুর: 'ইয়াকুবপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দক্ষিণে আরও ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন ঈশ্বরপুর গ্রাম (জে এল নং ৮৭)। এ গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি হল, স্থানীয় ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর মন্দির। পুবমুখী এক দালান-মন্দিরের উপর স্থাপিত পঞ্চরত্ন রীতির এ মন্দিরটি এক অভিনব পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালের কার্নিসের নীচে ও দুপাশে খাড়াভাবে একসারি করে দশাবতার, গৌর-নিতাই, পুত্র কন্যাসহ দুর্গা প্রভৃতির পোড়ামাটির ফলকসজ্জা রয়েছে। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ ক্ষয়িত প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ:

"শ্রী৬ শ্রীধর জিউ / সন ১২৭..."। সুতরাং মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২০′ (৬·১ মি·), প্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)।

উড়িয়াশাই: ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রোড পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গুয়েদহ; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার এলাকাধীন উড়িয়াশাই গ্রাম (জে এল নং ৬৯৪)। এ গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি হল, দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের এক পরিত্যক্ত মন্দির, যা সংস্কারের অভাবে বর্তমানে ভগ্নদশায় পতিত হয়েছে। বর্তমান আকারপ্রকার দেখে অনুমান করা যায় যে, সেটি একরত্ন রীতির এক দেবালয় ছিল। পুব দেওয়ালে যে উৎসর্গলিপিটি নিবদ্ধ রয়েছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ পদারবিন্দে/ শ্রীমান্ মুদা দুর্জন সিংহ ভূপঃ। রসগ্রহাঙ্কে মিত মল্লবর্ষে/ ন্যবেদয়ত সৌধমিদং সুচারু / ৯৯৬ ॥"

সুতরাং এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, ৯৯৬ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন নৃপতি দুর্জন সিংহ, যিনি মল্লভূম বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত মদনমোহন মন্দিরটিরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

উত্তর গোবিন্দনগর: পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গঙ্গামাড়ো; সেখান থেকে পশ্চিমে মোহনখালি খালের বাঁধ রাস্তায় প্রায় ১ ½ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার অন্তর্গত উত্তর গোবিন্দনগর গ্রাম (জে এল নং ১৬৪)। এখানে খালের বাঁধের গায়ে ভুবনেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ হয়েছে মনোরম পোড়ামাটির ফলক, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ কৃষ্ণলীলা ও রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য প্রভৃতি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রী ভুবনেশ্বর/ দেবাদিদেব মহাদেব/ সকাব্দা ১৭৭২ সন ১২৫৭ সাল/ তাং ২১ ভাদ্র মিস্ত্রি শ্রীআনন্দ/রাম দাস সাং দাসপুর।"

অতএব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)।

এ গ্রামের ভূঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞেশ্বর শিবের সপ্তরথ শিখর-দেউল এবং পাশাপাশি দামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দির দুটিও পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। দুটি মন্দিরই পুবমুখী। একদুয়ারী শিখর মন্দিরটিতে যে উৎসর্গলিপিটি উৎকীর্ণ রয়েছে সেটির

পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী ॅ দেবাদিদেব মহাদেব সকাব্দা/ ১৭৮৮ সন ১২৭৩ সাল তাং ২১ জোষ্ঠ মিস্ত্রি শ্রীশ্রীহরি দাষ।"

পার্শ্ববর্তী দামোদরের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি অবশ্য পূর্বোক্ত মন্দির অপেক্ষা কিছু প্রাচীন। সেটি যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত তা ঐ মন্দির দেওয়ালে নিবদ্ধ এক লিপি ফলক থেকে জানা যায়। তবে এ মন্দিরটিতে তেমন কোন ভাস্কর্য-অলঙ্করণ নেই।

গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় চক্রবর্তী পরিবারের পার্বতীনাথ ও রঘুনাথের সপ্তরথ শিখর মন্দিরটিও শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং সেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′ (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

উত্তর ধানখাল : 'উত্তর গোবিন্দনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে পশ্চিমে তেমোহানীর ঘাট পেরিয়ে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন উত্তর ধানখাল গ্রাম (জে এল নং ১২৩)। এ গ্রামের মাড়োতলায় দক্ষিণমুখী শীতলার পঞ্চরত্ন এবং পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত শিবের আটচালা মন্দির দুটি এক পুরাকীর্তি। শীতলার মন্দিরটিতে শিবদুর্গা এবং দশাবতারের মূর্তিযুক্ত সামান্য কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ হয়েছে এবং এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ ৪″ (৪·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৪′ (৪·২ মি·)। পাশাপাশি অলঙ্করণবিহীন শিবের মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৪′ (৪·২ মি·)। শিব ও শীতলার মধ্যবর্তী স্থানে শিবের যে ভোগঘরটি নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে পঙ্খ পলস্তারায় উৎকীর্ণ লিপিফলকটির পাঠ নিম্নরূপ :

"সঃ বার/ ১২৯৬ সাল/ শ্রীপঞ্চারাম মিস্ত্রী সাং নির্মল বা/ জার পরগণে বরদা তারিক/ ৩ বৈসাগ ভোগশা/ লা সমাপ্ত ইতি।"

অতএব বরদার নিকটবর্তী নির্মলবাজারেও যে মন্দিরনির্মাণ কারিগরদের বসবাস ছিল, এ লিপিটি তার স্বপক্ষে প্রমাণ।

এ গ্রামের দক্ষিণে ভুঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের একটি দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরও এখানকার এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপর পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও, মন্দিরটির গর্ভগৃহে প্রবেশপথে নিবদ্ধ কাঠের দরজাটির উপর সুন্দর কাঠ খোদাইয়ের কাজ দেখা যায়। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ ৪″ (৪·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৮·২ মি·)।

উদয়গঞ্জ : 'আলুই' নিবন্ধে ঘাটাল পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে উত্তরে ঘাটাল-খড়ার পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) উদয়গঞ্জ (জে এল নং ৪৭)। এখানের মাজি পাড়ায় মাজি পরিবারের প্রাতিষ্ঠিত সীতারামের পুবমুখী তেররত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও, মন্দিরের কপাটের পাল্লায় কাঠ-খোদাইয়ের কাজও দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় আন্দাজ ৪৩′ (১৩·১ মি·)। এ মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপি দেখা যায় সেটির পাঠ নিম্নরূপ :

"৭ শ্রীশ্রীসীতা/রাম জিউ শকাব্দা/ ১৭৮৬।১১।২৪ শ্রী ব্রজলাল মাজি সাং/ উদয়গঞ্জ পঃ বরদা গঠনকারী শ্রী/কার্ত্তিক চন্দ্র মিস্ত্রী ও শ্রী মাহিন্দনাথ/মিস্ত্রী সাং সেনহাট পঃ জাহানা/বাদ সন ১২৭১ সাল তাং/২৪ চৈত্রী।"

অতএব ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির শিল্পী-স্থপতিরা যে জাহানাবাদ পরগণার সেনহাট থেকে এসেছিলেন, তা এই প্রতিষ্ঠালিপি থেকে বেশ বোঝা যায়।

গ্রামের মল্লিকপাড়ায় সাঁতরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরনাথজীউর দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ থাকলেও কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের মতে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত। এ মন্দিরটিও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′৬″ (৪·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

উদয়গঞ্জের লাগোয়া কৃষ্ণপুর পল্লীতে স্থানীয় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী দধিপাবনজীউর নবরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটিতে যে সামান্য 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা। প্রবেশপথের উপরে কার্নিসে নিবদ্ধ কালো পাথরের উপর খোদিত এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনহাটির মাহিন্দ্র মিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরটির পুবগায়ে লাগোয়া আরও একটি দক্ষিণমুখী পঞ্চরথ শিখর-দেউল দেখা যায়। অলঙ্করণবিহীন এক দুয়ারী এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, এটিও পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে জানা যায়। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৭′ (২·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

এছাড়া কৃষ্ণপুর পল্লীতে হাজরা পরিরারের প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনীর পঞ্চরত্ন ও শিবের শিখর দেউল, দক্ষিণমুখী এ দুটি মন্দিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে সামান্য কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণসজ্জা দেখা যায় এবং সেটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। পাশের শিখর দেউলটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, এই মন্দিরটিও পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলেই মনে হয়।

এগরা : 'আদলাবাদ' নিবন্ধে এগরা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এগরা থানার এলাকাধীন সদর, কসবা-এগরা মৌজাভুক্ত (জে এল নং ২৩) এগরা শহরের বিখ্যাত পুরাকীর্তি হল হটনাগর শিবের পশ্চিমমুখী ইটের মন্দির। মন্দিরটি ওড়িশা শৈলীর পীঢ়া জগমোহনযুক্ত সপ্তরথ শিখর-দেউল। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১′ (৬·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৩′ (৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। দুটিরই ছাদ লহরাযুক্ত চারচালার উপর ন্যস্ত। এছাড়া জগমোহনের ও গর্ভগৃহে প্রবেশপথের খিলানগুলিও লহরাযুক্ত। জনশ্রুতি যে, ওড়িশা নৃপতি মুকুন্দদেব এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। অন্যমতে, এটি মহাপাত্র পদবীধারী কোন সামন্ত ভূস্বামীর দ্বারা নির্মিত। তবে মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যে জনশ্রুতিই প্রচলিত থাকুক না কেন, এ মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ গৌরীপট্টের মধ্যস্থলে

এক গহ্বরের মধ্যে স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গটি অবস্থান করলেও মন্দির দেওয়ালের এক কুলঙ্গিতে স্থাপিত ব্রোঞ্জ নির্মিত দণ্ডায়মান এক শিবমূর্তি এবং তৎসহ চতুর্ভুজা এক দুর্গামূর্তিও দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরের প্রবেশপথে রক্ষিত দুটি প্রস্তর স্তম্ভ এবং তৎসহ বিষ্ণু, মকরবাহিত গঙ্গা, কার্তিকেয়, গণেশ ও মহাদেবের পাথরের মূর্তিগুলির ভাস্কর্যশৈলী পাল-সেন আমলের মূর্তি-ভাস্কর্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নাটমণ্ডপটির সন্নিকটে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী একটি বিষ্ণু মূর্তি, হস্তীপৃষ্ঠে আসীন কোন এক দেবীমূর্তি এবং আরও দু'একটি অজ্ঞাতপরিচয় প্রস্তরমূর্তিও দেখা যায়, যা প্রত্নতত্ত্বের বিচারে একান্তই গুরুত্বপূর্ণ।

মন্দির প্রাঙ্গণে স্থাপিত ইটের তৈরি রাসমঞ্চটির স্থাপত্যশৈলীও একান্ত অভিনব। মন্দিরটির পিছনে 'কুণ্ড' নামক জলাশয়টির ইটের তৈরি সোপানগুলিও বেশ প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়।

এরাপুর: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাউর স্টেশন থেকে পুবে হাঁটাপথে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন এরাপুর গ্রাম (জে এল নং ১৩৩)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, স্থানীয় বিখ্যাত সাধক বাকসিদ্ধ রামানন্দ গোস্বামীর সমাধি মন্দির। মন্দিরটি দোচালা রীতির জগমোহনযুক্ত পশ্চিমমুখী ত্রিরথ এক শিখর দেউল। এটির প্রবেশপথের দুপাশে পোড়ামাটির তৈরী ঢাল-তলোয়ারধারী টুপি পরিহিত দুজন দ্বারপালের মূর্তি এবং উত্তর দেওয়ালে পোড়ামাটির দুটি নারীমূর্তি ছাড়া এ মন্দিরে আর কোন অলঙ্করণ নেই। প্রায় ৫′ (১½ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′৫″ (২·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১০′ (৩·১ মি·) ও প্রস্থে ৪′৩″ (১·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)। কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে গ্রামবৃদ্ধদের মতে এবং মন্দিরটির স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

এরেটি: ঘাটাল-পাঁশকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেলেঘাটা; সেখান থেকে পুবে কাঁচারাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন কলাগেছা মৌজাভুক্ত (জে এল নং ২০৫) এরেটি গ্রাম। এ গ্রামে মান্না পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনবিহারীজীউর দক্ষিণমুখী দালান মন্দির ও একটি নবরত্ন রাসমঞ্চ এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। দালান মন্দিরটিতে তেমন কোন অলঙ্করণ-সজ্জা না থাকলেও, রাসমঞ্চটির প্রতি খিলানের স্তম্ভে বিভিন্ন বাদিকার যে পোড়ামাটির মূর্তিগুলি দেখা যায় তার ভাস্কর্যশৈলী অতীব মনোরম। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ রাসমঞ্চটির ভাস্কর্যশৈলী দেখে অনুমান করা যায় যে, এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে।

ওড়গোঁদা: ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বিনপুর থানার এলাকাধীন ওড়গোঁদা গ্রাম (জে এল নং ২৩৪)। এ সড়কটির লাগোয়া পুবপাশে ভৈরব থান নামক স্থানে মাকড়াপাথরের তৈরী একটি ভিত্তিবেদী দেখা যায়। প্রায় ৪′৬″ (১·৩ মি·) উঁচু এই ভিত্তিবেদীটি ত্রিরথ আকারের এবং দক্ষিণে সিঁড়ির ধাপ থাকায়, মনে হয় অতীতে দক্ষিণমুখী কোন দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভৈরবথানের এই ভিত্তিবেদীটির

উপর আটটি স্তম্ভের চিহ্ন বর্তমান থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে, এখানকার এই মন্দিরের মূল গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শ্বে হয়ত কোন প্রদক্ষিণপথের অস্তিত্ব ছিল।

আলোচ্য ভৈরবথানের দক্ষিণেও সমউচ্চতাসম্পন্ন অনুরূপ মাকড়া পাথরের আর একটি ত্রিরথ ভিত্তিবেদী দেখা যায়। এটির পশ্চিমদিকে সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকায় অনুমান যে, এটিরও পশ্চিমে প্রবেশপথ ছিল। স্থানীয়ভাবে এ ভিত্তিবেদীটিকে লৌকিক দেবী রঙ্কিনীর থান বলা হলেও, পূর্বোক্ত মন্দিরস্থাপত্যের মতই এটিও যে এক দেবালয় ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সড়কের পশ্চিমদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সব প্রাচীন পুরাবস্তুর অংশবিশেষ দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল, ৪′ (১·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট পাথরের একটি বৃষ এবং বিভিন্ন মাপের সাতটি মাকড়া পাথরের আমলক শিলা। সুতরাং এসব প্রত্নবস্তুগুলি দেখে অনুমান করা যায়, এখানে হয়ত জগমোহনসহ আরও তিন-চারটি শিখর-মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। এছাড়া এখানে ১০′৬″ (৩·২ মি·) দৈর্ঘ্যপ্রস্থ বিশিষ্ট মাকড়া পাথরের এক মন্দিরের ভগ্ন দেওয়াল ও পাথরের একটি গৌরীপট্ট দেখে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অতীতে এ স্থানটি হয়ত এক বিখ্যাত শৈব কেন্দ্র ছিল।

আলোচ্য এই প্রত্নস্থলটির দক্ষিণে শিলদার ভূস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী একটি আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটিতে দুটি বৃহদাকার পোড়ামাটির দ্বারপালের মূর্তি ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ (৩·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে।

কঁয়তা: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-দেহাটি-সবং পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) তেমাথানী; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে মদনমোহনচক হয়ে উত্তরে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ১½ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন কঁয়তা গ্রাম (জে এল নং ৬১৫)। এখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে দে পরিবারের রঘুনাথজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিই প্রধান। মন্দিরটির খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির অলঙ্করণসজ্জা, যার বিষয়বস্তু হল, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কাহিনী। মন্দিরটির পশ্চিম দেওয়ালে একটি মিথুন ফলকও দেখা যায়। কার্নিসের নিচে 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ চার লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"সুভমস্তু/সকাব্দা/১৭২৬/সন ১২১১ সাল।"

অতএব ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭″ (৮·২ মি·)।

গ্রামের রাউতপাড়ায় দাস পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও, সেটি যে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, তা সে মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′৭″ (৩·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

করকাই: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-ময়না পিচের সড়কে

(নিয়মিত বাস চলে) পিংলা ডাকবাংলো হয়ে দক্ষিণে ৪ কিলোমিটার দূরত্বে পিংলা থানার এলাকাধীন করকাই গ্রাম (জে এল নং ১৩৮)। এ গ্রাম বসু পরিবারের লক্ষ্মীবরাহের দক্ষিণমুখী ইটের নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে পোড়ামাটির ভাস্কর্যসজ্জা, যার বিষয়বস্তু হল লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা। পশ্চিম দেওয়ালে নিবদ্ধ একটি পশ্বাচার মিথুনফলক একান্তই অভিনব বলা চলে। কার্নিসের নিচে সংস্থাপিত পোড়ামাটির এক ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রী লক্ষ্মিবরাহ জীউ/ষুভমস্তু সকাব্দা ১৭৮৯/সন ১২৭৪ সাল তাং ১৩/মাঘ মীস্ত্রি হরিচরণ/দাস সাং দাসপুর মিস্ত্রি।"

অতএব ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭'৯" (৫·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

কর্ণগড়: মেদিনীপুর-গড়বেতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ভাদুতলা; সেখান থেকে পুবে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে শালবনী থানার অন্তর্গত কর্ণগড় গ্রাম (জে এল নং ৫২৪)। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, কর্ণগড়রাজ প্রতিষ্ঠিত দণ্ডেশ্বর শিব ও দেবী মহামায়ার মাকড়া পাথরের ওড়িশা শৈলীর পীঢ়ারীতির জগমোহনযুক্ত শিখরদেউল। মন্দির দুটি পশ্চিমমুখী এবং পুব-পশ্চিমে প্রবেশপথযুক্ত এক বর্গাকার প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। পশ্চিমের প্রবেশদ্বারটিকে বলা হয় যোগীখোপ, যার স্থাপত্য একান্তই অভিনব। পুবের প্রবেশদ্বারটি দ্বিতল হলেও, সেটির উপরের অংশ বিধ্বস্ত এবং একসময়ে এটি নহবৎখানা হিসাবে ব্যবহৃত হত বলে জানা গেছে। প্রাচীর ঘেরা অঙ্গনের উত্তরপাশে অবস্থিত দণ্ডেশ্বর শিবের মূল মন্দিরটি একাদশ রথ শিখর রীতির, যা দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০'৬" (৬·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৮ মি·); সঙ্গের লাগোয়া জগমোহনটি সপ্তরথ পীঢ়ারীতির, যেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৮'১০" (৮·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। দণ্ডেশ্বর বিগ্রহ পাথরের শিবলিঙ্গ। এ মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে বরণ্ডের উপরিভাগে পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ দুর্গা এবং লাঠি হাতে কোন ভক্তের প্রতিমূর্তি দেখা যায়।

মহামায়ার মন্দিরটি পূর্বোক্ত মন্দিরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত এবং একই রীতির মন্দির হলেও এটি আকারে বেশ ছোট। এ মন্দিরটির গর্ভগৃহ সপ্তরথ শিখর এবং জগমোহন সপ্তরথ পীঢ়ারীতির। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'১০" (৩·৩ মি·) ও উচ্চতায় ৩৩' (১০·১ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭'৯" (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)। দুটি মন্দিরেরই ছাদ লহরা পদ্ধতিতে ধাপযুক্ত করে নির্মিত। দেবী মহামায়ার মূর্তিটি সিঁদুরলিপ্ত এবং মূর্তির বাঁপাশে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডির আসন। জনশ্রুতি যে, কর্ণগড় ভূস্বামী যশোবন্ত সিংহ এবং রাজ-আনুকূল্যপ্রাপ্ত সভাকবি 'শিবায়ন' কাব্যপ্রণেতা দ্বিজ রামেশ্বর এই পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এছাড়া মহামায়া মন্দিরের ঠিক পিছনেই একটি পবিত্র কুণ্ড লক্ষ্য করা যায়, যার জল ভক্তেরা চরণামৃতরূপে পান করে থাকেন। মন্দির দুটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে কর্ণগড় রাজপরিবারের ইতিহাস এবং আশ্রিত কবি দ্বিজ রামেশ্বরের কাব্যগ্রন্থে এই রাজপরিবারের প্রসঙ্গ দৃষ্টান্তে, এ মন্দির দুটি খ্রীষ্টীয় সতর শতকের

মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

মন্দির প্রাচীরের বাইরে পুবদিকে উল্লিখিত কবির স্মৃতিরক্ষার্থে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা কর্তৃক এক স্মৃতিস্তম্ভও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আলোচ্য এই মন্দির চত্বরের প্রায় ১½ কিলোমিটার উত্তরে কর্ণগড় রাজবাড়ির গড়ের মধ্যেও একটি পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির এবং পাশাপাশি একটি দুর্গা দালানও পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া গড়ের বাইরে দক্ষিণে উত্তরমুখী একটি একরত্ন মন্দিরও দেখা যায়। মন্দিরটি পরিত্যক্ত বটে, তবে এটির উপরের অংশের চূড়াটি ইটের এবং বাকী অংশ মাকড়া পাথর দিয়ে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, গড়বাড়ির এ মন্দিরগুলি আঠার শতকের কীর্তি বলেই মনে হয়।

কলমীজোড় : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেলতলা; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন কলমীজোড় গ্রাম (জে এল নং ৬৫)। এখানে পলশপাই খালের পূর্বপ্রান্তে শীতলার দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। ত্রিখিলানের উপরে নিবদ্ধ দুর্গা ও রামসীতার পোড়ামাটির ফলকগুলি ছাড়া বাকী ভাস্কর্য-ফলকগুলি বর্তমানে ক্ষয়িত। এছাড়া এ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৭′৪″ (৫·৩ মি·) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৩০′ (৯ মি·)।

পলশপাই খালের অপরতীরে পারকলমীজোড়ে অবস্থিত দক্ষিণমুখী শীতলার একটি সপ্তরথ শিখর মন্দিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ শিখর-দেউলটির সম্মুখে যুক্ত রয়েছে একটি তিনচালা জগমোহন, যেটির উপরের চাল খাঁজকাটা করে অলঙ্কৃত। সংস্কারলিপি ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান করা যেতে পারে।

পারকলমীজোড়ে সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কাশীনাথ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। একদুয়ারী মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে সামান্য কিছু পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১১′ (৩·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

পূর্বোক্ত মন্দিরটির সন্নিকটে, দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাশ্যামসুন্দরজীউর পুবমুখী একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। যদিও মন্দিরটির সম্মুখভাগ বেশ ক্ষতিগ্রস্থ, তাহলেও স্থাপত্যবিচারে সেটিও আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

। : পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মেছগ্রাম; সেখান থেকে উত্তর-পূর্বে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কলিশ্বর গ্রাম (জে এল নং ৭৩)। এ গ্রামে মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ছাদ 'ভল্ট' করে নির্মিত এবং পুব দেওয়ালে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

এছাড়া, এগ্রামে মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কাশীশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী যে আটচালা মন্দিরটি দেখা যায়, সেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক।

কসবা নারায়ণগড় : খড়্গাপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) নারায়ণগড় থানার সদর নারায়ণগড় থেকে পুবে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন কসবা নারায়ণগড় গ্রাম (জে· এল· নং ২৭৩)। এখানে পুবমুখী তিনগম্বুজ মসজিদটি একটি উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মসজিদে প্রবেশপথে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে, তার ভাবার্থ হল, শাহ সুজা আলমগীর কর্তৃক ১০৬০ হিজরীতে এ মসজিদটি নির্মিত। অতএব ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মসজিদটির ছাদ চার দেওয়াল কোণে উদ্গত লহরার উপর রক্ষিত তিন গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

কাঁকড়া-শিবরাম : পাঁশকুড়া-লোয়াদা অথবা বালীচক-লোয়াদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) লোয়াদা; সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন কাঁকড়া শিবরাম গ্রাম (জে· এল· নং ১৫৩)। এ গ্রামে ভূঁইয়া পরিবারের পুবমুখী শ্রীধরজীউর বিশাল নবরত্ন মন্দিরটি জেলার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলেও, বর্তমানে সেটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটির পোড়ামাটির অলঙ্করণসজ্জা দেখে, অনুমান করা যায় যে, মন্দিরটি আঠার শতকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ্রামের প্রধান প্রবেশপথে উত্তরমুখী শিবের একটি শিখর-দেউলও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

কাজলাগড় : মেছেদা-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ভগবানপুর থানার অন্তর্গত মীর্জাপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১৬০) কাজলাগড়। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, সুজামুঠা রাজবংশের চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোপালের নবরত্ন মন্দির। দক্ষিণমুখী এই নবরত্ন মন্দিরটির সম্মুখভাগে যেসব উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ ছিল, বর্তমানে তার বহুলাংশ বিনষ্ট। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৫′৩″ (১০·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে স্থানীয়ভাবে এই রাজপরিবারের বংশতালিকা থেকে জানা যায় যে, চৌধুরী বংশের মহেন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক এখানকার রাজবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি ও এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। সুতরাং সে হিসেবে মন্দিরটি আঠার শতকে নির্মিত বলেই ধারণা করা যায়।

কাজলাগড়ের আর এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল, এখানকার বিখ্যাত কাজলাদিঘি। একদা জলকষ্ট নিবারণের জন্য রাজা গোপালেন্দ্রনারায়ণ যে দিঘিটি খনন করান, সেটিরই পরে নামকরণ হয় কাজলাদিঘি। উনিশ শতকের শেষদিকে সুজামুঠা পরগণার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হয়ে বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এখানে প্রায় তিন

বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। কবির বিখ্যাত কবিতা 'আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি' এখানেই রচিত। বর্তমানে কাজলাদিঘির উত্তরপাড়ে কবির স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি স্তম্ভ।'

কাঞ্চনপুর : মেছেদা-দীঘা বা খড়্গপুর-দীঘা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কাঁথির দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরত্বে পিছাবনী; সেখান থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে কাঁথি থানার কাঞ্চনপুর গ্রাম। এই গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি হল একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। জনশ্রুতি যে, এই দুর্গটি সম্রাট শাহ্ আলমের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত একটি মসজিদও এখানকার এক পুরাকীর্তি। মসজিদটিতে যে লিপিফলক ছিল, সেটি অস্পষ্টতার কারণে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

কাটান : ঘাটাল-পাঁশকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) নিমতলা থেকে মোরাম রাস্তায় পশ্চিমে ১ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন কাটান গ্রাম (জে· এল· নং ১৪৯)। এ গ্রামের প্রামাণিক পরিবারের শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী দ্বিতল মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। নীচতলার ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে যে পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ লঙ্কাযুদ্ধ। এছাড়া মিথুন ফলকও এই সঙ্গে স্থান পেয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য বিচারে আঠার শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যে মন্দিরটি ১৫'৯" (৪·৮ মি·), প্রস্থে ১৪'৯" (৪·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·)। পাশাপাশি শ্রীধরজীউর ন'চূড়া রাসমঞ্চটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য এ গ্রামের রঘুনাথের নবরত্ন মন্দিরটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি পঞ্চরত্ন রীতির মন্দিরে ঐ মন্দিরের বিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হয়। এছাড়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় চক্রবর্তী পরিবারের শ্রীধরজীউর আটচালা মন্দিরটিও এখানকার আর এক দ্রষ্টব্য।

কাঁটাবনি : 'কলিশ্বর' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে হাঁটাপথে উত্তর-পূর্বে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কাঁটাবনি-শাসন মৌজাভুক্ত কাঁটাবনি গ্রাম (জে· এল· নং ৪৯)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, স্থানীয় জানা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরটি পরিত্যক্ত বটে, তবু এটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে নানাবিধ 'টেরাকোটা'-ফলক, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা। এছাড়া মিথুন মূর্তিও দক্ষিণ দেওয়ালে নিবদ্ধ দেখা যায়। মন্দিরের দরজায় ব্যবহৃত কাঠের কপাটের পাল্লাতেও যে কাঠখোদাইয়ের কাজ দেখা যায়, তা পোড়ামাটির ফলকসজ্জার সঙ্গে একান্তই সাদৃশ্যযুক্ত। মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ফলকের উপর খোদিত লিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"শুভমস্তু সকাব্দা/১৭৪৩ সন ১২৩১/সাল ১৬ মাঘ বু/দবার য়ারম্ভ"।

অতএব ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৬" (৫·৯ মি·) এবং

উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

কাদিলপুর: ‘কলমীজোড়’ নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলমীজোড়ের পার্শ্ববর্তী দাসপুর থানার অন্তর্গত কাদিরপুর-ফকিরবাজার মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১০৮) কাদিলপুর গ্রাম। স্থানীয় দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ ও গোপালজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানকার উল্লেখযোগ্য এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের ত্রিখিলানের উপরিভাগে নিবদ্ধ কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পোড়ামাটির ভাস্কর্যফলকগুলি একান্তই চিত্তাকর্ষক। এছাড়া, এ মন্দিরটির কাঠের কপাটে উৎকীর্ণ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি-ভাস্কর্যও বেশ মনোরম। মন্দিরটির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে পোড়ামাটির দুটি মিথুন ফলকও দেখা যায়। কার্নিসের নিচে নিবদ্ধ দশ লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

“শ্রীশ্রীশুভমস্তু/সকাবদা।১৭০২২/সন ১২০৬ সাল/তারিখ ৩ বৈসাখ/মন্দির আরম্ভ/কত্তা শ্রীসান্তিরা/ম দত্ত সঙ্খবণিক/শ্রীসাফল্য মিস্ত্রি/শ্রীবলাই দাস/সাং দাসপুর।”

অতএব ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′১″ (৫·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। মন্দিরের কাছাকাছি একটি ন’চূড়া রাসমঞ্চও দেখা যায়।

কানাশোল: ‘আনন্দপুর’ নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে: সেখান থেকে উত্তরে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার এলাকাধীন কানাশোল গ্রাম (জে· এল· নং ৮১) এ গ্রামে ঝাড়েশ্বরনাথ শিব লৌকিক দেবতা হিসাবে বেশ জনপ্রিয়। দক্ষিণমুখী শিবের এ মন্দিরটি পঞ্চরত্ন রীতির এবং সেটির সামনের দেওয়ালে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ রয়েছে। পুব দেওয়ালে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে তার পাঠ নিম্নরূপ:

“শ্রীশ্রীঝাড়েশ্বর নাথ/সকাবদা ১৭৫৬/সন ১২৪১ সাল/তারিখ ৯ জ্যেষ্ঠী/শ্রীযুৎ দেয়নজি রামনা/রায়ণ জানা মহাসয়ের/কির্ত্তি।”

অতএব ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি যে শ্রীরামনারায়ণ জানা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন তা লিপিফলক থেকে জানা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৭′ (৮·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)।

এ মন্দিরের পশ্চিমে পুবমুখী যে ভোগঘরটি দেখা যায়, সেটি আটচালা রীতির এবং সেটির সামনের দেওয়ালেও বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকসজ্জা রয়েছে। এ ভোগঘরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

কামারগেড়ে: ঘাটাল-চন্দ্রকোনা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ক্ষীরপাই; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন কামারগেড়ে গ্রাম (জে· এল· নং ২৭৭)। গ্রামে রামেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দিরটি অলঙ্করণবিহীন হলেও সেটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যে নির্মিত, তা আকারপ্রকারে অনুমান করা যায়। মন্দিরটি একদুয়ারী এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′(৩·৭

মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

গ্রামের সামুই পাড়ায় রঘুনাথজীউর দক্ষিণমুখী মন্দিরটি পঞ্চরত্ন রীতির এবং সেটির প্রবেশপথের উপরে পঙ্খের বেশ কিছু নকাশি অলঙ্করণ দেখা যায়। এ মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপিটি বেশ অভিনব এবং সেটির হুবহু পাঠ:

"শন ১২৬১ শাল/শ্রীশ্রী৺ রঘুনাথ জীউ/শ্রীচরণ লইআ স্বরণ: কার য়াখি/ঞ্চন: জত্নে রত্ন করি উপার্জ্জনঃ/এপঞ্চরত্নঃ কর আরহন নয় ভদ্রা/শন: গোষ্ঠা বর্গে দেয় শ্রীচরণ।"

অতএব ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

কাশীগঞ্জ: ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ক্ষীরপাই; সেখান থেকে দক্ষিণে হাঁটাপথে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন কাশীগঞ্জ গ্রাম (জে· এল· নং ২১৩)। এ গ্রামে শান্তিনাথ শিবের দক্ষিণমুখী দালান মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও আকারপ্রকারে সেটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে। মন্দিরটির শীর্ষে ক্ষুদ্রাকার আমলকধৃত দুপাশে দুই সিংহ মূর্তির সংস্থাপন একান্তই অভিনব।

তবে ভূঁইয়া পাড়ায় চক্রবর্তী পরিবারের রাধাগোবিন্দের পশ্চিমমুখী মন্দিরটির স্থাপত্যরীতি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ মন্দিরটি আটকোণা আকারের এবং শীর্ষে স্থাপিত একটি আমলক। মন্দিরটির ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। উৎসর্গলিপি না থাকলেও আকৃতি দেখে এটিকে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

গ্রামের পশ্চিমদিক দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান কেঠে খালটির পাশে এক উঁচু ঢিবিতে অবস্থিত গ্রাম্য লৌকিক দেবী ভাণ্ডারচণ্ডীর দালান মন্দিরটি তেমন প্রাচীন না হলেও, এ মন্দিরের চত্বরে একটি মাকড়াপাথরের আমলক শিলার অবস্থান দেখে মনে হয়, আদিতে এখানে শিখর বা পীঢ়া রীতির কোন মন্দির দেবালয়ের অস্তিত্ব ছিল।

কাশীগঞ্জ গ্রামের সামান্য দক্ষিণে, কেঠে খালের ধার বরাবর বেড়াবেড় নামক স্থানে কতকগুলি সমাধি মন্দির দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, একদা এই অঞ্চলে রেশম শিল্পের উৎকর্ষের কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত বিদেশী কুঠিয়ালদের মৃত পরিবার পরিজনদের এগুলি সমাধি স্তম্ভ। তবে দুঃখের কথা এসব সমাধিতে কোন পরিচয়ফলক নিবদ্ধ নেই, যার ফলে মৃত ব্যক্তিরা যে কোন্ দেশের নাগরিক, তার সঠিক পরিচয় জানা যায় না।

কাষ্টখামার (ধলহরা): মেদিনীপুর-কেশপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পঞ্চমী; সেখান থেকে দক্ষিণে হাঁটা পথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার এলাকাধীন কাষ্টখামার (ধলহরা) গ্রাম (জে· এল· নং ৪৪৩)। এইগ্রামে বটেশ্বর শিবের মাকড়াপাথরের পশ্চিমমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এখানকার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীর অনুরূপ জগমোহনটি পীঢ়া রীতির এবং মূল মন্দির ও জগমোহনের বিন্যাস সপ্তরথ এবং দুটিরই ছাদ লহরা করে নির্মিত। এছাড়া মূল মন্দির ও জগমোহনের মধ্যে একটি ঢাকা সংযোগপথও দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, কর্ণগড়ের রাজা

যশোমন্ত সিংহ এই স্বয়ম্ভু শিবের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্যনিরিখে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান। মূল মন্দির দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮'৯" (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·২ মি·) এবং জগমোহন দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪' (৭·৩ মি·) ও উচ্চতায় ২৩' (৭ মি·)।

কিয়ারচাঁদ : খড়গপুর-কুলটিকরি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশিয়াড়ী থানার এলাকাধীন কিয়ারচন্দ্র গ্রাম (জে· এল· নং ২৯), যা সাধারণ লোকের কাছে কিয়ারচাঁদ নামেই সমধিক পরিচিত। এ গ্রামের প্রধান সড়কের দক্ষিণ পাশে পাথরডাঙ্গা নামক এক চত্বরে দেখা যায় প্রায় এক মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট শিখর-দেউলের আকৃতিবিশিষ্ট অসংখ্য মাকড়াপাথরের স্তম্ভ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দুটি বিরাটাকার আমলক শিলা, যা একদা কোন এক মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই অনুমান। এছাড়া এই আমলক শিলার নিকটেই পাথরের এক ধ্বংসস্তূপের ভিতর মাকড়াপাথরের একটি মূর্তির ভগ্নাংশ পড়ে থাকতে দেখা যায়, যা ভাস্কর্যশৈলী নিরিখে বিষ্ণুমূর্তি বলেই অনুমান করা যায়। প্রাপ্ত এসব পুরাবস্তু থেকে ধারণা করা যায় যে, অতীতে 'কুসুমা পুকুর' নামে ৬৭ একর পরিমিত বিরাটাকার এক জলাশয়ের উত্তর পাশে এই চত্বরে একটি বিশালাকার শিখর-দেউলের অস্তিত্ব ছিল এবং প্রথাগতভাবে মানত হিসাবে ভক্তেরা এইসব ক্ষুদ্রাকার দেউল-মন্দিরের প্রতিরূপ এখানকার মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতার কাছে নিবেদন করতেন। ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ এই প্রথার প্রচলন থাকায় এখানকার এই পাথরডাঙ্গার মন্দির চত্বর এইসব নিবেদন মন্দিরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কোন মনস্কামনা পূরণের জন্য দেবতার কাছে ক্ষুদ্রাকার মন্দির-প্রতিকৃতি নিবেদন করার রীতি আজও ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও একদা এই ধরনের ক্ষুদ্রাকার শিখর মন্দিরের প্রতিকৃতি নিবেদন করার রীতি যে প্রচলিত ছিল, তার দৃষ্টান্ত হল ওড়িশার ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী খণ্ডগিরির জৈন মন্দিরের চত্বরে ঐ আকারের অনেক নিবেদন-মন্দিরের সংস্থাপন। এছাড়া পশ্চিমবাংলায় পুরুলিয়া জেলার মানবাজার থানা এলাকার টুইসামা গ্রামের এক মন্দির চত্বরে অনুরূপ ছোট·ছোট দেউলাকৃতি স্তম্ভও দেখা যায়। মেদিনীপুর জেলার আরও যেসব স্থানে এই ধরনের দেবালয় নিবেদন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, সে সম্পর্কে পরবর্তী স্থানবিবরণীতে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

কিশোরপুর : 'কলমীজোড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে পলসপাই খাল পেরিয়ে পশ্চিমে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে রাধানগর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১১০) দাসপুর থানা এলাকার কিশোরপুর গ্রাম। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের রাধাবল্লভের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটিতে সামান্য কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলক ছাড়াও পঙ্খ পলস্তারায় খোদিত বেশ কিছু অলঙ্করণ দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু গৌরনিতাই, নৌকাবিলাস, বস্ত্রহরণ ও মারীচ বধ প্রভৃতি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪' (৭·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৫০ (১৫·২ মি·)।

কিশোরপুর : মেছেদা-পটাশপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ভগবানপুর থানার এলাকাধীন পশ্চিম তাঙ্গুড়িয়া মৌজাভুক্ত (জে এল নং ১১৩) কিশোরপুর গ্রাম। এখানে মাজনামুঠা রাজবংশের রাজা কিশোর রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিশোরজীউর শিখর দেউলটি এক পুরাকীর্তি। ত্রিখিলান দালানযুক্ত এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও স্থাপত্য নিরিখে এটি আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলে মনে হয়। মন্দিরটি দালান অংশবাদে দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)।

কিসমৎ নাড়াজোল : মেদিনীপুর-নাড়াজোল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন কিসমৎ নাড়াজোল গ্রাম (জে এল নং ১৬)। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের অধীন এখানকার বৈষ্ণব অস্থলে প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনের একটি পঞ্চরত্ন মন্দির, রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ প্রভৃতি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি। দক্ষিণমুখী মদনমোহন মন্দিরটিতে তেমন কোন অলঙ্করণসজ্জা বা প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে সেটি আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। এখানের আটকোণা ন'চূড়া রাসমঞ্চটির প্রতি খিলানের থামে পোড়ামাটির দ্বারপালের মূর্তিও দেখা যায়। প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ রাসমঞ্চটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর সেনহাটি গ্রাম থেকে আগত মথুরামোহন মিস্ত্রী দ্বারা এই রাসমঞ্চটি নির্মিত হয়। আলোচ্য এ রাসমঞ্চটির পশ্চিমে এক উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত আটকোণা ন'চূড়া দোলমঞ্চটিতেও বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ কৃষ্ণলীলা। এটিতে কোন উৎসর্গলিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে এটিও কথিত রাসমঞ্চটির সমসাময়িক বলেই অনুমান।

কুমরগঞ্জ : ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জয়ন্তিপুর; সেখান থেকে উত্তরে ১ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন কুমরগঞ্জ গ্রাম (জে এল নং ১০৮)। এ গ্রামের গদাধর শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে সেটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। এছাড়া গ্রামের শীতলা মন্দিরটি দালান রীতির এবং সেটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্যফলক দেখা যায়। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে, বলেই অনুমান। আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে এখানকার বিখ্যাত কালীমন্দিরটির কাছে স্থাপিত কষ্টিপাথরে নির্মিত যে ভগ্ন ও ক্ষয়িত মূর্তিটি দেখা যায়, সেটি কোন জৈন মূর্তি বলেই মনে হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের মতে মূর্তিটি স্থানীয় বৈষ্ণব বেড় থেকে এখানে আনা হয়েছে।

কুশপাতা : 'আলুই' নিবন্ধে ঘাটাল পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দক্ষিণে শিলাই নদীর বাঁধ বরাবর প্রায় ১½ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার অন্তর্গত কুশপাতা-গোবিন্দপুর মৌজাভুক্ত (জে এল নং ১৪৫) গ্রাম কুশপাতা। এ গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ায় শীতলার পশ্চিমমুখী মন্দিরটি অলঙ্করণবিহীন দালান-রীতির হলেও, সেটি যে

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, তা ঐ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

গ্রামের কায়স্থ পাড়ায় পালিত পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এ গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটি বর্তমানে জীর্ণ হলেও একদা এটিতে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ ছিল, যার কিছু কিছু অবশেষ এখনও দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯'১" (৫·৮ মি) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিটি অস্পষ্ট হলেও, স্থাপত্য বিচারে এটি আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়। এ মন্দিরের পাশে একটি বৃহদাকার রাসমঞ্চ দেখা যায়, যেটিতে এক সময়ে বেশ কিছু নকাশি অলংকরণসজ্জা ছিল।

আলোচ্য এই পাড়াতেই মিত্র পরিবারের দক্ষিণমুখী রাধাদামোদরের আটচালা মন্দিরটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জীর্ণবস্থা প্রাপ্ত হলেও, সেটিতে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রীরাধাদামুদর জিউ সুভমস্তু/ সকাব্দা ১৭৫৭ সন ১২৪২ সাল ২৭ ফাল্গুন।"

অতএব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭'১" (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)।

পূর্বোক্ত মন্দিরের কাছাকাছি ঘোষ পরিবারের দক্ষিণমুখী লক্ষ্মীজনার্দনের দালানরীতির মন্দিরটিও বেশ প্রাচীন। এ মন্দিরের প্রবেশপথের উপর নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী লক্ষ্মী/ জনার্দ্দন জীউ/ সকাব্দা ১৭৩৬/ সমাপ্ত ৩ জ/ ষ্ঠ সন ১২২১/ প্রতিষ্ঠাতা/করালীচর/ ন ঘোস পুত্র/ শ্রীরাম সুন্দ/ র ঘোস।"

অতএব ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭' ১" (৫·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)।

কৃষ্ণনগর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গড়বেতা স্টেশন থেকে অথবা খড়গপুর-গড়বেতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গড়বেতা থেকে গড়বেতা-হুমগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ফতেসিংপুর; সেখান থেকে হাঁটা পথে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরত্বে কৃষ্ণনগর গ্রাম (জে এল নং ৪০২)। এখানে কৃষ্ণরায়জীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির পুবদিকে আরও একটি প্রবেশপথ দেখা যায় এবং দক্ষিণে ত্রিখিলানের প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে তার পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জি/ সকাব্দা ১৭৭৭।৭।৮ দিবষ/ বাঙ্গালা শন ১২৬২ সাল।/ তারিখ ৮ আটঞ অগ্রায়ণ/শ্রীজাদবরাম চট্টোপাধ্যা।/ সাকিম তিলাটিপঃ সয়্যার/ ক্রিত/ শ্রীসনাতন মিস্ত্রী সাঃ বিষ্ণুপুর।"

অতএব ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির স্থপতি ছিলেন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের সনাতন মিস্ত্রী। মন্দিরটি ৫' (১·৫ মি·) উঁচু, এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৭' (৮·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·২ মি·)। বর্তমানে মন্দিরটির দক্ষিণ দিকের অংশ শীলাবতী নদীর ভাঙ্গনে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অবিলম্বে তা সংস্কার করা না হলে অচিরেই সেটি নদীগর্ভে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কেদার: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে, বালীচক-মুণ্ডমালা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার এলাকাধীন চণ্ডীপুর মৌজাভুক্ত (জে এল নং ৪০১) কেদার গ্রাম। এখানের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল কেদারেশ্বর মতান্তরে, চপলেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী মাকড়াপাথরের মন্দির। ওড়িশা মন্দিররীতির মতই মূল মন্দিরটি শিখর, জগমোহনটি পীঢ়া ও তৎসংলগ্ন নাটমণ্ডপটি চারচালা। মন্দিরের পিছনে পুবপাশে একটি কুণ্ডের একস্থানে 'ভুটভুট্' শব্দে জল বের হত বলে এটিকে স্থানীয়ভাবে 'কেদার ভুড়ভুড়ি'ও বলা হয়। ঠিক যে স্থানটি থেকে জল বুদবুদ উত্থিত হত, সেটির উপর মাকড়াপাথর দিয়ে একটি পীঢ়া রীতির ছাদও নির্মাণ করা দেওয়া হয়েছে। পৌষ সংক্রান্তিতে বন্ধ্যা নারী এই কুণ্ডে স্নান করলে পুত্রবতী হন এমন একটি লোকবিশ্বাস প্রচলিত থাকায়, ঐ সময় এখানে বেশ যাত্রী সমাগম হয় এবং এই উপলক্ষে একটি মেলাও বসে থাকে।

মূল মন্দিরটি উচ্চতায় ৩০′ (৯·১ মি·), জগমোহনটি ২৩′ (৭ মি·) এবং নাটমন্দিরটি ২০′ (৬ মি·)। মূল মন্দির, জগমোহন ও নাটমন্দিরের ছাদ লহরাযুক্ত ধাপ পদ্ধতিতে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এই মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলী বিচারে আনুমানিক ষোল শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। পশ্চিমে প্রবেশপথের দুপাশে পোড়ামাটির বিরাটাকার দুটি সাহেব মূর্তি যে পরবর্তীকালে দ্বারপাল হিসাবে নিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই ধরনের প্রাচীন মন্দিরে পরবর্তীকালে অনুরূপ অলঙ্করণ-ভাস্কর্য সংযোজনের দৃষ্টান্ত এ জেলার ঘাটালের কোন্নগর পল্লীর প্রাচীন সিংহবাহিনীর মন্দিরেও লক্ষ্য করা যায়।

কেদার: খড়গপুর-কাঁথি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) খাকুড়দা; সেখান থেকে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে দাঁতন থানার অন্তর্গত কেদার গ্রাম (জে· এল নং ২৫০)। এ গ্রামে কেদার পাবকেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী মাকড়া পাথরের শিখর-দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। ক্ষুদ্রাকার জগমোহনযুক্ত এ মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ হয়েছে কষ্টিপাথরের এক নবগ্রহফলক, যা দৈর্ঘ্যে ৪১/২′ (১·৩ মি·)। মন্দিরটির ছাদ লহরা পদ্ধতিতে ধাপযুক্ত চারচালা করে নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′৬″ (৪·১ মি·) জগমোহন দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′৬″ (২·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে স্থাপত্য বিচারে এটি সতের শতকের শেষে নির্মিত বলেই অনুমান।

পূর্বোক্ত কেদার ভুড়ভুড়ির কুণ্ডের মতই এ মন্দিরের উত্তর পাশে লাগোয়া জলাশয় থেকেও বুদবুদ করে জল বের হয়। স্থানীয়ভাবে সেজন্য এই কুণ্ডটিকে বলা হয় জলহরি এবং যেস্থানে জল এইভাবে বুদবুদ করে বের হয়ে থাকে সেটির উপরেও মাকড়া পাথর দিয়ে একটি আচ্ছাদন করে দেওয়া হয়েছে। বেশ লক্ষ্য করা যায়, বুদ্‌বুদ্ আকারে বের হওয়া বাড়তি এই জলধারা পাশের বাঘুই খাল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

কেনাসী: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-তমলুক পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রতাপপুর; সেখান থেকে কাঁসাই নদীর বাঁধে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত কেনাসী-বৃন্দাবনচক মৌজাভুক্ত

কেনাসী গ্রাম (জে· এল· নং ৩৪৩)। এই গ্রামে জয়চণ্ডীর ইটের পুবমুখী পঞ্চরথ শিখর দেউলটি একমাত্র পুরাকীর্তি। কাঁসাই নদী থেকে পাওয়া পাথরের এ দেবীমূর্তিটি বর্তমানে সিঁদুরলিপ্ত হওয়ায় মূর্তির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট, একদুয়ারী এ মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

কেরুড় : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-ময়না পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জলচক; সেখান থেকে দক্ষিণে বাঁধ রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার অন্তর্গত কেরুড় গ্রাম (জে· এল· নং ২৭৮)। গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় রায় পরিবারের বৈকুণ্ঠনাথ জীউর দক্ষিণমুখী, ক্ষুদ্রাকার জগমোহনযুক্ত, পঞ্চরথ শিখর-দেউলটি এ গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথে বরণ্ডের উপরিভাগে প্রতিটি রথপগের গায়ে নিবদ্ধ পলস্তারা দিয়ে নির্মিত পাঁচটি উপবিষ্ট মহন্তর মূর্তি একান্তই অভিনব। প্রায় ২৩′ (৭ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটিতে কোন উৎসর্গলিপি না থাকলেও, স্থাপত্যশৈলী বিচারে মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

আলোচ্য মন্দিরটির সামান্য পূবে ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী সিংহবাহিনীর একটি দালান মন্দির এবং শিব ও জয়দুর্গার পাশাপাশি দু'টি আটচালা মন্দিরও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অলঙ্করণবিহীন এ তিনটি মন্দিরের মধ্যে, মাঝের শিব মন্দিরটি আটচালা রীতির হলেও সেটি শিখর-দেউলের মতই ত্রিরথ আকারে নির্মিত। এ তিনটি মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের কাছ থেকে জানা গেল যে, এ মন্দিরগুলি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।

কেশিয়াড়ী : খড়্গপুর রেল স্টেশন থেকে খড়্গপুর-কেশিয়াড়ী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত কেশিয়াড়ী সদর (জে· এল· নং ১০৬)। এখানকার ভবানীপুর পল্লীর মঙ্গলামাড়োতে অবস্থিত দেবী সর্বমঙ্গলার পুবমুখী ঝামাপাথরে নির্মিত মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রায় ৭′ (২·১ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি এবং তৎসংলগ্ন জগমোহন ও নাটমন্দিরটি ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীর পীঢ়া-দেউল। নাটমন্দিরটির চারিদিক খোলা এবং বারটি খিলানের উপর নির্মিত হওয়ায় সাধারণে এটিকে 'বারদুয়ারী'ও বলে থাকে। মন্দিরের প্রবেশপথে সিঁড়ির দুপাশে দুটি পাথরের সিংহমূর্তি দেখা যায়। বারদুয়ারী নাটমন্দিরের সামনের দেওয়ালে ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ পাথরের এক লিপি থেকে জানা যায় যে, এ নাটমণ্ডপটি ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

উল্লিখিত লিপিটি ছাড়া জগমোহনে প্রবেশপথের বাঁদিকের দেওয়ালে আরও একটি ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি নিবদ্ধ আছে। সে লিপি থেকে জানা যায় যে, কুল্যাসেনা গ্রামের জনৈক চক্রধর ভূঁঞা কর্তৃক ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ) জগমোহনসহ এই দেবী মন্দিরটি নির্মিত হয়। সুতরাং দুটি লিপিফলক থেকে বেশ বোঝা যায়, এ মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরটি পরবর্তী-সংযোজন। মূল মন্দির, জগমোহন ও নাটমন্দিরের ছাদ

ধাপযুক্ত লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত এবং সেগুলির উচ্চতা প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)।

মন্দিরের গর্ভগৃহে এক অনুচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত দেবী সর্বমঙ্গলার মূর্তি পাথরের হলেও, সেটির সঠিক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু এ মূর্তির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হল, "....মন্দিরের মধ্যস্থলে সুউচ্চ বেদীর উপর প্রস্তর-নির্মিতা প্রৌঢ় বয়স্কা, সিন্দুর-লিপ্তবদনা দ্বিভুজা সর্বমঙ্গলা মূর্তি। দেবীর দক্ষিণপদ বেদীর নিম্নে সিংহের মস্তকে এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর স্থাপিত। তাঁহার মস্তকে বৃহৎ স্বর্ণমুকুট, দুই কর্ণে সুবর্ণের ফুল মাকড়ী ও দুই হস্তে বিবিধ সুবর্ণালঙ্কার আছে। দেবীর দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঞ্চে ঐরূপ প্রস্তর-নির্মিত সিন্দুর-চর্চিত জয়া বিজয়া মূর্তি।" বেদীর উপর বাঁদিকে ঐ মূর্তিগুলির অনুরূপ 'বিজয়া মঙ্গলা' নামে পিতলের তৈরী আরও তিনটি মূর্তি এক সিংহাসনের উপর স্থাপিত। এই বিজয়া মঙ্গলা মূর্তির পাদদেশে আরও একটি ওড়িয়া অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি আছে, যাতে পূর্বোক্ত লিপির মতই চক্রধর ভূঁঞ্যা কর্তৃক ১৫২৬ শকাব্দে (১৬০৪ খ্রীঃ) মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া সর্বমঙ্গলা দেবীর সামনে রক্ষিত আছে গোলাকার তামার পাতে আঁকা অষ্টদল পদ্মের মধ্যে ভুবনেশ্বরী যন্ত্র, যা দিয়ে পূজারীরা এঁর অভিষেক ও পুরশ্চরণাদি করে থাকেন।

গর্ভগৃহ ছাড়া জগমোহনের মধ্যেও যে দু'তিনটি পাথরের মূর্তি দেখা যায়, তার মধ্যে একটি হল গণেশের মূর্তি, একটি দ্বিভুজ কমণ্ডলু ও ত্রিশূলধারী মূর্তি এবং চতুর্ভুজা একটি অসুরনাশিনী মূর্তি। মূলতঃ এ জেলায় সতর শতকের প্রথম দিকে নির্মিত পীঢ়া স্থাপত্যশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এই সর্বমঙ্গলার মন্দির।

সর্বমঙ্গলা মন্দিরটির সামান্য পুবে কাশীশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী ঝামাপাথরের মন্দির ও তৎসহ জগমোহনটিও পীঢ়া রীতির। এ মন্দিরের গর্ভগৃহ ও জগমোহনের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। জগমোহনের সামনের দেওয়ালে পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত হরপাবর্তী ও কার্তিক-গণেশের মূর্তি নিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে মিথুন মূর্তি। প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটিতে কোন লিপিফলক নেই, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি খ্রীষ্টীয় সতর শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

কেশিয়াড়ীর তল-কেশিয়াড়ী পল্লীতে জগন্নাথের পুবমুখী মাকড়াপাথরের ওড়িশা শৈলীর পীঢ়া জগমোহনযুক্ত সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এখানের আর এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, এ মন্দিরটি স্থানীয় ঘোষবংশীয় জমিদারদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহ দারু নির্মিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। এ মন্দিরে তেমন কোন অলঙ্করণ না থাকলেও, মন্দিরের চারদিকের দেওয়ালে গণ্ডীর মধ্যস্থলে লম্ফমান সিংহের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য বিচারে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকে নির্মিত বলে মনে হয়। অত্যন্ত দুঃখের কথা, কয়েক বৎসর পূর্বে এ মন্দিরটির সম্মুখভাগ ভেঙ্গে পড়ায় মন্দিরটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিকৃত।

তল-কেশিয়াড়ী পল্লীতে শাহ্ আলমের নির্মিত মসজিদটিও এখানকার এক পুরাকীর্তি। এছাড়া মোগলপাড়া পল্লীতে অবস্থিত আরও একটি প্রাচীন মসজিদ সম্পর্কে মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু লিখেছেন, "....একটি জীর্ণ মসজিদে আরবী ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে উহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে ঐ মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে

একটি প্রস্তর মূর্তি পড়িয়া আছে। উহার আকৃতি ও পরিচ্ছদাদি দেখিলে উহা কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের প্রতিমূর্তি বলিয়া মনে হয়।"

কাছাকাছি কুমারহাটি পল্লীতে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার ঝামাপাথরের নির্মিত পুবমুখী সপ্তরথ শিখর মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির জগমোহন পঞ্চরথ পীঢ়ারীতির। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে পঙ্খ পলস্তারায় উৎকীর্ণ মিথুন মূর্তি ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য বিচারে সতর শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমান।

কোঙারপুর: 'ঈশ্বরপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে রাধানগর- কোঙারপুর মোরাম রাস্তায় (নিয়মিত রিক্সা চলে) ঘাটাল থানার অন্তর্গত কোঙারপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৯৯)। এ গ্রামের ঘোষ পাড়ায় ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে উৎকীর্ণ হয়েছে পঙ্খ-পলস্তারায় নির্মিত নকাশি অলঙ্করণ এবং মন্দিরের প্রধান চূড়াটির প্রতি দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত কেশ-প্রসাধনরতা ও বেহালাবাদিকার মূর্তি প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরটির পাশাপাশি লক্ষ্মীজনার্দনের নচূড়াযুক্ত আটকোণা রাসমঞ্চটিও উল্লেখযোগ্য। এ রাসমঞ্চের প্রতি খিলানের স্তম্ভে নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির বিভিন্ন বাদিকামূর্তি। এছাড়া এ রাসমঞ্চে যে দু লাইন প্রতিষ্ঠালিপি দেখা যায় তার পাঠ নিম্নরূপ:

"সন ১৭৬৪ সক/তারিখ ৩১ বৈশাখ।"

সুতরাং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ রাসমঞ্চটি সংস্কার অভাবে বর্তমানে ভগ্নদশায় পতিত।

এছাড়া পূর্বোক্ত মন্দির চত্বরে এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত আর একটি পশ্চিমমুখী পঞ্চরথ শিখর শিবমন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটির বরণ্ডের কাছে বাঁকানো কার্নিস যুক্ত হওয়ায় সেটির স্থাপত্য একান্তই অভিনব বলা চলে। প্রায় ১০′ (৩·১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটি যে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, তা ঐ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

কোটালপুর: 'এরেটি' নিবন্ধে বেলেঘাটা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে উত্তর-পুবে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন কোটালপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২০৩)। এ গ্রামে ভূঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী এক পঞ্চরত্ন মন্দির ও ন'চূড়া রাসমঞ্চ এখানকার পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরে প্রবেশপথের উপরিভাগে কার্নিসে ও দুপাশে খাড়াভাবে একসারি করে পোড়ামাটির যেসব ফলক দেখা যায়, তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে দশাবতার, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, কামবদ্ধ নরনারী এবং ঢেঁকিবাহন নারদ প্রভৃতির মূর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে

১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। কাছাকাছি রাসমঞ্চটির প্রতি খিলানের স্তম্ভে নিবদ্ধ পোড়ামাটির বিবিধ বাদিকামূর্তি একান্তই মনোরম।

গ্রামের পুব-পাড়ায় এক বকুল গাছের তলায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব গোঁসাইয়ের চারচালা সমাধি মন্দিরটিও পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এটি আঠার শতকের শেষদিকে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এখানে একটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

কোতাইগড়: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর স্টেশন থেকে খড়্গপুর-বেলদা পিচের সড়কে মকরামপুর; সেখান থেকে মোরাম ও কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন কোতাই জিএ্যাগেড়া মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৫০৮) কোতাইগড় গ্রাম। এ গ্রামে পাল পরিবারের গড়বাড়ির ভিতর শ্যামসুন্দর ও লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী বিরাটাকার শিখর মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হলেও সে দেবতার আটকোণা রাসমঞ্চটিতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পোড়ামাটির বেশ কিছু ভাস্কর্য অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায়।

গড়ের সামান্য পুবে গ্রামস্থ পার্বতীনাথ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এ গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে শিবদুর্গা ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যেসব সুদৃশ্য 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়, তার মধ্যে রাসমণ্ডল অলঙ্করণটি একান্তই দর্শনীয়। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে ভাস্কর্যশৈলী নিরিখে এটি উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

কোলন্দা :দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-দেহাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দেহাটি; সেখান থেকে পুবে কেলেঘাই নদীর বাঁধ রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার অর্ন্তগত কোলন্দা গ্রাম (জে এল নং৩২২)। এই গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি, স্থানীয় ভুঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির। যদিও মন্দিরটির চূড়াগুলি বর্তমানে বিনষ্ট, তাহলেও মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে নিবদ্ধ হয়েছে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ পোড়ামাটির ফলক। এছাড়া পশ্চিম দেওয়ালে বেশ বড় আকারের পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ মিথুনরত নরনারীর মূর্তি একান্তই অভিনব। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, মন্দিরটির স্থাপত্য ও অলঙ্করণ-শৈলীর বিচারে এটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়।

কেলেঘাই নদীর অপর পারে, পটাশপুর থানার অন্তর্গত গোকুলপুর গ্রামে (জে.এল নং ২৬) এক উঁচু ঢিবির উপর একটি তুলসীমঞ্চ দেখা যায়। কিংবদন্তী যে, বৈষ্ণব সাধক গোকুলানন্দের প্রবর্তিত প্রথানুসারে একটি তুলসী গাছের গোড়ায় ভক্তবৃন্দ দীর্ঘদিন ধরে প্রতি পৌষ সংক্রান্তির উৎসবে মাটি ও জল দান করায় বর্তমানে এই স্তূপটির সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে যে বৃহৎ মেলাটি বসে থাকে, তা 'তুলসীচারা যাত্রা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

কোলাঘাট: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কোলাঘাট স্টেশন থেকে উত্তরে এক কিলোমিটার

দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন কোলাঘাট শহর (মৌজা ঃ কোলা, জে এল নং ২৮৭)। এখানে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন স্থানীয় জৈন ধর্মাবলম্বীদের প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয়ে স্থাপিত তীর্থঙ্কর চন্দ্রপ্রভ'র উপবিষ্ট একটি প্রস্তর মূর্তি এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাসম্পদ। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে, রূপনারায়ণ নদীবক্ষে ৬ নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী সেতুটি (বর্তমানে শরৎ সেতু) নির্মাণকালে এই মূর্তিটি পাওয়া যায়। মার্বেল পাথরে নির্মিত এ মূর্তিটির প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের জন্য পূর্ত (সড়ক) বিভাগের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিকরা এটিকে উনিশ শতকের বলে মতামত দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী এটিকে স্থানীয় জৈন মন্দিরে সংরক্ষণের জন্য আদেশ দেন। তদবধি ঐ মূর্তিটি উল্লিখিত জৈন মন্দিরের এক কুলঙ্গিতে সংস্থাপিত হয়েছে।

এছাড়া, কোলাঘাট বাজারের নিকটবর্তী সত্যপীরের একগম্বুজ মাজারটিও এখানকার এক পুরাকীর্তি এবং এটিও আঠার শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে জানা যায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ এই পীরের মাজারে এসে মানত করেন ও মনোবাসনা পূর্ণ হলে শিরনি দেন।

ক্ষীরপাই ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন ক্ষীরপাই (জে এল নং২১৪)। একদা রেশম বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাত স্থানীয় পৌরসভার অন্তর্গত এই শহরটির আশপাশে বেশ কিছু পুরাকীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। এ শহরের মালপাড়ায় ইটের পুবমুখী রাধাদামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে নিবদ্ধ পোড়ামাটির অলঙ্করণসজ্জা একান্তই দর্শনীয়। সেটির খিলানশীর্ষে যেসব পোড়ামাটির ফলকগুলি দেখা যায়, তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা এবং লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য। এছাড়া শিকারদৃশ্য ও ফুলকারি নকাশি অলঙ্করণও এ মন্দিরটির আর এক সম্পদ। মন্দিরটির প্রবেশপথের কিছু উপরে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

শ্রীশ্রী ৺ রাধা	শ্রীশ্রী ৺ জিউ
দামোদর ঃ	সিতলা মাতা
তব চরণ	তব চরণ ভ
ভরসা	রসা গো

সকাব্দা ১৭৩৯ সন ১২২৪
সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ
শ্রীমদনমোহন দত্ত।"

অতএব ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫'৬" (৪·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরটি ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলেছে। অবিলম্বে এই 'টেরাকোটা'-সুসজ্জিত মন্দিরটির সরকারীভাবে সংরক্ষণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য উত্তরে খড়েশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিতে একইসঙ্গে পোড়ামাটি ও পঙ্খ-সজ্জার নিদর্শন দেখা যায়। এটিতে নিবদ্ধ যে

অসংখ্য পোড়ামাটির গোপিনী মূর্তি দেখা যায়, সেগুলি যে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা তা বেশ বোঝা যায়। এ মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ রয়েছে, তার পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রী খড়কে/সর শিব ঠাকুর/সকাব্দা ১৭৮৩।৫।২১/সন ১২৬৮ সাল/শ্রী গঙ্গাধর দত্ত।" অতএব ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৩' (৭·১ মি·) প্রস্থে ২১'৪" (৬·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯ মি·)।

এখানের হাটতলায়, পানি পরিবারের শীতলানন্দজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির ফলক-সজ্জা দেখা যায়। মন্দিরে প্রবেশপথের দুদিকে যে দুটি প্রতিষ্ঠাফলক নিবদ্ধ হয়েছে তার পাঠ নিম্নরূপ:

(পুব পাশে) "শ্রীশ্রীসিতলান/ন্দ জিউ স্বরনং/শ্রীঅদৈত চর/ণ পানি সাঃ/খিরপাই সন/১২৪৬ সাল," (পশ্চিমপাশে) 'শ্রীশ্রীসিতলান/ন্দ জিউ শ্বরণং অদেতচরণ/পানি সাকিম খি/রপাই সন ১২/৪৬ সাল ১ বৈসাখ/আরম্ভ সাঃ ৪৭ জৈষ্ঠ"। অতএব ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২১' (৬·৪ মি·) প্রস্থে ১৮'৮" (৫·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

ঘাটাল-চন্দ্রকোণা প্রধান সড়কের ধারে প্রতিষ্ঠিত আর একটি দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের একরত্ন মন্দির বহুদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকার পর সম্প্রতি সেটিকে সংস্কারযোগ্য করে তোলা হয়েছে। তবে খেয়ালখুশিমাফিক অসংখ্য চূড়া লাগিয়ে সেটিকে এক বিসদৃশ স্থাপত্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে এটি অনুমান খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষদিকে নির্মিত হয়েছিল।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে নুনেবাজার এলাকায় দক্ষিণমুখী যে দালান মন্দিরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায়, সেটি যে আঠার শতকের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে মন্দিরটিতে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। মন্দিরটির প্রবেশপথের খিলানের উপর নিবদ্ধ সে প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "সন ১২০৪/শকাব্দা ১৭২০"।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য দূরত্বে বাখরকুটা এলাকার মাড়োতলায় শীতলার পুবমুখী দালান মন্দিরটির সামনের অংশ বিনষ্ট হলেও মন্দিরটিতে যে কাঠের অলংকৃত দরজাটি আছে তা একান্তই চিত্তাকর্ষক। এ দরজাটির পাল্লায় খোদিত হয়েছে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে কাঠের এ মূল্যবান কপাটটি যে অচিরেই বিনষ্ট হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কাছাকাছি চাবড়ি পরিবারের পরিত্যক্ত পুবমুখী এক দালান মন্দিরও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে মন্দিরের সম্মুখভাগে পঙ্খপলস্তারায় অলংকরণ-ভাস্কর্য দেখে মনে হয়, এ মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ পরিবারের স্নানের ঘাটে যে আটচালা ও আটকোণা মন্দির দুটি দেখা যায় সেটিতে নিবদ্ধ পোড়ামাটির দ্বারপালমূর্তিগুলি এখনও অটুট রয়েছে।

এখানের গায়েনপাড়ায় চৌধুরী পরিবারের দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য-অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটিতে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা এবং রাম ও হনুমান সম্পর্কিত টেরাকোটা-ফলক নিবদ্ধ হলেও, ভিত্তিবেদীর উপরে উৎকীর্ণ সাহেবের তামাকুসেবন ও বন্দুকধারী সাহেবদের মিছিল প্রভৃতি পোড়ামাটির ফলকগুলি

বেশ হৃদয়গ্রাহী। এ মন্দিরটিতেও কাঠের অলঙ্কৃত কপাটের পাল্লায় খোদিত হয়েছে রামসীতা, হনুমান, লক্ষ্মী, বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তি। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়। প্রায় ৫′ (১·৫ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৬′ (৪·৯ মি·), প্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

ক্ষীরাটি : ঘাটাল-মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে চন্দ্রকোণা; সেখান থেকে উত্তর-পুবে চন্দ্রকোণা ক্ষীরাটি সড়কে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন ক্ষীরাটি গ্রাম (জে এল নং ৫৪)। এ গ্রামে রায় পরিবারের দক্ষিণমুখী আটচালার স্থাপত্য বেশ অভিনব। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরে নিবদ্ধ পঙ্খপলস্তারায় উৎকীর্ণ নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও, মন্দিরটির মস্তকে স্থাপিত আমলক ও কলসটির উপর পঙ্খের সূক্ষ্ম অলঙ্করণ একান্ত দর্শনীয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়ে থাকবে।

এ মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে এক ঘেরা চত্বরে স্থানীয় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দুর্গা-দালান, একটি আটচালা ও বারোটি শিখর-মন্দির সহ একটি রাসমঞ্চও দেখা যায়। রাসমঞ্চটি আটকোণা ও ন'চূড়াযুক্ত এবং সেটির আটটি কোণের দেওয়ালে খিলানের উপর নিবদ্ধ পোড়ামাটির প্রভূত অলঙ্করণসজ্জা এ জেলার খুব কম রাসমঞ্চেই দেখা যায়।

ক্ষেত্রহাট : কোলাঘাট-মেদিনীপুর ৬ নং জাতীয় সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দেউলিয়া; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে পিচের সড়কে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন ক্ষেত্রহাট গ্রাম। এ গ্রামে জানা পরিবারের স্থাপিত তারকনাথ শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকসজ্জা বিদ্যমান। এছাড়া পঙ্খপলস্তারায় খোদিত নানাবিধ নকাশি ভাস্কর্যও দেখা যায়। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলকটির পাঠ নিম্নরূপ:

"সকাব্দা ১৮০১ শ্রীশ্রীতারকনাথ শিব ঠাকুরা কিত্তি। সন ১২৮৬ সাল শ্রীল শ্রীযুত রামচাঁদ জানা সাকিম খেত্রহাট/শ্রীল শ্রীপ্রেমচাঁদ মিস্ত্রি সাকিম পোলশর এই মন্দির/গঠনকারি।" অতএব ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৬′ (৪·৯ মি·), প্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

ক্ষেপুত : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সুলতাননগর থেকে পুবে হাঁটা পথ প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বে অথবা দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বাগনান স্টেশন থেকে বাগনান-মানকুরঘাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মানকুরঘাটে লঞ্চ যোগে গোপীগঞ্জ হয়ে হাঁটাপথে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন উত্তরবাড় মৌজাভুক্ত (জে এল নং ২২২) ক্ষেপুত গ্রাম। এ গ্রামের বিখ্যাত দেবী ক্ষিপ্তেশ্বরীর নামেই গ্রামের এই নামকরণ হয়েছে বলে জনশ্রুতি। এছাড়া পাগলা কুকুর কামড়ানো রোগীর রোগ নিরাময়ের জন্য খ্যাত এ দেবীর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি

এক পুরাকীর্তি। দেবীর নাম ক্ষিপ্তেশ্বরী হলেও, বিগ্রহ পাথরের অষ্টভুজা দুর্গা। এছাড়া প্রায় ১'৬" (০·৪৫ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট সেন আমলের প্রাচীন একটি বিষ্ণুমূর্তিও এ মন্দিরে রক্ষিত হয়েছে। মন্দিরের খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক বর্তমান অপসারিত হলেও, প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীমাতা খে/পুতেস্বরি চরণে/স্বরণং সুভমস্তু/সকাব্দা ১৭০১/সন ১১৮৬ সাল/ মাহ আশ্বিন ১১ই।" অতএব ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি নির্মিত। মন্দিরটির পুবদিকে নওবতখানার দেওয়ালে নিবদ্ধ একটি আয়তাকার পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ কয়েকটি নর্তকীর মূর্তিও দেখা যায়। এছাড়া এ মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপবিষ্ট ভঙ্গিমায় কষ্টিপাথরের একটি ভগ্ন মূর্তিও দেখা যায়, যা স্থানীয় লোকেরা বুদ্ধের মূর্তি বলে অনুমান করে থাকেন। প্রাপ্ত এইসব পাথরের পুরাবস্তুগুলির ভাস্কর্যশৈলী যে পাল-সেন আমলের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ মন্দিরের কাছাকাছি চৌধুরীবেড় নামক স্থানে একটি উঁচু ঢিবিকে গ্রামের লোকেরা ফিঙ্গারাজার বসতবাড়ি বলে চিহ্নিত করে থাকেন। এ ঢিবিটিতে অসংখ্য খোলামকুচি ও অন্যান্য মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায়, যেগুলিতে বেশ প্রাচীনত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। তবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক' উৎখনন বাঞ্ছনীয়।

ক্ষেপুতের উত্তরপাড়ায় কালিন্দীরায় শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরে সামান্য পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর তেমন কোন ভাস্কর্য নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। মন্দিরটির বাইরে দক্ষিণ পাশের চত্বরে একটি বার-তের শতকের কষ্টিপাথরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়।

ক্ষেপুতের বাজার এলাকায় (মৌজা-দক্ষিণবাড় জে এল নং ২২৪) দন্ডেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী দালান মন্দিরটিও যে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত তা ঐ মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। এ ছাড়া এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পঙ্খের বেশ কিছু নকাশি অলঙ্করণও রয়েছে।

খড়কুসুমা: খড়গপুর-বাঁকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গড়বেতা: সেখান থেকে পুবে পিচের রাস্তায় প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার খড়কুসুমা গ্রাম (জে· এল· নং ৭৮৯)। এ গ্রামটিতে পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসাবে যে কয়টি মন্দির-দেবালয় দেখা যায় সেগুলির মধ্যে পণ্ডিত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের আটচালা মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটির সামনে ও পিছনের দেওয়ালে পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ অলঙ্করণসজ্জা ছাড়া, কাঠের নকাশি সজ্জাযুক্ত একটি কপাটও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

এ গ্রামের চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুর পুবমুখী আটচালা মন্দিরটির কার্নিসের নিচে ও দুপাশে খাড়াভাবে একসারি করে যে 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়, সেগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা। তবে পোড়ামাটির ফলকগুলি বেশ স্থূল হলেও, লৌকিক দেবতা মনসার ফলকটি একান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৩' (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। এ মন্দিরটিতেও কোন

প্রতিষ্ঠালিপি নেই; কিন্তু স্থাপত্য বিচারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে পান পরিবারের শ্রীধরজীউর পুবমুখী আটচালা মন্দিরটিতেও বেশ কিছু 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ রয়েছে। এটিতে নিবদ্ধ দশাবতার গজলক্ষ্মী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সিংহবাহিনী প্রভৃতি মূর্তিগুলির ভাস্কর্যশৈলী বেশ নিরেস ধরনের। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৩′ (৭ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

খড়ার: 'উদয়গঞ্জ' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছাবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সেখানকার সংলগ্ন ঘাটাল থানার অন্তর্গত খড়ার শহর (জে· এল· নং ৪৪)। একদা কাঁসা-পিতল শিল্পের জন্য খ্যাত এই পৌরশহর এলাকাটিতে বেশ কিছু পুরাকীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। এখানের ব্রাহ্মণপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন রীতির মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। সেটির সামনের দেওয়ালে সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।

আলোচ্য এ মন্দিরের কাছাকাছি ঐ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিবের একটি আটচালা মন্দির দেখা যায় এবং একদুয়ারী সে মন্দিরটির প্রবেশপথের দুপাশে দুটি পোড়ামাটির দ্বারীমূর্তি ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। স্থাপত্য নিরিখে এ মন্দিরটিও পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক।

রায়পাড়ায় ষষ্ঠীতলায় বুড়োশিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরের ত্রিখিলানের উপরিভাগে একসারি টেরাকোটা-ফলকসজ্জা ছাড়া, সেটিতে দীর্ঘ এক লাইন প্রতিষ্ঠালিপি নিবদ্ধ রয়েছে, যার হুবহু পাঠ নিম্নরূপ:

"শকাব্দা ১৮০০ ইং ১৮৭৮ সন ১২৮৫ সাল শ্রীরামতনু মিস্ত্রীঃ সাং খিরপাই। শ্রীশ্রী ৺জীউ প্রত্তন কত্তা। শ্রীশ্রীবুড় সীব। কিত্তী শ্রীরমানাথ চোউধরী ॥ সাং খড়ার ॥ শ্রীমাহিন্দ্র নাথ মিস্ত্রি। সাং সেনহাটা জানিবেন।"

অতএব এ মন্দিরটিতে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দ ছাড়াও ইংরাজী সালের উল্লেখ একান্তই অভিনব। এছাড়া এ লিপি থেকে জানা গেল এই মন্দিরটির স্থপতি সেনহাটার মাহিন্দ্রনাথ মিস্ত্রী, শুধুমাত্র এই মন্দিরটিই নয়, ইতপুর্বে আলোচিত 'আলুই' ও 'উদয়গঞ্জ-কৃষ্ণপুর' পল্লীর মন্দির নির্মাণেও অংশ গ্রহণ করেছেন।

আলোচ্য এ পাড়াতেই স্থানীয় সাঁতরা পরিবারের একটি পুবমুখী ইটের নবরত্ন মন্দির দেখা যায়। নবরত্ন মন্দির নির্মাণের প্রথাগত স্থাপত্য অনুযায়ী এ মন্দিরের ছাদ বাঁকানো আকারের না হয়ে সমতল করা হয়েছে। বেশ কিছু পঙ্খের উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য এ মন্দিরটির সম্পদ বলা যেতে পারে। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই তবে স্থানীয় জনসাধারণের মতে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। এ মন্দিরের কাছাকাছি রায় পরিবারের একটি পুবমুখী নবরত্ন মন্দির ও একটি শিখর-দেউলও দেখা যায়। এ দুটি মন্দিরের মধ্যে কেবলমাত্র নবরত্ন মন্দিরটিতেই সামান্য পোড়ামাটির ভাস্কর্য

লক্ষ্য করা যায়। আকারপ্রকারে এ মন্দিরটিও পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

এখানের পুবপাড়ায় ঘোড়ই পরিবারের গৃহদেবতার দক্ষিণমুখী মন্দিরটি পঞ্চরত্ন রীতির এবং সেটিতেও সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে। এ মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে, তা থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আলোচ্য এ পাড়াতেই মণ্ডল পরিবারের পুবমুখী দামোদরজীউর আরও একটি ইঁটের পঞ্চরত্ন মন্দির ঠিক পুরাকীর্তির পর্যায়ে না পড়লেও এটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত সে লিপির হুবহু পাঠ নিম্নরূপ:
"৭ ৺শ্রীশ্রী ৺জীউ মন্দির সন ১২৯৩ তিরানব্বই সালের রথযাত্রা আরম্ভ/সন ১২৯৫ সালের ৩ ফাল্গুন শেষ হইল মিস্ত্রি শ্রী সিতলাচরণ/কুণ্ডু ৺পদ্মলোচন মণ্ডল পুত্র শ্রীশ্রীচরণ মণ্ডল সাং খড়ার পং বরদা।"
অতএব ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে এ মন্দির নির্মাণে প্রায় তিন বৎসর কাল সময় অতিবাহিত হয়েছে।

খণ্ডরুই: দাঁতন থানার এলাকাধীন 'কেদার' নিবন্ধে 'খাকুড়দহ' পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে দক্ষিণে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁতন থানার এলাকাধীন খণ্ডরুই গ্রাম (জে এল· নং ২৪৫)। এখানকার সিংহ-গজেন্দ্রমহাপাত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউর পুবমুখী ইটের আটচালা মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির খিলানশীর্ষে একদা পোড়ামাটির ফলকসজ্জা ছিল; সম্ভবতঃ সংস্কারের সময় সেগুলিকে বিনষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ভিত্তিবেদীর উপরে স্তম্ভমূলে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে শিকারদৃশ্য , মিথুন ও নৃত্যরত নটী প্রভৃতি মূর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩২′ ৬″ (৯·৯ মি·), প্রস্থে ২৬′ ৩″ (৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

মূল মন্দিরটির সম্মুখভাগে ইটের বৃহদাকার চারচালা নাটমন্দিরটি বেশ অভিনব। এটি দৈর্ঘ্যে ৩৭′ (১১·২ মি·), প্রস্থে ১৯′ (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। আলোচ্য এ মন্দির ও নাটমন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে এগুলি খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়।

খাঞ্জাপুর: 'এরেটি' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্তী দাসপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম খাঞ্জাপুর (জে· এল· নং ২০৫)। এখানের রথতলায় মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত হরনাগর শিবের আটচালা এবং পাশাপাশি বিশালাক্ষীর দালান মন্দির দুটি এখানকার পুরাকীর্তি। দুটি মন্দিরই দক্ষিণমুখী এবং হরনাগর শিবের পুব দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ একটি মিথুন মূর্তি ছাড়া মন্দির দুটিতে তেমন কোন ভাস্কর্য-অলঙ্করণ নেই। বিশালাক্ষীর দালান মন্দিরে নিবদ্ধ মার্বেল পাথরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে,এ মন্দিরটি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। সুতরাং পূর্বোক্ত হরনাগর শিব মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও অনুমান যে, ঐ মন্দিরটিও এ মন্দিরের সমসাময়িক।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী রাধাবল্লভের দালান

মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপর একসারি টেরাকোটা-ফলক দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু শিবদুর্গা, রামলক্ষ্মণ ও হনুমান প্রভৃতি। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৮′ (৫·৪ মি·), প্রস্থে ১৫′ (৪·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে এটি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত।

খানামোহন: 'আলীশাগড়' নিবন্ধে ডেবরা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে ডেবরা-মেদিনীপুর ৬ নং জাতীয় সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) অর্জুনির উত্তরে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন খানামোহন গ্রাম (জে· এল· নং ৩১৬)। এ গ্রামে কাঁসাই নদী তীরবর্তী পাঁড়ে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নৃসিংহের পুবমুখী পঞ্চরত্নটি পুরাকীর্তি হলেও বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত। তাহলেও একসময়ে এ মন্দিরটিতে যে উৎকৃষ্ট পঙ্খের অলঙ্করণ ছিল, তার বেশ কিছু নিদর্শন এখনও বর্তমান। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

খারড়: মেছেদা-হেঁড়িয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) হেঁড়িয়া; সেখান থেকে পশ্চিমে হেঁড়িয়া-মাধাখালি সড়কে কল্যাচক হ'য়ে, দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে খেজুরী থানার অন্তর্গত খারড় গ্রাম (জে· এল· নং ১২৭)। এ গ্রামে মহারুদ্রেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর–দেউলটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের জগমোহনটি প্রথাগতভাবে পীঢ়ারীতির বদলে মূল মন্দিরটির মতই স্বল্প উচ্চতাসম্পন্ন শিখর রীতির। মন্দিরটির এই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ছাড়া, জগমোহনে প্রবেশপথের খিলানশীর্ষে শিবদুর্গা এবং শিবলিঙ্গ পূজারী মোহন্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ এক লাইন লিপিসহ কামবদ্ধ নরনারীর মূর্তি খোদাই এক ফলক। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে স্থাপত্যশৈলী বিচারে এ মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ ৯″ (৪·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ ৬″ (৩·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৬′ (১৪ মি·)। এ দেবালয়টির ছাদ লহরানির্ভর গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

খুকুড়দহ: পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার অন্তর্গত খুকুড়দহ গ্রাম (জে· এল· নং ১৫০)। এ গ্রামের শীতলানন্দ শিবের পশ্চিমমুখী ইটের আটচালা মন্দিরটি জেলার বৃহত্তম আটচালা মন্দিরগুলির অন্যতম এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১′ (৬·৪ মি·) মিটার এবং উচ্চতায় প্রায় ৫৩′ (১৬·১ মি·)। মন্দিরটির দক্ষিণে যে প্রবেশপথটি দেখা যায় সেটি মন্দিরের গর্ভগৃহ সংলগ্ন ভোগঘরের প্রবেশপথ। মন্দিরটিতে কোন অলঙ্করণ বা প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। আলোচ্য এ মন্দিরটির পাশে স্থানীয় লৌকিক দেবী খুকুড়চণ্ডীর এক দালান রীতির মন্দির দেখা যায়। তবে এ দেবী

প্রাচীন হলেও, মন্দিরটি তেমন পুরাতন নয়।

খেজুরী : 'খারড়' নিবন্ধে হেঁড়িয়া পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে হেঁড়িয়া-খেজুরী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) খেজুরী থানার অন্তর্গত খেজুরী সদর (জে· এল· নং ৪৯)। খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম দিকে একদা কলকাতা থেকে নদীপথে সমুদ্রযাত্রার পূর্বে আলোচ্য এই স্থানটি জাহাজ নোঙ্গরের উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হওয়ায় পরবর্তী সময়ে বন্দর হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ফলে সে সময় এখানে নাবিক ও যাত্রীদের জন্য হোটেল, ডাকঘর, দোকান ও ঘরবাড়ি নির্মিত হওয়ায় এটি একটি ছোটখাটো শহরের রূপ গ্রহণ করে। এছাড়া এখান থেকে কলকাতায় দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম কলকাতা-খেজুরী সিমাফোর-টেলিগ্রাফের জন্য প্রয়োজনীয় ইঁটের সুউচ্চ স্তম্ভও বসানো হয়। খেজুরীতে নির্মিত সেই টেলিগ্রাফ প্রেরণের পরিত্যক্ত স্তম্ভটি সেকালের আড়ম্বরপূর্ণ সাহেবী আমলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এছাড়া সমুদ্রতীরবর্তী বিধায়, উনিশ শতকের প্রথম দিকে খেজুরীতে এক স্বাস্থ্যনিবাসও গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ইংরেজ নাগরিকেরা সেজন্য এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় আসতে শুরু করেন। এর মধ্যে যাঁরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন তাঁদের জন্য এক নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রও দেখা যায়। প্রাচীর ঘেরা সমাধিক্ষেত্রটিতে যে তেত্রিশটি সমাধি স্তম্ভ দেখা যায় তার মধ্যে একুশটিতে নানাবিধ ভাষ্যে উৎকীর্ণ মার্বেল প্রস্তরফলক নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু দুঃখের কথা, সে সব সমাধিফলকগুলি বর্তমানে অপহৃত।

খেজুরীর কাছাকাছি মতিলালচক মৌজার কাউখালিতে বিগত ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিত্যক্ত আলোকস্তম্ভ দেখা যায়। প্রায় ১০০′ (৩০·৪ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এই স্তম্ভটি প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী বর্তমানে পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

খেলাড় : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গাপুর স্টেশন থেকে খড়্গাপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শ্যামলপুরা; সেখান থেকে পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গাপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত খেলাড় গ্রাম (জে· এল· নং ৩৪২)। এ গ্রামে বসু পরিবারের ইটের দক্ষিণমুখী দামোদরজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে পদ্মের অলঙ্করণ ছাড়াও যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ:

"৺ হরিচরণ বসুর অর্থব্যয়ে ও রতিনাথ বসুর পরিচালনায়/কুলদেব শ্রীদামোদ/র জয়তি সেবাত শ্রীদর্পনারা/য়ণ বসু দাস শ্রীমন্দির গঠন কা/রি শ্রীমাধব শ্রীদাম দাস সন/১২৭৫ সাল।"

অতএব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটিতে উল্লিখিত লিপিটি ছাড়াও গর্ভগৃহের দেওয়ালে আরও একটি লিপি নিবদ্ধ রয়েছে, যার পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ আদি ॥ সন ১২৭২ সা/ল মাঘে পত্তন ॥ অন্ত ॥ ১২৭৫ সাল বৈসাখে ক'য্য/সাঙ্গ ও অর্পণ ॥ মধ্যে দুর্ভিক্ষ ১২৭৩ সাল টাকায়/তের সের ধান্য ॥ তাতেও কারিগর করেন কর্ম্ম ॥"

শেষোক্ত এই লিপিতে সামাজিক ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য যে রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়া মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহের বেদীটি বেশ দীর্ঘ ও বাঁধানো এবং এই বেদীর গায়ে বসু বংশের বৃহৎ এক কুলজীনামা উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে যা একান্তই অভিনব। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ ৮″ (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় শম্ভুনাথ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এক উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দির দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। একদুয়ারী এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

আলোচ্য এই মন্দির প্রাঙ্গনে একটি গাছের গোড়ায় রক্ষিত প্রায় ৩৩″ (১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এক দেবী মূর্তি দেখা যায়। সাধারণভাবে বাশুলী নামে পরিচিত সে মূর্তিটির অর্ধেক অংশ বর্তমানে গাছের শিকড়ে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় মূর্তিটির সনাক্তকরণে বেশ অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

গ্রামের ভট্টাচার্য পাড়ায় লক্ষ্মীজনার্দনের পুবমুখী জগমোহনসহ শিখর-দেউলটি বেশ উচ্চতাবিশিষ্ট হলেও সেটি পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে না।

খেলাড়গড় : খড়্গাপুর -ধূমসাই পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বালিগেড়িয়া থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে নয়াগ্রাম থানার এলাকাধীন খেলাড়গড় (জে· এল· নং ১০২)। খ্রীষ্টীয় পনের শতকে স্থানীয় ভূস্বামী প্রতাপচন্দ্র সিংহের নির্মিত মাকড়া পাথরের এক বিরাট দুর্গ এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী যে, প্রতাপচন্দ্র এই দুর্গ ও তৎসংলগ্ন পরিখার নির্মাণকার্য শেষ করে যেতে পারেননি, তবে তাঁর সুযোগ্য পুত্র বলভদ্র সিংহ এ দুর্গ নির্মাণের কাজ শেষ করেন। বর্তমানে এই দুর্গ ও দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন হলেও, দুর্গের অভ্যন্তরে নির্মিত রাজবাড়িটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখনও এই গড়ের ভিতর নীলাভ পাথরে খোদাই যে মূর্তিটিকে দেখা যায় সেটি একান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। এটি এক অশ্বারূঢ় নারীপুরুষের মূর্তি, যার মাকড়াপাথর খোদাই অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় এ জেলার বাড়ুয়া ও অন্যান্য স্থানে। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, "আমাদের অনুমান, উহা আমাদের এই ভারতবর্ষের দেবতা কামদেব ও রতিদেবীর মূর্তি। পুরুষ মূর্তিটির হস্তস্থিত তীর-ধনুক কামদেবের ফুলশরের কথাই স্মরণ করিয়া দেয়।"

খোর্দা বিষ্ণুপুর : ঘাটাল-পাঁশকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বকুলতলা; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন খোর্দা বিষ্ণুপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৪৪)। এ গ্রামে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী একটি পঞ্চরত্ন এবং তারই পাশাপাশি দুটি শিখর শিবমন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। পঞ্চরত্ন মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ভাস্কর্যফলকগুলির বিষয়বস্তু হল, রাম-রাবণের যুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ দৃশ্যাবলী। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় স্থানীয়ভাবে জানা যায় যে, এটি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে

নির্মিত। শিখর-মন্দির দুটিতে অবশ্য তেমন কোন অলঙ্করণ-সজ্জা নেই। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরগুলি ক্রমশই বিনষ্ট হতে চলেছে।

গগনেশ্বর: 'কেশিয়াড়ী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে কেশিয়াড়ী-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কুকাই হয়ে পশ্চিমে হাঁটা পথে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে কেশিয়াড়ী থানার এলাকাধীন গগনেশ্বর গ্রাম (জে· এল· নং ১৫৪)। একদা তসর শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ এই গ্রামে 'কুরুমবেড়া' বা 'করমবেড়া' নামে পরিচিত মাকড়াপাথরের বিরাট এক স্থাপত্য-সৌধ এখানকার পুরাকীর্তি। প্রায় ১২' (৩·৬ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট ও ৩'(০·৯ মি·) চওড়া ঝামাপাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আয়তাকার এই স্থাপত্যকীর্তিটির প্রধান প্রবেশপথ উত্তরমুখী। ভিতরে প্রায় ৮' (২·৪ মি·) প্রশস্ত লহরা খিলানযুক্ত এক খোলা অলিন্দ দিয়ে চারিদিক বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে প্রশস্ত সমতল চত্বর। বর্তমানে এটির দক্ষিণ দিকের কিছুটা অংশ ভগ্ন। সৌধটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩০০' (৯১·১ মি·) এবং প্রস্থে ২২৫' (৬৮·১ মি·)। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থিত পুবদিকে লাগোয়া একটি সপ্তরথ দেউলের ভগ্নাবশেষ এবং পশ্চিমদিকে একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ লক্ষ্য করা যায়।

এ পুরাকীর্তিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে, যোগেশচন্দ্র বসু তাঁর রচিত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, "....মন্দির গাত্রে উড়িয়া ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাহার প্রায় সকল অক্ষরই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কেবল যে দু'একটি স্থান অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আছে, উহা হইতে "বুধবার" ও "মহাদেবঙ্ক মন্দির" এই দুইটি কথা মাত্র পাওয়া যায়। জনশ্রুতি, উড়িষ্যাধিপতি রাজা কপিলেশ্বর কর্তৃক এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই কথাই উক্ত প্রস্তর ফলকটিতে খোদিত ছিল। কপিলেশ্বর বা কপিলেন্দ্রদেব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ....এইরূপ কিংবদন্তী যে রাজা কপিলেশ্বরদেব কর্তৃক শিব মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বহুকাল যাবৎ উহা হিন্দুদিগের একটি পুণ্যস্থানরূপে পরিগণিত ছিল।" অতএব অনুমান করা যায়, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পনের শতকে নির্মিত প্রাচীর ঘেরা এই প্রাঙ্গনের মধ্যস্থানে ঐ মন্দির ও তৎসহ চারপাশে এই খোলা বারান্দাটি তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিব বিগ্রহটির নাম যে কপিলেশ্বর নামে অভিহিত ছিল সে সম্পর্কে পূর্বোক্ত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, "পূর্বোক্ত কপিলেশ্বর নামক মহাদেবই ঐ শিবলিঙ্গ এবং কপিলেশ্বরদেবের প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।" সে যাই হোক্, পরবর্তীকালে মোগল ও পরে মারাঠারা এটিকে সেনানিবাস অথবা ছাউনি হিসাবে ব্যবহার করায়, সাধারণ মানুষের কাছে এটি শেষ পর্যন্ত 'কুরুমবেড়া' বা 'করমবেড়া' দুর্গ হিসাবেই পরিচিত হয়।

এ দুর্গপ্রাকারের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত উল্লিখিত তিন গম্বুজ মসজিদের দেওয়ালে ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ যে শিলালিপিটি নিবদ্ধ আছে তা থেকে জানা যায়, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কোন এক মহম্মদ তাহির ১১০২ হিজরীতে অর্থাৎ ইংরেজী ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। সুতরাং এ থেকেই মনে হয়, ঐ সময়েই প্রাঙ্গনস্থিত মন্দিরটি বিনষ্ট হয় এবং এটি মোগলদের সেনানিবাসে পরিণত হয়। পরে

আঠার শতকের প্রথম দিকে মারাঠাদের ওড়িশায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এটিও তাদের হস্তগত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে তারাও এটিকে অন্যতম দুর্গরূপে ব্যবহার করে। বর্তমানে এটি ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসাবে ঘোষিত বলে জানা যায়।

গঙ্গাদাসপুর: 'ক্ষীরপাই' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পুবে এক কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত গঙ্গাদাসপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২২১)। প্রবেশপথে নহবতখানাযুক্ত এক ঘেরা অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত উমাপতি শিবের আটচালা মন্দিরটি এখানকার দ্রষ্টব্য। মন্দিরটির সম্মুখভাগে পঙ্খ ও পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২২′ ৪″ (৬·৮ মি·), প্রস্থে ২০′ ৫″ (৬·২ মি·) ও উচ্চতায় আনুমানিক ২৭″ (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান। এ মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত দশম-একাদশ শতকের কষ্টিপাথরের একটি সূর্যমূর্তিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া স্থানীয় দালাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের দালান রীতির মন্দির এবং রাসমঞ্চও এখানকার এক পুরাকীর্তি।

গড় আড়ড়া: খড়্গপুর-গড়বেতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মণ্ডলকুপি; সেখান থেকে দক্ষিণ-পূর্বে হাঁটা পথে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার অন্তর্গত গড় আড়ড়া (জে· এল· নং ৬৩)। একদা ব্রাহ্মণভূম পরগণার ভূস্বামীদের নির্মিত পরিখাযুক্ত এই গড়বাড়ির জন্য এলাকাটি গড় আড়ড়া নামে পরিচিত। ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে দেশছাড়া হয়ে চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এখানকার ভূস্বামীদের কাছে আশ্রয় লাভ করে বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন এবং তাঁর কাব্যে এই গড় সম্পর্কে লেখা হয়েছে: "ধন্যরে আড়ড়ার গড়, বাঁশ করে কড় কড় জয়চণ্ডী করে হানাহানি।"

বর্তমানে এ গড়ের মাকড়া পাথরের দেওয়াল ও পরিখার চিহ্ন দেখা গেলেও, গড়ের মধ্যে ইট ও পাথরের ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। গড়ের মধ্যে মাকড়া পাথর বাঁধানো ঘাটসহ একটি পুষ্করিণী এখনও সেই পূর্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে। দুঃখের বিষয় আজ থেকে প্রায় চারশো বছর পূর্বে এই অখ্যাত গড়বাড়িতে বসে যে কবি তাঁর কাব্যে সেকালের সমাজজীবনের এক নিখুঁত আলেখ্য তুলে ধরেছিলেন, সে কবির কোন স্মৃতিচিহ্নের নিদর্শন এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

গড়কিল্লা-হরশঙ্কর: মেছেদা-হলদিয়া জাতীয় সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) রামতারক; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে তমলুক থানার অন্তর্গত গড়কিল্লা-হরশঙ্কর গ্রাম (জে· এল· নং ৫১)। এখানে খ্রীষ্টীয় সতের শতকে কাশীজোড়া পরগণার ভূস্বামী প্রতাপনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত গড়বাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ১০′ (৩ মি·) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি লোহার কামান রাজবাড়ির স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আজও দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে জনসাধারণ এটিকে 'কালে খাঁ' কামান

নামে অভিহিত করে থাকেন। কামানটির গায়ে ফার্সী ভাষায় খোদিত যে লিপিটি আছে তা ভীষণভাবে ক্ষয়িত।

গড়বাড়ি: 'কাজলাগড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; ভগবানপুর থানার অন্তর্গত সেখানকার লাগোয়া দক্ষিণের গ্রাম গড়বাড়ি (মৌজা: মীর্জাপুর, জে· এল· নং ১৬০)। এ গ্রামে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। অলঙ্করণহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·)। ইটের তৈরি এ দেবালয়ের ত্রিখিলান দালানের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি খিলান করে এবং গর্ভগৃহের ছাদ পুব-পশ্চিমে পাশ–খিলেনের উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ দেবালয়টি স্থাপত্য বিচারে আনুমানিক আঠার শতকের শেষ দিকে স্থাপিত

গড়বেতা: খড়্গপুর-বিষ্ণুপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গড়বেতা থানার এলাকাধীন গড়বেতা শহর (জে· এল· নং ৫৭০)। এখানের প্রধান পুরাকীর্তি হল, দেবী সর্বমঙ্গলার উত্তরমুখী পীঢ়া রীতির জগমোহন সমেত মাকড়া পাথরের এক শিখর দেউল। এছাড়া চারচালা রীতির একটি নাটমন্দিরও এটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও এটি যে পরবর্তীকালের সংযোজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মূল দেউল ও জগমোহনের বিন্যাস ত্রিরথ এবং পীঢ়া রীতির জগমোহনটির উপরের ছাদ তিনটি ধাপে বিভক্ত। গর্ভগৃহ ও জগমোহনের ভিতরের ছাদ লহরাযুক্ত পদ্ধতিতে নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৬′ (১৪ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪′ (৭·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। মন্দিরটির বরণ্ডের নীচ বরাবর নানাবিধ নকাশি অলঙ্করণও দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, সেকালের বগড়ীর বিখ্যাত নৃপতি গজপতি সিংহ এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য নিরিখে এ মন্দিরটি ষোল শতকে নির্মিত বলেই অনুমান। মন্দিরে উপাসিত সর্বমঙ্গলার বিগ্রহটি হল কষ্টিপাথরে নির্মিত দ্বাদশভুজা সিংবাহিনীর মূর্তি। এছাড়া মন্দিরে আরও যে দুটি পাথরের মূর্তি দেখা যায়, সেগুলিকে স্থানীয় সেবাইতরা অন্নপূর্ণা ও ভৈরব নামে অভিহিত করে থাকেন।

গড়বেতার সর্বমঙ্গলা মন্দিরের পশ্চিমে কোঙরেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী মাকড়া পাথরের পীঢ়া-দেউলটিও এখানের এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায়প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)। মন্দিরটির উপরের ছাদ তিনটি স্তরে বিভক্ত এবং গর্ভগৃহের ছাদ লহরাযুক্ত পদ্ধতিতে নির্মিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে গৌরীপট্ট দ্বারা বেষ্টিত পাথরের এক শিবলিঙ্গ। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, এই কোঙরেশ্বর শিব দেবী সর্বমঙ্গলার ভৈরব। এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটিও পূর্বোক্ত সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সমসাময়িক।

আলোচ্য এই শহরে কানু গোঁসাইয়ের সমাধি মন্দিরটিও পীঢ়া রীতির। এ মন্দিরটিও মাকড়া পাথরের তৈরি এবং এটির উপরের ছাদ দুটি স্তরে বিভক্ত। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৭′ ১০″ (২·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·) এবং এটিরও ভিতরের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে

আকারপ্রকারে সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

গড়বেতায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল, ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত রাধাবল্লভের দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের আটচালা মন্দির। এ মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি নিবদ্ধ আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ/শ্রীরাধিকাব্রজপুরন্দরয়ো পদাব্জে/মল্লস্য পক্ষনবশেবধি সংখ্যকাব্দে।/শ্রীমল্লভূরমণ দুর্জন সিংহদেবঃ/সৌধংন্ন্যবেদয়দিদং গৃহমাদরেন ॥/৯৯২।"

সুতরাং ৯৯২ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা যে মল্লভূমের দুর্জন সিংহ, তা এ লিপি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় এবং এই থানার উড়িয়াশাই গ্রামের মন্দিরটি যে তাঁরই নির্মিত তা ইতিপূর্বে সে গ্রামের বিবরণী প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

গড়বেতায় সুকুল পরিবারের দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের মদনমোহনের একরত্ন রীতির মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়েছিল। এছাড়া গড়বেতা বাজারের সন্নিকটে এক প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গনে শিখর রীতির দ্বাদশ শিবালয় ও সতের চূড়া রাসমঞ্চ সহ লক্ষ্মীজনার্দনের আরও একটি একরত্ন মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে এসব মন্দির ও রাসমঞ্চ উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

গয়েশপুর : পাঁশকুড়া-বালীচক-লোয়াদা পিচের সড়কে লোয়াদা ; সেখান থেকে পশ্চিমে নদীর বাঁধ রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার অন্তর্গত গয়েশপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৪৬)। এ গ্রামে দক্ষিণমুখী শ্যামরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হলেও, বর্তমানে সেটি পরিত্যক্ত। এ মন্দিরটিতে অন্যান্য পোড়ামাটির ফলকসজ্জার সঙ্গে মিথুন ফলকও দেখা যায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির প্রবেশপথের উপর নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীশ্যামরায়জি/শুভমস্তু শকা/ব্দাঃ। ১৬৯২ সক/শঃ ১১৭৭ শন তারি/খ ৬ মাঘ সাঙ্গ।"

আলোচ্য মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে গোঁসাই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দালান মন্দির, রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চগুলিও, আকারপ্রকারে আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত। এ তিনটি সৌধে একদা পোড়ামাটির যেসব অলঙ্করণসজ্জা ছিল, বর্তমানে সেগুলির অধিকাংশই অন্তর্হিত হয়েছে।

গুড়চাকুলী : কোলাঘাট-মেদিনীপুর ৬ নং জাতীয় সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দেউলিয়া ; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত গুড়চাকুলী গ্রাম। এ গ্রামে কালীয়দমনজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা শিবমন্দিরটি এখানকার একমাত্র পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ একটি মার্বেল ফলকে খোদিত প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ:

"শ্রীগঙ্গারাম মান্না/সাং গুড়চাকুলি/সন ১২৬৫/২ ভাদ্র।"

অতএব ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৮′ (৫·৪ মি·) প্রস্থে ১৫′ ২″ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

গুয়াবেড়িয়া : মেছেদা-হলদিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সুতাহাটা থেকে উত্তর-পুবে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে সুতাহাটা থানার এলাকাধীন গুয়াবেড়িয়া গ্রাম (জে·এল· নং ৭৭)। এ গ্রামে মাধবানন্দ জীউর সাবেক আটচালা মন্দিরটি বিনষ্ট হওয়ায়, পরবর্তী সময়ে একটি আধুনিককালের মন্দির নির্মিত হলেও, মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহগুলি এক গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তু। এখানের তিনটি বিগ্রহই কষ্টিপাথরে নির্মিত বিষ্ণু মূর্তি এবং স্থানীয়ভাবে সেগুলির নামকরণ হয়েছে মাধব, নীলমাধব সাগরমাধব। তিনটি মূর্তির মধ্যে সাগরমাধবের মূর্তির পশ্চাদপটে বা-রিলিফে দশাবতারের মূর্তি খোদাই থাকায় সেটি বেশ বৈশিষ্টপূর্ণ বলেই মনে হয়।

আলোচ্য এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশে আরও একটি পুবমুখী আটচালা শিবমন্দির দেখা যায়। অলঙ্করণহীন, একদুয়ারী ঐ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

গোকুলনগর : 'কিশোরপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে কাঁসাইয়ের শাখা নদী পার হয়ে উত্তরে ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন গোকুলনগর গ্রান (জে· এল· নং ২৮)। এ গ্রামের ভট্টাচার্য পাড়ায় শীতলানন্দ শিবের পশ্চিমমুখী পঞ্চরথ শিখর-মন্দিরটি একটি পুরাকীর্তি। তবে মন্দিরটির যথাযথ সংস্কার বা রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় বর্তমানে সেটি জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়েছে। প্রবেশপথের উপরিভাগের খিলানে পদ্মপলস্তারায় খোদিত চার লাইন লিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী সিবচরণ ভরসা/সন ১২৪৩ সাল তারিখ ৯ শ্রাবণ/সনিবার কর্ম্ম সাঙ্গ শ্রীগয়া...../শ্রীনারায়ণ মিস্ত্রি।"

অতএব ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটিতে মন্দিরনির্মাণ কারিগরের নাম পাওয়া গেলেও তাঁর নিবাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। এছাড়া এ মন্দিরটির বাইরের দেওয়াল চতুষ্কোণাকার হলেও ভিতরের দেওয়াল আটকোণা এবং মন্দিরটির ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

আলোচ্য এই মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিবের উত্তরমুখী পঞ্চরথ একটি শিখর-মন্দিরও দেখা যায়। এ মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং প্রতিষ্ঠালিপিহীন মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলেই অনুমান।

গোপগড় : মেদিনীপুর-খেড়ুয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস ও রিক্সা চলে) মেদিনীপুর শহরের প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে কাঁসাই নদীতীরবর্তী গোপগড় (জে· এল· নং ১৪৮)। এখানে গোগৃহ, গোপগৃহ বা গোপগিরি নামে কথিত এক সুউচ্চ স্থানে মাকড়া পাথরের নির্মিত এক বিরাট প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, মহাভারতে বর্ণিত বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহটি এখানেই অবস্থিত ছিল।

'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে মেদিনীপুর পরগণায় দুটি দুর্গের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের অনুমান যে, ঐ দুটি দুর্গের মধ্যে একটি হল এখানের এই দুর্গটি এবং অন্যটি মেদিনীপুরের পুরাতন জেলখানা। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু এখানের এই প্রত্নস্থলটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "উত্তরকালে, কিছু কম শত বৎসর হইল, তাহারই (গোপগিরি) ধ্বংসাবশেষ লইয়া উক্ত স্থানের ভূম্যধিকারী তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় জমিদারগণ গোপগিরির উপরে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন। কালচক্রে তাহাও এক্ষণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গোপগিরির উপরে ত্রিকোণমিতিক জরীপের একটি স্তম্ভ আছে এবং গোপগিরির পাদদেশে পুরাতন বোম্বে রাস্তার পার্শ্বে গোপনন্দিনী নামে এক প্রাচীন দেবী আছেন।" যোগেশবাবুর বিবরণ অনুযায়ী বর্তমানে ঐ ত্রিকোণমিতিক স্তম্ভটির আর কোন চিহ্ন নেই, তবে গোপগড়ের পুবে অবস্থিত গোপনন্দিনীর মন্দিরটি এখনও বর্তমান। এ মন্দিরটি দক্ষিণমুখী চারচালা রীতির এবং বিগ্রহ পাথরের হলেও সে মূর্তিটি সিঁদুরলিপ্ত হওয়ার কারণে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৬″ (৩·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১০′ (৩ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে আকারপ্রকারে উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

গোপালনগর : কোলাঘাট-যশাড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন গোপালনগর গ্রাম (জে· এল· নং ২৭০)। এ গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় উত্তরমুখী আটচালা শিবমন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের বাঁকানো কার্নিসের নিচ বরাবর ও দুপাশে খাড়াভাবে একসারি করে পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:
"৭ শ্রীশ্রীরাম/ সুভমস্তু সকাবদা ১৭৩২/সক সন ১২১৭ সাল।" অতএব মন্দিরটি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। পূর্বে এ মন্দিরের কাছাকাছি একটি বিরাটাকার রাসমঞ্চ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেটি বিনষ্ট।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় কাশীনাথ শিবের দক্ষিণমুখী আটচালাটির স্থাপত্য বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কারণ মন্দিরটি আটচালা রীতির হলেও শিখর মন্দিরের মতই এটি ত্রিরথ করে নির্মিত। মন্দিরে নিবদ্ধ এক লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:
"ঌ ধর্মদাস রায়ের বনিতা ১২৮২ তারিখ. ২৮ চৈত্র।" অতএব ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৩·৯ মি·)।

গোপালপুর : মেছেদা-বাজকুল-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) নতুনপুকুর থেকে উত্তরে ৩ কিলোমিটার দূরত্বে পটাশপুর থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩৬)। এ গ্রামে চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের পুবমুখী একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের রত্নটি পঞ্চরথ শিখর-দেউলের অনুকরণে নির্মিত। ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে পদ্মপলস্তারায় নির্মিত সামান্য ফুল-লতাপাতার নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও একসারি 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায় যার বিষয়বস্তু, খোল করতাল বাদকসহ সংকীর্তন দল, বৃষবাহন শিব, তানপুরা ও বেহালা বাদিকা প্রভৃতি। মন্দিরটির অলিন্দের ছাদ টানা-খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানের উপর রক্ষিত গম্বুজ

দ্বারা নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৮′ (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আনুমানিক আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

গোপালপুর : ইতিপূর্বে আলোচিত 'কোটালপুর' নিবন্ধে সেখান পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে দক্ষিণ-পুবে হাঁটা রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন গোপালপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৯৯)। এ গ্রামে স্থানীয় চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মুখোমুখি দুটি আটচালা মন্দির এখানকার পুরাকীর্তি। উত্তরমুখী মন্দিরটি গগনেশ্বর শিবের এবং সেটির প্রবেশপথের উপর নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে দশাবতার ও লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্য। এছাড়া মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ফলকে খোদাই যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ: "সকাব্দা/১৭১৭ সন/১২০২ তারি/ক ৮ কাতি..."

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামনাসামনি আর যে দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি আছে, সেটি ভুবনেশ্বর শিবের এবং সেটিরও প্রবেশপথের উপরে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ পুত্রকন্যাসহ শিবদুর্গার মূর্তি ও রাম-রাবণের যুদ্ধদৃশ্য দেখা যায়। এ মন্দিরের লিপিটি অস্পষ্ট হলেও, অনুমান করা যায় যে, এ মন্দিরটিও পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক। অতএব ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সমপরিমাপের এ মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যে ১০′ (৩৷০ মি·), প্রস্থে ৯′ (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)।

আলোচ্য মন্দির দুটির পশ্চিমে দামোদর ও রাধামাধবের পুবমুখী রাসমঞ্চটি প্রথাগত স্থাপত্যরীতির না হয়ে নবরত্ন রীতির মন্দিরের মতই গঠিত। পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণযুক্ত এ রাসমঞ্চটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·০ মি·)।

এ গ্রামের মাড়োতলায় ঝাকড়েশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী মন্দিরটি শিখর রীতির এবং অলঙ্করণবিহীন একদুয়ারী সে মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। পাশাপাশি দক্ষিণমুখী শীতলার দালান মন্দিরটিতে পঙ্খের অলঙ্করণসজ্জা লক্ষ্য করা যায়। বর্ণিত এ দুটি মন্দিরে কোন উৎসর্গলিপি না থাকায় অনুমান করা যায়, মন্দির দুটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত।

গোপীকান্তবাড় : বালিচক-ময়না পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পিঙ্গলা থানার এলাকাধীন পিঙ্গলার লাগোয়া গ্রাম গোপীকান্তবাড়(জে· এল· নং ৮৪)। এ গ্রামে পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী একদুয়ারী পঞ্চরত্ন শিব মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য বিচারে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। কাছাকাছি এই পরিবারের ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও উল্লেখ্য। সেটির ত্রিখিলানের উপরে পোড়ামাটির নকাশি অলঙ্করণের সঙ্গে কয়েকটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ফলকও দেখা যায়। এ মন্দিরের পিছনের দেওয়ালে দু'লাইন যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে তা থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·)।

গোপীবল্লভপুর : ঝাড়গ্রাম-খড়্গপুর - গোপীবল্লভপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে). গোপীবল্লভপুর সদর থানার এলাকাধীন গোপীবল্লভপুর (জে· এল· নং ২০৮)। মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দপ্রভু যখন বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলের ভারপ্রাপ্ত হন তখন তাঁর শিষ্য রসিকমুরারীর কাশীপুর গ্রামের গৃহে অবস্থানকালে শিষ্যের গৃহদেবতা গোপীবল্লভের নামকরণ অনুযায়ী গ্রামের নামও তিনি পরিবর্তন করার কথা ঘোষণা করেন। 'রসিকমঙ্গল' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

"শ্রীমূর্তি আছেন গৃহে চিরকাল হৈতে।
তার নাম আজ্ঞা কর যেই লয় চিতে॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
গোপীবল্লভ রায় বলিবে সর্বজনে॥
এ গ্রামের নাম গোপীবল্লভপুর।
ইথে সাধু কৃষ্ণ সেবা হবে পরচুর॥"

পরবর্তী সময়ে এই গোপীবল্লভপুরেই একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট গড়ে উঠে। বর্তমানে এখানে রাধাগোবিন্দের পুবমুখী শিখর মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দির দেওয়ালে বিষ্ণু, বরাহ, নৃসিংহ ও মনসারমূর্তি নিবদ্ধ দেখা যায়। এছাড়া কোন প্রাচীন মন্দিরে ব্যবহৃত পাথরের একটি দ্বারপার্শ্ব ও একটি অজ্ঞাতপরিচয় প্রস্তর মূর্তি মন্দির প্রাঙ্গনে পড়ে থাকতে দেখা যায়। একটি পাঁচচূড়াযুক্ত নহবতখানা ও একটি আটকোণা রাসমঞ্চ এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে এখানকার দেবালয় ও রাসমঞ্চ প্রভৃতি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

গোপীমোহনপুর : পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশাপাট; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন গোপীমোহনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৫৩)। এ গ্রামে রাধাবল্লভজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। একদা মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকসজ্জা ছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্কারের সময়ে শুধু মধ্যের অংশটুকু ছাড়া বাকী সব অংশের 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মধ্যবর্তী খিলানের উপরিভাগে কেবলমাত্র লঙ্কাযুদ্ধ ও মারীচ বধ-এর 'টেরাকোটা'-ফলকগুলিই বর্তমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৫' (৭·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি খ্রীষ্টীয় আঠার শতকে নির্মিত বলেই অনুমান।

আলোচ্য এ বিগ্রহের যে রাসমঞ্চটি দেখা যায়, সেটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দাসপুরের লবচন্দ্র মিস্ত্রী যে নির্মাণ করেন তা ঐ রাসমঞ্চে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

গোবর্ধনপুর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাউর স্টেশন থেকে দক্ষিণে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে পিংলা থানার এলাকাধীন গোবর্ধনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২০৪)। গ্রামের রত্নেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। স্থানীয় বসু পরিবার এই স্বয়ম্ভু শিবের মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন বলে জনশ্রুতি। মন্দিরটির

প্রবেশপথের উপরে কার্নিসের নিচে ও দুধারে খাড়াভাবে একসারি করে যে 'টেরাকোটা'-ফলকসজ্জা আছে, তার বিষয়বস্তু হল পুত্রকন্যাসহ শিবদুর্গা ও নন্দীভৃঙ্গী প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, আকারপ্রকারে মন্দিরটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলে অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬′ (৪·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

গোবিন্দনগর: 'উত্তর গোবিন্দনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সে গ্রামটির দক্ষিণে মোহনখালি খালের অপর প্রান্তে দাসপুর থানার এলাকাধীন গোবিন্দনগর গ্রাম (জে· এল· নং ৭৮)। স্থানীয় গোস্বামী পরিবারের রাধাগোবিন্দজীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ মারীচ বধ, সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ প্রভৃতি দৃশ্য একান্তই আকর্ষণীয়। এছাড়া মন্দিরটির স্তম্ভমূলে খোদিত হয়েছে ইংরেজ সাহেবদের শিকারযাত্রা প্রভৃতির দৃশ্য। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউ চরণ পরাঅন/সন ১১৮৮ সাল তারিক ১৫ মাগে পুন্নিমা কাজের/দাসপুর ।। আরভকারীকর শ্রীসাফল/রাম চন্দ্র মিস্ত্রী। সাং ।।"
অতএব ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২′ ৪″ (৬·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০ মি·)। এছাড়া এ মন্দিরটির কাঠের কপাটে নানাবিধ মূর্তি খোদাই দেখা যায়। সম্প্রতি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এ মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে।

গোবিন্দপুর: পাঁশকুড়া-মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) রাতুলিয়া; সেখান থেকে উত্তরে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন গোবিন্দপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১১৪)। এ গ্রামে দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী আটচালা তারকনাথ শিবমন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরের সম্মুখভাগে নিবদ্ধ কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত ফলকগুলি আকারে বেশ ছোট এবং সেগুলিতে সূক্ষ্মতার প্রলেপ নেই বললেই চলে। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির হুবহু পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রী৺ মহাদেব তারকনাথ বাবাজি/শকাব্দা ১৮০৩ সাল। ২৩ দিন/বাঙ্গালা সন ১২৮৮ সাল তাং ২৩ আষাঢ়/শ্রীযুক্ত উদয় চন্দ্র পতি মিস্ত্রি সাং রাজহাটি/শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র দে সাং গোবিন্দপুর।" অতএব ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির স্থপতি হিসাবে রাজহাটি গ্রামের উদয়চন্দ্র পতির নাম পাওয়ায় সিদ্ধান্ত করা যায় যে, উল্লিখিত স্থানেও একদা সূত্রধর শিল্পী-স্থপতিদের বসবাস ছিল। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৩′ ৬″ (৪·১ মি·), প্রস্থে ১১′ ২″ (৩·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০ মি·)।

গোয়ালতোড়: মেদিনীপুর-গোয়ালতোড় পিচের সড়কে গড়বেতা থানার অন্তর্গত গোয়ালতোড় গ্রাম (জে· এল· নং ১১৩)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, স্থানীয় বিখ্যাত লৌকিক দেবী সনকার পুবমুখী চারচালা মন্দির। মাকড়া পাথরে নির্মিত এমন বৃহদাকার চারচালা রীতির মন্দির এ জেলায় একেবারে নেই বললেই চলে। প্রায় ৫′

(১·৫ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪′ (৭·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৬′ (১১ মি·)। মন্দিরটির সম্মুখভাগের খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ পদ্ম-পলস্তারায় উৎকীর্ণ গণেশের মূর্তি ছাড়া দক্ষিণ দেওয়ালে তিনটি মিথুন মূর্তি দেখা যায়। মন্দিরটির তিনটি ত্রিখিলান অলিন্দের ছাদ টানা-খিলানের উপর রক্ষিত এবং গর্ভগৃহের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকার-প্রকারে সতের শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমান।

গোলগ্রাম : 'গয়েশপুর' নিবন্ধে লোয়াদা পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে লোয়াদা-ত্রিলোচনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার অন্তর্গত গোলগ্রাম (জে· এল· নং· ৪৭)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি হল, দেবী সর্বমঙ্গলার নবরত্ন ও লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চরত্ন রীতির দুটি মন্দির। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি পুবমুখী এবং সেটি নাকি একদা গোলগ্রামের প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামী রঘুনাথ রায়ের শেষ বংশধর হাড়ারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত। সর্বমঙ্গলার বিরাটাকার নবরত্ন মন্দিরটিতে একসময়ে বেশ পোড়ামাটির অলঙ্করণ সজ্জা ছিল, কিন্তু বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে মন্দিরটি জীর্ণদশায় পতিত। এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই তবে স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য দেখে অনুমান করা যায় যে মন্দিরটি আঠার শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত।

পাশাপাশি দক্ষিণমুখী লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত এবং প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে সে মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

গৌরা : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গঙ্গামাড়োতলা ; সেখান থেকে পুবে সামান্য দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন গৌরা গ্রাম (জে এল নং ৮০)। একদা এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাদেবীর নবরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে বিধ্বস্ত হলেও, সে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কাঠের বিগ্রহটি এখন একটি টালী ছাওয়া ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাতন সে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলকটি অবশ্য এই নূতন মন্দিরের পুব দেওয়ালে নিবদ্ধ করে দেবার ফলে ঐ মন্দিরটি যে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায়।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় হাঁড়া পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং সেটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কাহিনী থেকে আহৃত বহু দৃশ্য। এ মন্দিরে পাশাপাশি দুটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"৭ শ্রীশ্রী জীউ	সাং গোউরা
লক্ষি জনা	সন ১২৩১
দন জিউ	তাং ২২য়
সরণং সকা	ঘ্রায়ন :
বদা ১৭৪৬	পুষ্বমাস ।"

অতএব ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) এবং উচ্চতায়

প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় শাসমল পরিবারের প্রায় দেড়শো বছরের পুরাতন শ্রীধরজীউর নবরত্ন মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সে বিগ্রহের ন'চূড়া রাসমঞ্চটিতে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির বাদিকামূর্তিগুলি বেশ দর্শনীয়। এ রাসমঞ্চটি যে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত তা ঐ রাসমঞ্চে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

আলোচ্য এ মন্দিরের কাছাকাছি অধিকারী পরিবারের মহাপ্রভুর পুবমুখী শিখর - দেউলটিও এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ (৩·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

গ্রামের পুবপাড়ায় হটনাগর শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিতে তেমন কোন অলঙ্করণ না থাকলেও সেটি যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত তা ঐ মন্দিরটিতে উৎকীর্ণ এক সংস্কারলিপি থেকে জানা যায়। একদুয়ারী এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭′ (৫·২ মি·), প্রস্থে ১৫′ ২″ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ গ্রামের মণ্ডলপাড়ায় মণ্ডল পরিবারের বিশ্বেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী শিখর দেউলটিও এক দ্রষ্টব্য। এ মন্দিরের উত্তর দেওয়ালে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ/শ্রীশ্রী ৶ বিশ্বেশ্বর/মহাদেব চরণতব সক/শকাব্দা ১৭৭২ বাহাত্তর/সন ১২৫৭ সাল তারিখ ৯ মাঘ/রোজ সোমবার।" অতএব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′ (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

ঘাটাল: পাঁশকুড়া-চন্দ্রকোণা রোড-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল থানার অর্ন্তগত সদর ঘাটাল মহকুমার শহর। একদা কাঁসা-পিতল, দুগ্ধজাতদ্রব্য এবং সুতি, রেশম ও তসর শিল্পের জন্য বিখ্যাত এই প্রাচীন শহরটিতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তির নিদর্শন রয়েছে। সেগুলির মধ্যে কোন্নগরপল্লীর কর্মকারপাড়ায় সিংহবাহিনীর দক্ষিণমুখী চারচালা মন্দিরটি একান্তই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি চারচালা রীতির হলেও, সেটির সংলগ্ন একটি চারচালা জগমোহনও দেখা যায়। এক সময় মন্দিরগাত্রে যেসব গোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল, সেগুলির ভাস্কর্যশৈলী খ্রীষ্টীয় ১৪-১৫ শতকের গৌড়ের মসজিদ-স্থাপত্যে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে একান্তই সাদৃশ্যযুক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব ভাস্কর্য-ফলকগুলিকে সংস্কারের সময় বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ মন্দিরে নিবদ্ধ পাশাপাশি দুটি সংস্কারলিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীহরি
সুভমস্তু সকা
ব্দা ১৪১২ মা
হ জেষ্ট গতে
শ্রীশ্রীসিঙ্গবা
হিনির মদীর

তয়ারি শ্রীহরিহ ব্দা ১৭১৭ সালে
র কমকার। মাহ পোসে
মেরামত সকা শ্রীজিতারাম
কম্মকার ইতি।"

অতএব, ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি যে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়েছে তা এই লিপিফলক থেকে জানা যায়। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১০′ ১০″ (৩·৩ মি·) প্রস্থে ৭′ ৭″ (২·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৪′ (৪ মি·)। এ মন্দিরটির প্রবেশপথের দুপাশে যে দুটি সাহেব প্রতিমূর্তি দেখা যায়, তা যে পরবর্তীকালের সংযোজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ঠিক এই ধরনের প্রবেশপথে নিবদ্ধ সাহেব দ্বারপালের মূর্তি সম্পর্কে ইতিপূর্বে কেদার (থানা: ডেবরা) প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত মন্দিরের কাছাকাছি কোন্নগর পল্লীর গোঁসাইপাড়ায় স্থানীয় গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী বৃন্দাবনচন্দ্রের নবরত্ন মন্দিরটিও এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরে প্রবেশপথের উপরে 'টেরাকোটা'-ফলকে খোদিত লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলার দৃশ্য ছাড়াও স্তম্ভমূলে ইংরেজ সাহেবদের শিকারযাত্রার দৃশ্যও দেখা যায়। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র। শুভমস্তু সকাব্দা ১৭১৬ দাতা/ শ্রীচৈতন্যচরণ দাষ। সিল্পিকার শ্রীস্যাম চরণ মিস্ত্রি।" অতএব এ লিপিফলক থেকে জানা গেল যে, ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির স্থপতি এখানে 'শিল্পীকার' হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯′ ৯″ (৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০ মি·)।

কোন্নগর পল্লীর দক্ষিণ প্রান্তে আরও এক গোঁসাইপাড়ায় পুবমুখী রাধাগোবিন্দজীউর এক পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরে পদ্ম-পলস্তারায় খোদিত সামান্য কিছু নকাশি অলঙ্করণ রয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

ঘাটাল শহরের আলমগঞ্জ পল্লীতে পুবমুখী একটি তিনগম্বুজ মসজিদ দেখা যায়। সে মসজিদটিতে নিবদ্ধ এক আরবী প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে ১২৭৮ হিজিরিতে এ মসজিদটি নির্মিত।

কাছাকাছি গম্ভীরানগরে দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চটি একান্তই দ্রষ্টব্য। এটির পুব ও উত্তর দেওয়ালে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য উৎকীর্ণ ছাড়াও স্তম্ভমূলে 'টেরাকোটা'-ফলকে খোদিত শিকার দৃশ্যের অলঙ্করণসজ্জা বেশ চিত্তাকর্ষক। পশ্চিম ও দক্ষিণে নিবদ্ধ হয়েছে বেশ বড় আকারের পোড়ামাটির দ্বারপালের মূর্তি। এ তুলসীমঞ্চে নিবদ্ধ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

ঘাটালের দেওয়ানী আদালতের কাছে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সরবেড়িয়ার চৌধুরী পরিবার কর্তৃক নির্মিত শিলাবতী নদীর ঘাটে চাঁদনীর গায়ে যে উৎসর্গলিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছে সেটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত সে লিপিটি হল:

"ঘণ্টালে সকলান্ সুখেন তটিনী স্নানাম্বুপানাদিকম্।
নিত্যংকারয়িতুং চতুর্ধরি কুলোদ্ভূতেন পূতাত্মনা॥

সার্দ্ধং শ্রীল শিবপ্রসাদ সুধিয়া সরবেড়িয়া বাসিনা।
শ্রীযুক্তেন মহেন্দ্রনাথং কৃতিনা সত্তীর্থমেতং কৃতম॥"

চক্‌কালন্দি: খড়্গপুর -বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেনাপুর বাজার; সেখান থেকে পুবে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন চককালন্দি গ্রাম (জে এল নং ৬১৭)। এ গ্রামের ধাড়াপাড়ায় ধাড়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী লক্ষ্মীবরাহের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সম্মুখভাগে কোন অলঙ্করণ না থাকলেও, এটির প্রবেশপথের দরজার পাল্লায় কাঠ-খোদাইয়ের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। মূলতঃ কৃষ্ণলীলার নানাবিধ দৃশ্য এ কাঠের কপাটে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২′ (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটি বর্তমানে অস্পষ্ট হলেও, স্থাপত্য বিচারে মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

চকবাজিত: পাঁশকুড়া- ডেবরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ধামতোড়; সেখান থেকে উত্তরে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটারর দূরত্বে ডেবরা থানার অন্তর্গত চকবাজিত গ্রাম (জে এল নং ১৮০)। এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বেশ কয়েকটি মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমমুখী শিবের শিখর-মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। সে মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি চুন-বালির-পলস্তারায় উৎকীর্ণ হয়েছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীজিউ ঠাকুর ষুভমস্তু সকাব্দা ১৭৮৭ য়ারম্ভ ৭২ সালে/সন ১২৭৩ সালে শ্রাবণে সংপূর্ণঃ মিস্ত্রী ঠাকুর্দাষ সিল সাং দাষপুর"।

অতএব ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর পুবমুখী শিখর-দেউলটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। এটির কাঠের দরজায় খোদাই করা নকাশি কাজও আছে। এ গ্রামে বিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত আরও যে কয়েকটি মন্দির দেখা যায় সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

চড়াইগ্রাম: খড়্গাপুর-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কাশমলি; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁতন থানার অন্তর্গত চড়াইগ্রাম (জে এল নং ২৮১)। এ গ্রামে দাসঅধিকারী পরিবারের রাধাগোবিন্দজীউর, জগমোহনযুক্ত, ইটের পুবমুখী শিখর-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির গর্ভগৃহ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·) এবং সংলগ্ন জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ৯′৯″ (২·৯ মি·), প্রস্থে ৪′ (১·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, স্থাপত্য বিচারে মন্দিরটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

চণ্ডীপুর: খড়্গাপুর স্টেশন থেকে পশ্চিমে পিচের সড়কে (বাস ও রিকসা পাওয়া যায়) প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর থানার এলাকাধীন চণ্ডীপুর গ্রাম (জে এল নং ১৩২)। এখানে রায় পরিবারের পশ্চিমমুখী রামেশ্বর শিবের মাকড়া পাথরের সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এখানের এক পুরাকীর্তি। মন্দিরের সংলগ্ন নবরথ জগমোহনটি পীঢ়া রীতির। প্রায় ৪′ (১·৩ মি·) উঁচু এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির

জগমোহনে প্রবেশপথের দুপাশে নিবদ্ধ হয়েছে পাথরের গণেশ ও লক্ষ্মীর মূর্তি। এছাড়া জগমোহনের ভিতরের চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাথরের এক বৃষ মূর্তি। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে এটি আঠার শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

চণ্ডীবুড়ি : বালিচক-মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার অন্তর্গত দ্বারিকাপুর মৌজাভুক্ত (জে এল নং ৩৩৯) চণ্ডীবুড়ি গ্রাম। এখানকার বিখ্যাত লৌকিক দেবী চণ্ডীবুড়ির থানের পাশে প্রতিষ্ঠিত কুমারীনাথ মহাদেবের দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটি এখানকার এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ থাকলেও, পঙ্খ-পলস্তারায় নির্মিত মিথুন মূর্তিও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারেপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

দেবী চণ্ডীবুড়ির সিঁদুরলিপ্ত মূর্তিটির পাশে পঞ্চানন্দ হিসাবে পূজিত পাথরের মূর্তিটি দশম-একাদশ শতকের কোন এক বিষ্ণুমূর্তি বলেই অনুমান।

চন্দ্রকোণা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর বা চন্দ্রকোণা রোড ষ্টেশন থেকে পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন স্থানীয় পৌরসভার অন্তর্গত এই শহরে আসা যায়। একদা সমৃদ্ধ এই প্রাচীন শহরটির নানা প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত বহু অট্টালিকা ও মন্দির-দেবালয়ের মধ্যেই সেই সম্পদশালী শহরটির স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে প্রথমেই অযোধ্যা মৌজাভুক্ত রঘুনাথ ঠাকুরবাড়ি বা রঘুনাথবাড়ির কথা উল্লেখ করা যায়।

ইতিহাসখ্যাত চেতুয়া-বরদার ভূস্বামী বিদ্রোহী শোভা সিংহের পতনের পর বর্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ আঠার শতকের মধ্যভাগে চন্দ্রকোণায় তার আধিপত্য বিস্তার করেন এবং পরবর্তী বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঠাকুরবাড়ির যে সংস্কার সাধন করেন, তা এই ঠাকুরবাড়ির প্রবেশপথের তোরণদ্বারে নিবদ্ধ এক লিপি থেকে জানা যায়। ষোল লাইনবিশিষ্ট মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ সেই লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"সকাব্দা ১৭৫০/শাকেগ্নীব্বশ্বভূমে রঘু যদূ বটৈচেসাসন স্থানযাত্রা।/ বৃন্দাতৌর্য্যত্রিক শ্রী কপিধন সুঘটী বাদ্যরাসালয়াদীন্॥/ কূপৌদ্বৌ বারিগেহান্যপলময় নবীয়ানি বৃত্যাপকার্ষীৎ।/ সীতাকুণ্ডস্যখট্টং নরপতি সুকৃতী শ্রীশ্রীযুতেস্তেজচন্দ্রঃ॥/ রঘুনাথের শ্রীমন্দির রম্য মনোহর। লালজীর শ্রীমন্দি/র হনুমন্তঘর॥ ভোগালয় ধনালয় নাট্য রম্যাগার।/ বৃন্দাবেশ্ম রাসবেশ্ম পাকগৃহ আর॥ বাদ্যগৃহ প্রস্তর/ প্রাচীন যুগ্ম কূপ। স্নানগৃহ সীতাকুণ্ড অট্ট অপ/ রূপ॥ ধনবেশ্ম রাশগৃহের বারন্দা যুগল। দ্বারী/ গৃহ ঘড়ি ঘর প্রভৃতি সকল॥ চন্দ্রকোণায় রঘুনা/ থ যদুলাল প্রীতে। বর্দ্ধমানাবনিনাৎ বিষ্ণুতেজ/ গতে॥ নবোজ্জ্বল করিলেন নৃপ চক্রবর্তী। শ্রীলতে/ জ চন্দ্র নৃপ ধরাধৌতকীর্ত্তি॥ শিবাক্ষী শিবাস্য সিন্ধু/ শশীমিত শকে। অঙ্গনায় অংশুমান একবিংশতিকে॥/ সন ১২৩৮।"

আলোচ্য এ তোরণ পেরিয়ে সামনের চত্বরে উত্তরমুখী ঝামাপাথরের এক পঞ্চরত্ন মন্দির। জনশ্রুতি যে এটি বর্ধমান-রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের মন্দির। এ-

মন্দিরের ত্রিখিলানের উপর নিবদ্ধ উৎসর্গলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীরামঃ ॥ শকাব্দে/ শৈলনাগাঙ্গ রজনী/ পতিভির্ম্মিতে। পঞ্চা/ নন পদাম্ভোজে প/ ঞ্চরত্ন মিদং দদৌ ॥/ শক ১৬৮৭।৫।৯/সেবক শ্রীখোষালচন্দ্র।"

অতএব ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে মন্দিরের গঠনরীতি 'পঞ্চরত্ন' কথাটির উল্লেখ একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এই মন্দিরটি ছাড়া এ চত্বরে এক রাসমঞ্চ ও তারই কাছাকাছি দুটি লোহার কামান দেখা যায়, যার একটিতে ফার্সী লিপিতে সম্ভবতঃ রাজা মিত্রসেনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। এ মন্দির চত্বরের উত্তরে বিশাল প্রাচীর ঘেরা আর এক অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত রঘুনাথ ও লালজীর মন্দির। এ অঙ্গনটির প্রবেশপথের তোরণটি বেশ জমকালো অলঙ্করণসমৃদ্ধ। এটির শীর্ষে খাঁজকাটা চালযুক্ত ঝামাপাথরের চারচালা সৌধটিও বেশ দর্শনীয়। রঘুনাথের পীঢ়ারীতির জগমোহনসহ ঝামাপাথরের বিশাল মন্দিরটি পুবমুখী সপ্তরথ শিখর-দেউল। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ ৬″ (৪·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৮২′ (২৫ মি·)। মন্দিরটিতে লিপিফলক না থাকলেও স্থাপত্যবিচারে এটি খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমিত হয়।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে ঝামাপাথরের দক্ষিণমুখী লালজীর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। আদিতে এ মন্দিরের বিগ্রহ গিরিধারীলালজীউ ওরফে লালজী বর্তমান রঘুনাথবাড়ির অনতিদূরে লালগড় দুর্গের মধ্যে এক নবরত্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সে গড়বাড়ি ও মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে বর্তমানের এই মন্দিরটিতে সে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, লালগড়ের সেই পুরাতন নবরত্ন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাফলকটি এই লালজী মন্দিরে এনে রাখা হয়েছে এবং ঐ লিপি থেকে মন্দির ও বিগ্রহ বিষয়ক তথ্য ছাড়াও সমসাময়িক বেশ কিছু ঐতিহাসিক বিবরণও পাওয়া যায়। জানা যায়, ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই নবরত্ন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন রানী লক্ষ্মণাবতী, যিনি ছিলেন বীরভানের পুত্রবধূ, হরিনারায়ণের পত্নী, হোলরায়ের কন্যা, নারায়ণমল্ল রাজের ভগিনী ও মিত্রসেনের মাতা। লিপিটির পূর্ণাঙ্গপাঠ নিম্নরূপ:

"শুভমস্তু শকাব্দা: ১৫৭৭। শাকে হস্বমুনিবানেন্দৌ/ বৈশাখে শুক্লপক্ষকে। তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে/ প্রারম্ভোস্যবভূবহ ॥ হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী/ শ্রীলক্ষ্মণাবতী। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীতৈ নবরত্নমি/ দং দদৌ ॥ রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা শ্রীবীরভানের্বধুখ্যা/ ত- শ্রীহরিভূপতেশ্চ বানিতা শ্রীহোলরায়াত্মজা। মাতা/ শ্রীযুত মিত্রসেননৃপতের্বিখ্যাতকীর্ত্তে ক্ষিতৌ/ শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ/ মন্দিরং ॥ গিরিধারিপদাম্ভোজে নবরত্নমি/ দং শুভং। নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা॥ পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্ত্তী গোকুল দাস।"

উল্লিখিত মোহন চক্রবর্তী সম্ভবতঃ ছিলেন এই লিপিটির রচয়িতা এবং সেজন্যই তিনি পৌরাণিক অর্থাৎ শিল্পশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বলেই অভিহিত হয়েছেন। গোকুলদাস ছিলেন সম্ভবতঃ এ লিপির খোদাইকারক।

লিপিটির মধ্যে নিঃসন্দেহে চন্দ্রকোণার অতীত ভূস্বামীদের বেশ কিছুটা অজ্ঞাত ইতিহাসের তথ্য নিহিত আছে। লিপিটিতে চন্দ্রকোণার অধিপতি হিসাবে বীরভানের নাম উল্লিখিত হওয়া ছাড়াও, সম্প্রতি আসাম সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভা.; থেকে প্রকাশিত

বাহারিস্তানা-ই-ঘায়েরী' নামক ফার্সী পুঁথিতেও সতের শতকের প্রথমদিকে চন্দ্রকোণার জমিদার হিসাবে বীরভানের নামও উক্ত হয়েছে। সুতরাং চন্দ্রকোণায় ভানরাজাদের প্রতিষ্ঠিত লালজীর মন্দিরের এই শিলালেখটি এক ঐতিহাসিক দলিল বলেই গণ্য হতে পারে।

আলোচ্য পরবর্তী লালজী মন্দিরটি ঝামাপাথরের আটচালা স্থাপত্যরীতির এবং মন্দিরের শীর্ষে প্রধান তিনটি আমলক ও কলসের সংস্থাপন বেশ অভিনব। মন্দিরটির কার্নিসের নীচে ও খিলানের পাশে পঙ্খপলস্তারায় দশাবতার ও অন্যান্য দেবদেবীমূর্তি উৎকীর্ণ। দৈর্ঘ্যে ৩৭′ (১১·২ মি·) ও প্রস্থে ২৩′ ৮″ (৭·২ মি·) এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটিকে স্থাপত্য নিরিখে আঠার শতকে নির্মিত বলে মনে হয়।

লালজীউ মন্দিরচত্বরে অবস্থিত পাথরের ভোগমণ্ডপটি দালানরীতির হলেও সেটির চাল রত্নমন্দিরের মত বাঁকানো এক অভিনব রীতির ইমারত বলে গণ্য হতে পারে। এটি দৈর্ঘ্যে ২৯′ (৮·৮ মি·), প্রস্থে ২২′ ·(৬·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রঘুনাথবাড়ির এসব মন্দির আজ পরিত্যক্ত হওয়ায় ক্রমশই সেগুলি জীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং ঐসব মন্দিরের যাবতীয় বিগ্রহ বর্তমানে ঠাকুরবাড়িবাজার এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মাসীর বাড়ি' নামক পঞ্চরত্ন মন্দিরে এনে রাখা হয়েছে।

রঘুনাথবাড়ির পার্শ্ববর্তী রঘুনাথপুর এলাকায় একসময়ে বর্ধন পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মোট তিনটি মন্দিরের মধ্যে রাধামদনগোপালজীউর দক্ষিণমুখী ঝামাপাথরের দালান-মন্দিরটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। পুবমুখী আরো একটি দরজা বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠালিপিহীন এই মন্দিরটি স্থাপত্যরীতি প্রমাণে আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমিত হয়। এটি দৈর্ঘ্যে ১৯′৬″ (৫·৯ মি·), প্রস্থে ১২′ ৬″ (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী প্রতিষ্ঠাতা বর্ধন পরিবার যে একদা চন্দ্রকোণার চৌহান ভূস্বামীদের রাজত্বকালে বালীঘোড় থেকে এখানে এসে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তা এঁদের পরিবারে রক্ষিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঁথির পুষ্পিকা থেকে জানা যায়, যথা:

"চৌহান কুলেতে যৈছে হিন্দু নরপতি।
মার্কণ্ডেয় আসি তিহোঁ করিল বসতি॥
আঢ্য সুবর্ণবণিক নন্দন মতিমান।
কৃষ্ণভক্ত বড় এই ভক্ত প্রধান॥
বালিঘোড় বাস ত্যেগি চন্দ্রকোণা ধাম।
শ্রীকৃষ্ণনগরে সেই লইল হরিনাম॥
শ্রীল গোপীনাথ পদে জানাইল নতি।
শ্রীঅভিরাম সন্তানে দীক্ষা করাইলা তথি॥
বৌদ্ধ ধর্ম ত্যেগি চন্দ্রকোণা বাস কৈল।
শ্রীচাঁদ ঠাকুরে তিঁহো পৌরহিত্য দিল॥"

এ মন্দিরের সামান্য পুবে স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের দক্ষিণমুখী রাধাবল্লভের চারচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। ১৭′ (৫·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট ঝামাপাথরের

একদুয়ারী এ মন্দিরটির শীর্ষে একটি আমলক আছে। গঠনশৈলী অনুসারে মন্দিরটি আঠার শতকের প্রথমে নির্মিত বলে মনে হয়।

রঘুনাথপুর এলাকায় পার্বতীনাথ শিবের দক্ষিণমুখী সতের চূড়াবিশিষ্ট ইটের মন্দিরটিও একটি দ্রষ্টব্য। প্রবেশপথের উপর পঙ্খসজ্জা ছাড়া কার্নিসের নীচে ও ত্রিখিলানের দুপাশে খাড়াভাবে দুসারি প্রথাগত 'টেরাকাটা'-সজ্জাবিশিষ্ট এই মন্দিরটির পশ্চিম দেওয়ালেও বহু দেবদেবী মূর্তি পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ হয়েছে। মন্দিরটির ভিত্তিবেদীর উপর নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি:

"আন্দাজী সন ১২৩১ সাল/আরম্ভ দেশ ষোল আনা/রঘুনাথপুর।" দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২১' ৮" (৬.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৬৬' (২০মি.)। চন্দ্রকোণা ঠাকুরবাড়ি বাজার এলাকার সন্নিকটে রাধাকৃষ্ণপুর এলাকায় স্থানীয় দে পরিবারের দক্ষিণমুখী রামচন্দ্রজীউর দালান মন্দিরটিও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ত্রিখিলানের উপরে পোড়ামাটির ফলকে সাত লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"৭শ্রীশ্রীরাম/চন্দ্র ঠাকুর জিউ/শন ১২৭৮ শাল/তারিখ ৪ মাঘ/শ্রীগুরুদাস দে এর/কৃত চিত্রকার/শ্রীকামদেব মীস্ত্রী।" মন্দিরটি নানা দেবদেবীর মূর্তিযুক্ত প্রথাগত পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত। ঠাকুরবাড়ি বাজার এলাকায় ঝামাপাথরের প্রায় ২৭' (৮.২ মি.) উচ্চতাবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দিরটি লালজীর আষাঢ়ী রথযাত্রায় 'মাসীর বাড়ি' রূপে ব্যবহৃত হত এবং বর্তমানে এটিতে রঘুনাথবাড়ির সমস্ত বিগ্রহ রক্ষিত আছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটি ঝামাপাথরের হলেও এটির চূড়া ইটের তৈরী এবং গঠনরীতিতে এটি আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

ঠাকুরবাড়ি বাজারের উত্তরে রঘুনাথগড়ের কাছে 'শিমসাগর' (শ্যামসাগর) ও 'রণসাগর' (রানীসাগর) নামে দুটি প্রাচীন দিঘির মধ্যে বছর কুড়ি আগে শিমসাগরের মধ্যস্থলে একটি ঝামাপাথরের ক্ষুদ্রাকার পীঢ়া-দেউল আবিষ্কৃত হয়।

গোবিন্দপুর এলাকার 'খলশা শিব'-এর আটচালা মন্দিরটি স্থানীয় বিয়াল্লিশগ্রামী তাম্বুলি বণিকদের দ্বারা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রতিষ্ঠিত, তা মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। পঙ্খ-পলস্তারায় সজ্জিত, এ মন্দিরটির সামনে ইটের তৈরী নাটমন্দির ও নহবৎখানাটির স্থাপত্যও বেশ অভিনব।

ইলামবাজার এলাকায় শান্তিনাথ শিবের পশ্চিমমুখী ইটের তৈরী মন্দিরটি পঞ্চরত্নরীতির। প্রায় ২৩' (৭ মি.) উচ্চতাবিশিষ্ট এই মন্দিরটি প্রথাগত পঙ্খ ও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলংকৃত।

এই মন্দিরের সামান্য পূর্বে চাবড়ি পরিবারের রাধাগোবিন্দের দক্ষিণমুখী ইটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও পঙ্খ ও 'টেরাকাটা'-ফলকে সজ্জিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' ৬" (৪.১ মি.) ও প্রায় ২৭' (৮ মি.) উচ্চতাবিশিষ্ট এই মন্দিরটির উত্তরদিকের দেওয়ালে পঙ্খপলস্তারায় উৎকীর্ণ দুটি লিপি মারফৎ জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৭৯২ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৮৭০ খ্রীঃ) শ্রীহরি চাবড়ি. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

চন্দ্রকোণার গাজীপুরের, রঘুনাথের ঝামাপাথরের দালান মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭' (৫.১ মি.) ও উচ্চতায় ১৩ (৪ মি.) এবং এটিও রঘুনাথবাড়ির লালজীউর মন্দির সংলগ্ন ভোগমণ্ডপ-এর মতই বাঁকানো চালের দালান রীতির দেবালয়।

মিত্রসেনপুর এলাকায় ধর্মরাজের উত্তরমুখী ইটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও দ্রষ্টব্য। এ

মন্দিরে ধর্মঠাকুরের কামিন্যা কলকলি দেবী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সাধারণে এটিকে কলকলি দেবীর মন্দিরও বলে থাকেন। পঙ্খের অলংকরণ ছাড়াও মন্দিরটিতে পাঁচ লাইন যে প্রতিষ্ঠালিপি আছে তার পাঠ:

"প্রতিষ্ঠিত মিদং শাকে/পক্ষাক্ষ বসু চন্দ্র মে/রাধাক্ষয়তৃতীয়ায়াং/দিঙমানে কুজবাসরে/সন ১২৯৭ শাল ১০ বৈশাখ।" অতএব ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। মন্দিরটির বাঁদিকে আরও একটি ক্ষয়িত লিপি আছে যার পাঠ:

"কলকলি পদং ধ্যাত্বা তস্যা/গৃহমিদং .....তাম্বুলি।"

এই এলাকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি শান্তিনাথ শিবের দক্ষিণমুখী এক নবরত্ন মন্দির। সম্মুখভাগে প্রথাগত পোড়ামাটির অলংকরণ ছাড়াও মন্দিরটিতে মার্বেল পাথরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি আছে, যথা:

"ওঁ/ভক্তৈর্দত্ত মিদং যত্নৈ/র্নবরত্নাসু-মন্দিরং /মিত্রসেন পুরেত্র শ্রীশ্রী/শান্তিনাথ শিবায়নে/১২৩৫ সাল।" ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০′ (৬·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·) এবং এটি বাইশটি পটির প্রধানদের দ্বারা পরিচালিত হত বলে এটিকে 'বাইশি মাড়ো'ও বলা হয়।

এ এলাকার আরো দুটি দালান-মন্দিরের মধ্যে অনন্তদেবের দালান-মন্দিরে কিছু পোড়ামাটির ভাস্কর্য আছে। মন্দিরে নিবদ্ধ এক লিপি মারফৎ সেটি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বলে জানা যায় এবং এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

অপর দালান-মন্দিরটি দাসদত্ত পরিবারের নির্মিত ঝামাপাথরের রাধাবল্লভ মন্দির। তবে এটি প্রথাগত সমতল ছাদের না হয়ে বাঁকানো চালের ছাদযুক্ত মন্দির, যেটি আকৃতিতে চূড়াবিহীন রত্নমন্দিরের মতই। পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ অলংকরণে সজ্জিত বর্তমানে পরিত্যক্ত এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে নিবদ্ধ পাথরের এক প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ:

"৭শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ জীউ/ঠাকুর স্বরনম্ শুভমস্তু/শকাব্দা ১৭০২। ১। ৩০/শ্রীনিমাঞি-চরণ দাষ/দত্ত সন ১১৮৭ সাল/তারিখ ৩ মাঘঃ"। অতএব ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত এবং এর দৈর্ঘ্য ১৭′ (৫·২ মি·), প্রস্থ ১৬′ ৬″ (৫ মি·) এবং উচ্চতা প্রায় ১৭′ (৫·১ মি·)।

চন্দ্রকোণার জীরাট-মুণ্ডমালা মৌজাভুক্ত লালবাজার এলাকার রাধারসিকরায়ের পুবমুখী বিশালাকার নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির দ্বিতলের চার দেওয়ালেই নতোন্নত পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ হয়েছে চারটি রত্ন, যা দেখে মন্দিরটি পঁচিশ চূড়া বলে ভ্রম হয়। পোড়ামাটির ফলক ছাড়াও পঙ্খ-পলস্তারার অলংকরণ সজ্জিত আনুমানিক আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত এই মন্দিরটির সম্মুখভাগ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পশ্চিমে রাসমঞ্চ ও নহবৎখানাটির স্থাপত্যও বেশ উল্লেখযোগ্য।

এই মন্দিরের দক্ষিণে ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কের উত্তর ধারে শান্তিনাথ শিবের পশ্চিমমুখী একটি আটচালা মন্দিরও দেখা যায়, যা আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

গোঁসাইবাজার এলাকায় বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক প্রেমসখী গোস্বামীর ঝামাপাথরের সমাধি

মন্দিরটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। সাম্প্রতিককালে এখানে মাটি খোঁড়ার সময় পাথরের এক শিলালিপি পাওয়া যায় (স্থানীয় ইতিহাসবেত্তা শ্রীরাধারমণ সিংহের নিকট রক্ষিত) যার একদিকে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত লিপি এবং অন্যদিকে সম্ভবতঃ বৌদ্ধ পদ্মপাণির মূর্তি খোদিত। লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৫৫০ শকাব্দে (১৬২৮ খ্রীঃ) কোন এক মধুসূদন কর্তৃক একটি মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে লুপ্ত হলেও সেটি চন্দ্রকোণার প্রাচীনতম পুরাকীর্তিগুলির অন্যতম।

একই পল্লীতে দে পরিবারে ইটের দক্ষিণমুখী দালান মন্দিরটিতে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। এই পল্লীতেই করদত্তদের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী ইটের দালান-রীতির জগন্নাথ মন্দিরটিও দ্রষ্টব্য। এটিতেও কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য নিরিখে সেটি আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

শহরের দক্ষিণবাজার এলাকায় বুড়ো শিবের নবরত্ন মন্দিরটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির অলংকরণ দেখা যায়। তবে এ পল্লীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরাকীর্তিটি হল, ঝামাপাথরে নির্মিত দক্ষিণমুখী এক জোড়বাংলা মন্দির। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৮'৬" (৮·৬ মি·), প্রস্থে ২৬' (৭·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকার-প্রকারে খ্রীষ্টীয় সতর শতকে নির্মিত বলেই মনে হয়। দুঃখের কথা, এ মন্দিরটি সংস্কার ও সংরক্ষণের অভাবে জীর্ণপ্রায় এবং যেকোন সময়ে ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শহরের মল্লেশ্বরপুর এলাকায় মল্লেশ্বর শিবের ঝামাপাথরের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এখানকার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। সাবেক মন্দিরটি ভগ্ন হলে, বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্র ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে যে সংস্কার সাধন করেন তা মন্দির চত্বরে নিবদ্ধ এক লিপি থেকে জানা যায়। সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শকাব্দা ১৭৫৩/শাকে এম্বিদ্রিচন্দ্রে ধন পচন গ্রহং/সিদ্ধিখাতস্য খাতম্। শ্রীমান মল্লেশ বাসং/প্রহরিগণ গৃহং নাট্যযজ্ঞালয়ঞ্চ ॥/ধর্ম্মোজ্জো ধর্ম্মগেহং নবসদৃশকৃতং/সূচ্চসৌধন্তকার্ষীৎ। শ্রীমন্মল্লে শতুষ্ট্যৈ /নৃপবরসুকৃতী শ্রীযুতস্তেজচন্দ্র/মল্লেশ মন্দির নাট্যমন্দির প্রাচীর।/ধনগৃহ পাকগৃহ সিদ্ধি পুষ্করিণীর ॥/পঙ্কোদ্ধার শ্রীশ্রীস্বরূপ নারায়ণাগার।/জপস্থান দ্বার পাল গৃহ পুনর্ব্বার ॥/উজ্জ্বল করিলা মহারাজাধিরাজেন্দ্র।/শ্রীল বর্দ্ধমানাধীপ নৃপ তেজচন্দ্র ॥/শকাব্দা সতরশত তিপ্যান্ন আশ্বিন।/ব্রহ্মপক্ষে অঙ্ক করে লভে শুভদিন ॥/সন ১২৩৮।" মন্দিরটিতে বেশ কিছু পঙ্খ-পলস্তারার অলংকরণ দেখা যায়। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৬' (৭·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·)।

চন্দ্ররেখা : গোপীবল্লভপুর থেকে নয়াগ্রাম-ধূমসাই পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বালিগেড়িয়া থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত চন্দ্ররেখা গ্রাম (জে· এল· নং ১৮৭)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি হল, মাকড়াপাথরে নির্মিত একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, যা সাধারণভাবে চন্দ্ররেখা গড় নামেই পরিচিত। পুবে-পশ্চিমে প্রায় ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আয়তাকার এই দুর্গটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও এটি যে এ জেলার এক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দুর্গ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ দুর্গের নির্মাতা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে যে কিংবদন্তী প্রচলিত

আছে তা হল, স্থানীয় নয়াগ্রাম রাজবংশের চতুর্থ ভূস্বামী রাজা চন্দ্রকেতু খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে এই দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গের বাইরের পরিখা বর্তমানে ভরাট হয়ে গেলেও এখনও স্থানে স্থানে পরিখার নীচু খাদ লক্ষ্য করা যায়। দুর্গপ্রাচীরের চওড়া ঝামাপাথরের দেওয়ালের চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বর্তমান এবং এটির প্রবেশপথ পুবদিকেই ছিল বলে অনুমান করা যায়। প্রবেশপথের উত্তর-পুব লাগোয়া দুর্গের মধ্যে একস্থানে স্তূপীকৃত ঝামাপাথরের অবস্থান দেখে ধারণা করা যায়, সেখানে হয়ত কোন মন্দির বা দালান-কোঠা ছিল। যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে এ দুর্গটি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, "সুবিস্তীর্ণ কঙ্করময় কঠিন ভূমির'উপর এই গড়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, কুড়ি পঁচিশ ফিট প্রস্থ এবং বার তের ফিট গভীর ঐ পরিখাটি খনন করিতে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইয়া থাকিবে। পরিখাটির ভিতর পার্শ্ব হইতেই গড়ের চতুর্দিকে পনর ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর প্রাচীর ছিল। তৎপরে আর একটি ক্ষুদ্র পরিখা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল। সাড়ে পাঁচ ফিট দীর্ঘ, দুই ফুট প্রস্থ এবং দেড় ফিট উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা এই সকল গৃহ ও প্রাচীরগুলি নির্মিত হইয়াছিল।......"

চন্দ্রামেড় : 'গোলগ্রাম' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন চন্দ্রামেড় গ্রাম (জে· এল· নং ৪৬)। গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে যে সুউচ্চ ইটের ধ্বংসস্তূপটি দেখা যায়, সেখানে নাকি কোন এক চন্দ্রকেতু রাজার বসতবাড়ি ছিল বলে জনশ্রুতি। এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ একান্ত বাঞ্ছনীয়। এছাড়া এ গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কাশীনাথ শিবের পুবমুখী একটি শিখর-মন্দির ও রাসমঞ্চ এখানের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। একদুয়ারী শিখর-মন্দিরটিতে যে পাঁচ লাইন প্রতিষ্ঠালিপি দেখা যায় সেটির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রী৺কাশীনা/থ শিবংব যুভমস্ত স/কাব্দা ১৭৬৬ সন ১২৫১/শাল তাঃ ১৫ চৈইত্র/শ্রীআনন্দ মিস্ত্রী সাং দাসপুর",অতএব এ মন্দিরটি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য উত্তরে রঘুনাথের সতের চূড়া রাসমঞ্চটির প্রতিটি খিলান শীর্ষে পদ্মের অলঙ্করণ ছাড়াও দক্ষিণ দেওয়ালে যে লিপিটি আছে সেটির হুবহু পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ/র রাসমণ্ডফ খদিত/শ্রীআনন্দ মিস্ত্রী সাং দাস/পুর পং চেতুয়া সন ১২৫২/সাল ২৯ স্রাবণ।"

অতএব এ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, রাসমঞ্চটির ও পূর্বোক্ত মন্দিরের স্থপতি দাসপুর গ্রাম থেকে আগত আনন্দ মিস্ত্রী!

চন্দ্রী : খড়্গপুর-ঝাড়গ্রাম-গোপীবল্লভপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় তিন কিলোমিটার উত্তরে ঝাড়গ্রাম থানার অন্তর্গত চন্দ্রী গ্রাম (জে· এল· নং ৮১১)। এ গ্রামে ঝাড়গ্রামরাজ কর্তৃক ঝামাপাথরে নির্মিত চন্দ্রশেখর শিবের পশ্চিমমুখী শিখর সদৃশ দেউলটি এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, চন্দ্রশেখর শিবের নামেই গ্রামের নাম হয়েছে চন্দ্রী। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

চমকা: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মাদপুর স্টেশন থেকে দক্ষিণে মোরাম রাস্তায় (রিক্সা চলে) প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে নিশ্চিন্তা; সেখান থেকে ১ কিলোমিটার পুবে খড়্গপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত চমকা গ্রাম (জে· এল· নং ৪৫৩)। এ গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি হল, নাগ পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর পুবমুখী ইটের নবরত্ন মন্দির। এ মন্দিরের ত্রিখিলানের উপর নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যগুলি একান্তই মনোরম। পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ তিন লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীসৃধর জয়তি/আরব্ধ শকাব্দা ১৭৭৮ সন ১২৬৩ সাল তাং ৮ বৈসাখ যুক্রবার কৃত শ্রীযুক্ত/অযোধ্যারাম নাগ মিস্ত্রী শ্রীঠাকুর দাষ সিল ॥ শ্রীগোপাল চন্দ সাং দাসপুর"। অতএব ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২′ (৬·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৬′ (১১ মি·)। এ মন্দিরটির কাঠের দরজার পাল্লাতেও নানাবিধ ভাস্কর্য-অলঙ্করণ দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু দশাবতার ও বস্ত্রহরণ প্রভৃতি।

চাঁইপাট: পাঁশকুড়া-গোপীগঞ্জ পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার অন্তর্গত চাঁইপাট গ্রাম (জে· এল· নং ২১৬)। এ গ্রামের সূত্রধর পাড়ার নিকটবর্তী রাধাগোবিন্দজীউর পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এটির খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যটি যে এ জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ এক অলঙ্করণ-ভাস্কর্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মন্দিরটির স্তম্ভমূলেও 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে একসারি শিকারদৃশ্য। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৪′ (৭·৩ মি·), প্রস্থে ২৩′ (৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

"সখাবদা ১৬৮১ সন ১১৬৬ সাল/শুরু ও তৈয়ার সন ১১৬৭ সাল।"
অতএব ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলেছে।

এ গ্রামের আর একটি উল্লেখযোগ্য পুরকীর্তি হল, স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরের পুবমুখী নবরত্ন মন্দির। এ মন্দিরটিরও সম্মুখভাগের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধের এবং স্তম্ভমূলে শিকার দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। কার্নিশের নিচে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"যুভমস্তু/সকাবদা/১৭৫০/সন ১২৩৫।"
অতএব ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯′ (৫·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৬′ (১১ মি·)।

গ্রামের চন্দ্রেশ্বর শিবের দালান-মন্দিরের অনতিদূরে উত্তরমুখী যে দুটি আটচালা শিব মন্দির দেখা যায় সে দুটি ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে নির্মিত, তা মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায়।

চাউলি: 'ঘাটাল' নিবন্ধে গম্ভীরনগরে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে উত্তরে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার অন্তর্গত চাউলি গ্রাম (জে· এল· নং ৩৩)। এ গ্রামে স্থানীয় জানা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর মন্দির ও রাসমঞ্চটি

এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন রীতির এবং সেটির ত্রিখিলানের উপরে নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা। এছাড়া স্তম্ভমূলেও উৎকীর্ণ হয়েছে ইংরাজ সাহেবদের শিকারযাত্রা এবং মৈথুনরত নরনারীর দৃশ্য। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। এ মন্দিরের কার্নিসে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"সুভমস্তু/সকাব্দা ১৭২০/সন ১২০৫।"

অতএব মন্দিরটি ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ মন্দিরের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চটিতেও কৃষ্ণলীলার বিবিধ দৃশ্য 'টেরাকোটার' ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-যশোদা ও নবনারীকুঞ্জর ফলকগুলি একান্তই দৃষ্টি আকর্ষক।

জানা পরিবারের এ মন্দিরের প্রায় ১/২ কিলোমিটার উত্তরে এ গ্রামের শিবতলায় বুড়োশিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরেও বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ-ফলক দেখা যায়, তবে মন্দিরটির উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে কামবদ্ধ নরনারীর 'টেরাকোটা'-ফলকগুলি দৃশ্যতঃ খুবই পীড়াদায়ক বলে মনে হয়। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:

"সুভমস্তু/সকাব্দা/১৭৩১/সন ১২১৬/সাল।"

অতএব ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′ (৩·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)।

চাঙ্গুয়াল: খড়্গাপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কৌশল্যা; সেখান থেকে পুবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গাপুর থানার এলাকাধীন চাঙ্গুয়াল গ্রাম (জে· এল· নং ৩৬০)। এ গ্রামের নানাস্থানে মাকড়াপাথরের ধ্বংসস্তূপ, শিখর-মন্দিরে ব্যবহৃত আমলক ও অন্যান্য পাথরখোদাই দ্বারপার্শ্ব প্রভৃতি দেখা যায়। কিংবদন্তী যে, খ্রীষ্টীয় চৌদ্দ-পনের শতকে কোন এক বীরসিংহ রাজার পরিখাবেষ্টিত দুর্গটি এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। বীরসিংহের ভগ্ন এই প্রাসাদের পাশে কালনাগিনী নামে পাথরের এক দেবী মূর্তিও অধিষ্ঠিত দেখা যায়। এই মূর্তির কিছু পশ্চিমে ক্ষীর সরোবর নামক এক দিঘির তীরে প্রতিষ্ঠিত একটি ভগ্ন শিবমন্দিরও বেশ প্রাচীন বলেই অনুমান করা যায়।

চাঁচিয়াড়া: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে দক্ষিণে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন চাঁচিয়াড়া গ্রাম (জে এল নং ২০৮)। এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী এক তিনগম্বুজ মসজিদ এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী যে, কাশীজোড়া পরগণার ভূস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় নবাব সরকারে কর বকেয়া পড়ার দরুণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হন এবং সেজন্য নিজ বাড়ি পরিত্যাগ করে এই চাঁচিয়াড়া গ্রামে মসজিদ নির্মাণপূর্বক বসবাস করতে থাকেন। মসজিদটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে চাঁচিয়াড়া গ্রামে একটি পাথরের চামুণ্ডা মূর্তি আবিষ্কৃত হয় এবং বর্তমানে সেটি তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্রে সংরক্ষিত হয়েছে।

চাঁদপুর : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন চাঁদপুর গ্রাম (জে এল নং ৩৩)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় সেন পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির। প্রায় ৩'৩" (১ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে সামান্য পঙ্খের কাজ ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

চিরুলিয়া : 'এগরা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে এগরা-কাঁথি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) তাজপুর হয়ে দক্ষিণে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে এগরা থানার এলাকাধীন চিরুলিয়া গ্রাম (জে এল নং ২৬৫)। এ গ্রামে পাহাড়ী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী রামচন্দ্রের ত্রিরথ বারচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ও পঙ্খের অলঙ্করণ-সজ্জা দেখা যায়। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া এ মন্দিরের কাঠের দরজায় উৎকীর্ণ বহু দেবদেবীর মূর্তিও আকর্ষণীয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৯'৯" (৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫.১) মি·)।

চিলকিগড় : ঝাড়গ্রাম-চিলকিগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), অথবা গিধনী রেল স্টেশন থেকে দক্ষিণে গিধনী-চিলকিগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জামবনী থানার এলাকাধীন চিলকিগড় (জে এল নং ১৩১)। জামবনীর সামন্ত ভূস্বামী দেওধবলদেব পরিবারের গড়বাড়ি চিলকিগড়ে প্রতিষ্ঠিত কালাচাঁদের পুবমুখী নবরত্ন এবং শিবের দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দির দুটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে অভিনব। কারণ এখানকার এই দেবগৃহে দালান মন্দিরের উপরে যথাক্রমে নবরত্ন ও একরত্নের সংযোজন সে প্রথা বহির্ভূত রীতির উদাহরণ। এছাড়া কাছাকাছি দুলং নদীর অপর তীরে চিলকিগড়ের অধিষ্ঠাত্রী শাক্ত দেবী কনকদুর্গার পুবমুখী সাবেক পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। ত্রিখিলান এ মন্দিরটির ভিত্তিবেদী মাকড়াপাথরের হলেও, মন্দিরটি আগাগোড়া ইঁটের তৈরী। দৈর্ঘ্যে ২৭'৬" (৮·৩ মি·) প্রস্থে ২১' (৬·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·) এ দেবালয়টিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে স্থাপত্যবিচারে এটি আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে মনে হয়। বর্তমানে মন্দিরটি জীর্ণ হওয়ায় এটি পরিত্যক্ত, পরিবর্তে ঐ মন্দিরের সামনেই হাল আমলে নাটমন্দিরসহ একটি দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছে।

চোরচিতা : 'গোপীবল্লভপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটাপথে সিজুয়া গ্রামের কাছে সুবর্ণরেখা পার হয়ে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে গোপীবল্লভপুর থানার এলাকাধীন চোরচিতা গ্রাম (জে এল নং ৭৫)। এ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'চোরেশ্বর' শিবের শিখরদেউলটি এক পুরাকীর্তি। বিগ্রহ চোরেশ্বর নামটি একান্তই অভিনব। এ মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকার প্রকারে এটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

ছত্রগঞ্জ : 'চন্দ্রকোণা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে চন্দ্রকোণা-পলাশচাবড়ী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন ছত্রগঞ্জ গ্রাম (জে এল নং ৬৭)। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে, এ জেলার নানাস্থানে মেসার্স ওয়াটসন এণ্ড কোম্পানি যেসব নীলকুঠি বসিয়েছিলেন, এখানকার নীলকুঠিটি তার অন্যতম। এখনও এখানে ইটের সুউচ্চ চিমনিসহ নীলকুঠির ইমারতটি এক অভিনব পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

জকপুর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের জকপুর স্টেশন থেকে উত্তরে অথবা ৬ নং জাতীয় সড়কে কৃষ্ণনগর থেকে দক্ষিণে, হাঁটা পথে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন জকপুর গ্রাম (জে এল নং ২২৪)। এ গ্রামে সদর কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত রায় মহাশয়দের অট্টালিকা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলেও, সেখানকার ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত নাটমণ্ডপ সংলগ্ন আটচালা রীতির দ্বাদশ শিবালয়গুলি এখনও কোনরকমে টিকে রয়েছে। এ মন্দিরগুলির মধ্যে পাঁচটি পুব ও পাঁচটি পশ্চিমমুখী এবং দুটি উত্তরমুখী। এর মধ্যে পশ্চিমমুখী সারির সর্বদক্ষিণের মন্দিরটিতে যে উৎসর্গলিপি আছে তার হুবহু পাঠ নিম্নরূপ :

"সকাব্দা ১৬৯৯/ শাকেহক্ষাঙ্কেকলামানে/ শম্ভোদ্বাদশ মন্দিরঃ/ নির্ম্মমে শ্রীরাজনারা/ য়ণ ঘোষঃ শিবপ্রভুঃ।" অতএব ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরগুলি উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·২ মি·)।

আলোচ্য এই পরিবারের বসতবাটির একেবারে পশ্চিমসীমায় আরও দুটি পশ্চিমমুখী শিবের আটচালা মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দুটি মন্দিরও আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

গ্রামের শিবতলায় যক্ষেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী একটি ইটের আটচালা মন্দির দেখা যায়। স্বয়ম্ভু এ শিব সম্পর্কে কিংবদন্তী যে, এই যক্ষেশ্বর শিবের নামেই গ্রামের নাম হয়েছে যক্ষপুর—যা পরবর্তীকালে জকপুর নামে রূপান্তরিত। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে এটি খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

জগন্নাথবাড়ি : খড়্গপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পোক্তাপোল; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন, হাদলা-বলভদ্রপুর মৌজাভুক্ত (জে এল নং ৪৪০) জগন্নাথবাড়ি গ্রাম। এখানে পুবমুখী জগন্নাথের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, নারায়ণগড় রাজবংশের পৃথিবল্লভ পাল জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাদেশ লাভ করে কেলেঘাই নদীতীরবর্তী এবং পুরাতন জগন্নাথ রাস্তার পাশে এইস্থানেই মন্দিরটি স্থাপন করেন। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে স্থাপত্যবিচারে এটি উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯' (৫·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। বর্তমানে এই মন্দির পুরীর জগন্নাথ রামানুজ দাস-মোহন্ত মঠের পরিচালনাধীন।

জনার্দনপুর : 'কিশোরপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে কাঁচা রাস্তায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন জনার্দনপুর গ্রাম (জে এল নং ১২০)। এ গ্রামে কাঁসাই-এর শাখা নদীর তীরবর্তী যোগেশ্বর শিবের আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি এবং এ মন্দিরের পুব দেওয়ালে দুটি পোড়ামাটির মিথুনমূর্তি ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৪' (৪·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি, আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

এ মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে চক্রবর্তী পরিবারের পুবমুখী রঘুনাথের আটচালা মন্দিরটির সংলগ্ন একটি তিনচালাবিশিষ্ট মুখমণ্ডপ দেখা যায়। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রীবিষ্ণু মন্দির শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণ/ শকাব্দা ১৭৮৩ ১৮ ফাল্গুন।" অতএব ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' (৩.৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)। মন্দিরটিতে একসারি 'টেরাকোটা' ফলকে উৎকীর্ণ দশবতারের মূর্তি দেখা যায়।

এছাড়া এ মন্দিরগুলির সামান্য দক্ষিণে চক্রবর্তী পরিবারের সীতারামজীউর দক্ষিণমুখী শিখরদেউলটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে একসারি 'টেরাকোটা'-ফলকের উপর খোদাই খোল করতাল বাদকবৃন্দসহ গৌরনিতাই ও কৃষ্ণরাধার মূর্তি দেখা যায়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"সকাব্দা/১৭স ৩৬/ সন ১২স/ ২১ সাল।" অতএব ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০' (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·)।

জয়কৃষ্ণপুর : 'জনার্দনপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম (জে এল নং ৯৩)। এ গ্রামে বাঁকুড়া রায় ধর্মের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। একদুয়ারী এ মন্দিরটির প্রবেশপথের দুপাশে পোড়ামাটির দুটি দ্বারপালের মূর্তি নিবদ্ধ ছাড়াও, দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর 'টেরাকোটা' মূর্তি দুটির খোদাই কাজ বেশ নিখুঁত। মন্দিরটির উপরের চারচালায় নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলকটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী৺ বাঁকুড়া / রায় ধম্ম জীউ/ সন ১২২২ সাল"। অতএব ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪' (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

জয়কৃষ্ণপুর : 'গোবিন্দনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে তেমোহানী-অভিরামপুর মোরাম রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম (জে এল নং ১০২)। এ গ্রামটিতে হাজরা পরিবারের পুবমুখী শ্রীধরজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটিতে সামান্য পদ্মের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকার-প্রকারে উনিশ শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে গায়েন পরিবারের বরাহজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও, সেটিতে নিবদ্ধ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

।: ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত জয়ন্তীপুর গ্রাম (জে এল নং ১০৯)। এ গ্রামে চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামচাঁদজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরের সামনের দেওয়ালটি লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ জিউ/ সকাব্দা ১৭৬৭ সক/ সন ১২৫২ বারসত্ত সাল।" অতএব ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)।

গ্রামের চৌকানে অবস্থিত গঙ্গাধর শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

গোঁসাইপাড়ায় শ্রীরাধারসিকনাগরজীউর পুবমুখী ঝামাপাথরের চারচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। কোন প্রতিষ্ঠাফলক এ মন্দিরে না থাকলেও স্থাপত্যশৈলী বিচারে মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়। এ মন্দিরটি চারচালা রীতির হলেও শিখর-দেউলের মতই এ মন্দিরটির শীর্ষে একটি আমলকও দেখা যায়। মন্দিরটি উচ্চতায় আনুমানিক ২৩′ (৭ মি·)।

জয়পুর: 'গড় আড়ড়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে ১ কিলোমিটার পুবে কেশপুর থানার এলাকাধীন জয়পুর গ্রাম (জে এল নং ৬১)। একদা ব্রাহ্মণভূম পরগণার গড় আড়ড়ার বিখ্যাত ভূস্বামী রাজা রঘুনাথ রায় এ গ্রামে দেবী জয়চণ্ডীর পাথরের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সে মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় সেটি যে কোন্ রীতির মন্দির ছিল তা জানা যায় না। তবে এ মন্দিরটি যে ষোড়শ শতকে রাজা রঘুনাথের আমলে নির্মিত হয়েছিল, তা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বর্ণনা থেকে জানা যায়। বর্তমানে খড়ে ছাওয়া এক ঘরে দেবীর এক নতুন মন্দির স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে সাবেক মন্দিরটির পাথরে খোদাই এক সংস্কারলিপি দেখা যায়, যার পাঠ নিম্নরূপ:

"সকাব্দা ১৭৫১/ শ্রীশ্রীজয়চণ্ডী মা/ শ্রীনিত্যানন্দ সিংহ/ সন ১২৩৭ সাল/ তাং ২ মাঘ মাষ।"

বর্তমানে একটি মজা দিঘির পাড়ে বিশাল এক বটগাছের তলায়, জয়চণ্ডীর মন্দির দেওয়ালের পাথরগুলি আজ অতীত ইতিহাসের এক স্মৃতি মাত্র।

জলসরা: ঘাটাল-ক্ষীরপাই পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল থানার অন্তর্গত জলসরা গ্রাম (জে এল নং ৭৩)। এ গ্রামে বুড়ো শিবের পুবমুখী বারচালা মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে এ মন্দিরটি শুধু বারচালা রীতির মন্দিরই নয়,

এটি শিখরদেউলের মতই ত্রিরথ করে নির্মিত, যার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় এগরা থানার অন্তর্গত চিরুলিয়া গ্রামে। অলঙ্করণহীন, এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

জাড়া: ক্ষীরপাই নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে উত্তরে ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত জাড়া গ্রাম (জে এল নং·১৫২)। প্রাচীন মঙ্গলকাব্য চণ্ডীমঙ্গলের দিক্‌বন্দনায় এ গ্রাম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, "জাড়া গ্রামে বন্দিলাঙ ঠাকুর কালু রায়।" কিন্তু উল্লিখিত কালু রায় প্রাচীন দেবতা হলেও তার মন্দিরটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এ গ্রামের পুরাকীর্তিগুলির অধিকাংশই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন দালান রীতির মন্দির। গ্রামের শিবতলায় পশ্চিমমুখী যে দুটি আটচালা মন্দির দেখা যায় সেগুলির মধ্যে উত্তর দিকের ভুবনেশ্বর শিব মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে যে দু লাইন প্রতিষ্ঠালিপি আছে তার পাঠ: "শ্রীশ্রীভুবনেশ্বর সক ১৭৪৬/১২৩১।" দক্ষিণের বাঁকা রায় শিব মন্দিরটিরও সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ এক লাইন লিপিটি নিম্নরূপ: "শকাব্দা ১৮৪২ বাং সন ১৩২৭ সাল॥ শ্রীশ্রী৺বাঁকা রায়·শকাব্দা ১৭৪৬ বাং ১২৩১।" লিপিফলক অনুসারে দুটি মন্দিরই ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র বাঁকা রায়ের মন্দিরটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়েছে। একদুয়ারী দুটি মন্দিরের গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়াল কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। শিবতলার কাছেই দে পরিবারের পরিত্যক্ত পার্বতীনাথের পুবমুখী দালান রীতির যে মন্দিরটি দেখা যায়, সেটির প্রবেশপথের উপরিভাগে পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়াও, এক লাইন প্রতিষ্ঠালিপি বর্তমান। সে লিপির পাঠ: "শ্রীশ্রীদেবস্থাপন। সকাব্দা ১৭৭৩ সন ১২৫৮। শ্রীচণ্ডিচরণ দে। মিস্ত্রি শ্রীরামচরণ পাল।" ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির স্থপতির নাম জানা গেলেও তাঁর বাসস্থানের কোন পরিচয় জানা যায়নি। এ মন্দিরের সমসাময়িক আরও একটি মন্দির হল চৌধুরী পরিবারের বৃহৎ দালান রীতির দক্ষিণমুখী সিংহবাহিনী ঠাকুরবাড়ি, যা পূর্বোক্ত মন্দিরটির সামান্য পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ: "সকাব্দা ১৭৭৩।৫।২৩ দালান সমাপ্ত"। সে সময় এই রীতির মন্দিরগুলিকে যে 'দালান' নামে অভিহিত করা হত, তা এই লিপি থেকে জানা যায়।

গ্রামের সরকার পাড়ায় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কালীর দক্ষিণমুখী পঞ্চরথ-শিখর দেউলটির স্থাপত্যে কোন বৈশিষ্ট্য দেখা না গেলেও প্রবেশপথের উপরিভাগে পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত সংস্কারলিপি একান্তই কৌতূহলোদ্দীপক। সে লিপিটির পাঠ: "শ্রীশ্রীসিবায় নমঃ/সন ১২২৩ সালে এই মন্দির কমলিনি/সম গিন্নিমার খরচাতে মানিক্য/রাম মিস্তির দ্বারায় তয়ার করা/য় এক্ষেনে ভগ্ন হইবায় শ্রীযুক্ত বাবু/সিবনারায়ন রাএর সাহায্যতায় মেরামত/হইল। কারিকর শ্রীজজ্ঞেস্বর মিস্ত্রি সন ১২৫৮ সা/ল মাহ অগ্রহায়ন তাং ১৬ সমাপ্ত"। সুতরাং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির মূল স্থপতি ও সংস্কারক মিস্ত্রীর নাম পাওয়া গেলেও তাদের বাসস্থানের কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। প্রায় ১৬′৫″ (৫ মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়াল কোণে

উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

আলোচ্য এই পাড়াতেই সরকার পরিবারের পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণযুক্ত পুবমুখী দালান রীতির যে শিব ও বিষ্ণুর মন্দিরটি দেখা যায়, সেটির প্রবেশপথের উপরে দুটি লিপি একান্তই অভিনিবেশযোগ্য। পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ বাঁদিকের তিন লাইন লিপিতেই বর্ণিত হয়েছে প্রতিষ্ঠাতার নাম ও প্রতিষ্ঠা তারিখ, যথা: "শ্রীশ্রীবিষ্ণুমণ্ডপ শ্রীশ্রীশিব মণ্ডপ/সন ১২৬০ সালে এই মন্দির ৺রামমোহন সরকার/প্রস্তুত করান। কারিকর গোপাল মিস্ত্রী সাং খানাকুল।" ডানদিকে চার লাইন সংস্কারলিপিটি নিম্নরূপ: "সন ১৩২৬ সালে শ্রীদীননাথ সরকার গিরীশচন্দ্র সরকার/শশীভূষণ সরকার, আশুতোষ সরকার, ত্রিপুরাচরণ সরকার ও/শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সরকারের দ্বারা পুনঃসংস্কার হয়/কারিকর শ্রীরাখাল চন্দ্র দাস সাং ক্ষীরপাই।"

এ গ্রামের ময়নাপুকুরের উত্তরপাড়ে প্রতিষ্ঠিত রায় পরিবারের পশ্চিমমুখী শিবের দালান রীতির মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ফলকে নিবদ্ধ পাঁচ লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ: "শ্রীশ্রীশিব জয়তি/মধুমাসে শত্রুমানে দিনে সোমে/শিবালয়ং বেদ শম্ভু সরিন্নাথ বিধুমানে/শকেভবত॥ ১৭৬৪ বাঙ্গলা ১২৪৯/১৫ চৈত্রি সোমবার"। অতএব ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির সামনেই পুবমুখী যে আর একটি দালান রীতির মন্দির দেখা যায় সেটিতেও পোড়ামাটির ফলকে ঐ একই বয়ানের লিপি খোদিত রয়েছে। তাছাড়া, এ মন্দিরের পাশাপাশি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আরও যে একটি পুবমুখী দালান রীতির মন্দির দেখা যায় সেটি উমাপতি শিবের মন্দির এবং সেটিতে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শিবঠাকুর জিউ/সগৃহং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র/রায়ের মাতার কৃত/সন ১২৭৩। শকাব্দ ১৭৮৮"।

রায় পরিবারের উল্লিখিত তিনটি মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে কাশীনাথ ও পার্বতীনাথ শিবের উত্তরমুখী দালান মন্দিরটিতে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপিটির খোদাইকাজে বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। সে উৎসর্গলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীপার্ব্বতীনাথ শ্রীকাশীনাথ/শ্রীশিবো/ বাঞ্ছিতা/ষটকর্ম্ম শ্রেষ্ট সস্ত্রীক রচিত: শিবনারায়ণা-দেশ/তোদ্বেতক্ষরাহে নয়ন্নাং সুগঠিতই হচাবিবপটববদেবো/শেষে শাক। নাগাষ্ট রত্নাকর শশধর মে মন্দিরে শ্রীশিবস্য/শীলেশম্ভবক্কিস্বাদঃ পতি যুগ শশিষ্মসিনযতেসুমুহেতে/ চারুচন্দ্রচূড়চরণার্চ্চনরভ শ্রীশিবনারায়ণ দেব সর্ম্মনঃ যত্নং/সুন্দর শশধর শিরঃ শিবকরশিরস্চর স্বদ্বিহষ্টীনক্ষ নর/সকাব্দা: ১৭৮৮। সন ১২৭৩।"

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে গঙ্গাধর শিবের পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নাবস্থা হলেও মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীরাম সুভমস্ত্ত/সকাব্দা ১৭৩৬/সন ১২২১ বারস.....।" ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একদুয়ারী এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬'১" (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৬' (৮ মি·) মিটার।

রায় পরিবারের চণ্ডীমণ্ডপের সংলগ্ন পুবমুখী ভুবেনেশ্বর শিব ও গোপাল মন্দির, পশ্চিমমুখী শীতলা মন্দির, উত্তরমুখী রামেশ্বর ও কামেশ্বর শিবের মন্দির সককটিই দালান রীতির মন্দির। কেবলমাত্র ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের মন্দিরে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে তা নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রীরামেশ্বর/সুভমস্তু সকাব্দা/১৭১৭ সক....।"

জামনা : দক্ষিণপূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-তেমাথানী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পিংলা থানার এলাকাধীন জামনা গ্রাম। (জে এল নং ৩৩)। এই গ্রামে দিন্দা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির মধ্যে রাসমণ্ডলটি একান্তই চিত্তাকর্ষক। এছাড়া গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দুধারে পঙ্খ-পলস্তারায় নির্মিত বাতায়নবর্তিনী ও 'টেরাকোটা'য় নির্মিত দ্বারপালের মূর্তিও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৯'৬" (৫·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·১ মি·)।

জোতবাণী : 'কলমীজোড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে কলমীজোড়-ধানখাল রাস্তায় পশ্চিমে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার অন্তর্গত জোতবাণী গ্রাম (জে এল নং ১১৫)। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায় জীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে পঙ্খ-পলস্তারায় যেসব মূর্তি-ভাস্কর্য খোদিত হয়েছে, সেগুলির বিষয়বস্তু হল, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, কৃষ্ণরাধা এবং গৌর-নিতাইসহ কীর্তনীয়া দল প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬'৯" (৫·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·১ মি·)।

জোতমুরী : 'জোতবাণী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দিশ দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে কলমীজোড়-ধানখাল মোরাম রাস্তায় পুবে প্রায় ½ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার অন্তর্গত জোতমুরী গ্রাম (জে এল নং ১১৪)। এ গ্রামে রাস্তার পাশে অবস্থিত গঙ্গাধর শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে পুত্রকন্যাসহ শিবদুর্গার পোড়ামাটির মূর্তি এবং পুব দেওয়ালে প্রায় ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট মিথুন মূর্তি প্রভৃতি নিবদ্ধ হয়েছে। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"সুভমস্তু সকাব্দা ১৭৫০ সন ১২/৩৫ সাল মন্দির দিয়াছেন/শ্রীসন্ন্যাসী জানা শ্রীহরিচরণ জানা/ সাঃ জত্তিমরি গড়্যাচেন শ্রীহরহ/রি চন্দ্র মিস্ত্রি সাঃ দাসপুর।" অতএব ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬ মি·)

পূর্বোক্ত মন্দিরটির সামান্য পুবে শীতলার একটি দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২'৬" (৩·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

ঝাকরা : ঘাটাল-কেশপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন ঝাকরা গ্রাম (জে এল নং ২৩৫)। একদা বর্ধমান-মেদিনীপুর বাদশাহী সড়কের ধারে অবস্থিত এ গ্রামটিতে মাকড়া পাথরের ঘাটযুক্ত রাজার দিঘি নামে এক বিরাট জলাশয় লক্ষ্য করা যায়। আসলে কথিত এই রাজা ছিলেন এক ঐতিহাসিক

ব্যক্তি, যাঁর পরিচয় পাওয়া যায় আসাম সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী' নামে এক ফার্সী গ্রন্থে। উল্লিখিত সে পুস্তকটি থেকে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় সতের শতকের প্রথম দিকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার জমিদারদের বিরুদ্ধে এক মোগল অভিযান হয়। তার ফলে চন্দ্রকোণা, বরদা ও ঝাকরা প্রভৃতি এলাকার জমিদাররা মোগল বশ্যতা স্বীকার না করায় মোগল ফৌজদার মীর্জা মহম্মদ মুরাদ তাঁদের দণ্ডিত করেন। অনুমান করা যায়, এর পর থেকেই ঝাকরার এই ভূস্বামীদের পতন ঘটে এবং কথিত ঐ রাজার দিঘিটি ছাড়া, ঐ রাজবংশের আর কোন স্মৃতিচিহ্নই আর বর্তমান নেই। তবে এই দিঘির উত্তর দিকে এক বিশাল বটগাছের তলায় ওলাইচণ্ডী নামে যে পাথরের খণ্ডটি পূজা করা হয়, সেটি যে কোন শিখরদেউলে ব্যবহৃত আমলক শিলার অংশ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ থেকে মনে হয়, মোগলদের অত্যাচারে ঝাকরার রাজবাড়ি বা সে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-দেবালয় প্রভৃতি এইভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ঝাড়গ্রাম: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর থেকে ঝাড়গ্রাম স্টেশন অথবা খড়্গপুর-ঝাড়গ্রাম পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঝাড়গ্রাম থানার সদর (জে এল নং ৩৯৬)। ঝাড়গ্রাম-রাজ প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী দেবীর পশ্চিমমুখী মন্দিরটি এক দ্রষ্টব্য। চতুর্দিকে পাঁচখিলানযুক্ত প্রদক্ষিণপথসহ এক দালান-মন্দিরের মধ্যস্থলে স্থাপিত উপরদিকে সরু গোলাকার এক চূড়াযুক্ত অভিনব স্থাপত্যের এই মন্দির। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের এবং বাইরের চারপাশের অলিন্দের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি খিলেন এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজ করে নির্মিত। মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বহু প্রাচীন হলেও মন্দিরটি যে তেমন প্রাচীন নয় তা বেশ বোঝা যায়। শতাধিক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এ-মন্দিরে সাবিত্রীর কোন মূর্তি নেই, কেবল একটি পেটিকার উপর রক্ষিত সিঁদুর-মাখা খড়্গই এখানে পূজিত হয়। জনশ্রুতি যে, ঐ পেটিকার মধ্যে রক্ষিত একগুচ্ছ কেশই হল দেবী সাবিত্রীর। একদা দস্যুদল কর্তৃক অপহৃত হয়ে যখন জঙ্গলে তিনি লালিতপালিত হন, সেই সময় ঝাড়গ্রাম রাজ তাঁকে ধরার চেষ্টায় তাঁর চুলের মুঠি ধরে ফেলেন। কিন্তু দেবী চোরাবালিতে প্রবেশ করায় রাজার হাতে যে কেশগুচ্ছ থেকে যায় তাই স্বপ্নাদেশ পেয়ে এখানে ঐ চুলের গোছার সঙ্গে তাঁর ব্যবহৃত খাঁড়াটিও প্রতিষ্ঠা করে পুজোর ব্যবস্থা করেন।

তবে সাবিত্রী দেবীর মন্দিরটি তেমন প্রাচীন সৌধ না হলেও, মন্দিরের মধ্যে পাথরের বেশ কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি সংরক্ষিত দেখা যায়। সে মূর্তিগুলি হল, চতুর্মুখ লিঙ্গ, লোকেশ্বর বিষ্ণু ও একটি মনসা মূর্তি। মূর্তিগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত তা জানা না গেলেও, ভাস্কর্য-শৈলী বিচারে এগুলি দশম-একাদশ শতকের বলেই অনুমান করা যায়।

ঝিকুড়িয়া 'খানামোহন' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পুবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার অন্তর্গত ঝিকুড়িয়া গ্রাম (জে এল নং ২৯২)। এ গ্রামের প্রধান দ্রষ্টব্য হল, কাঁসাই তীরবর্তী ঘোষ পবিবারের প্রতিষ্ঠিত শীতলার পুবমুখী এক পঞ্চরত্ন মন্দির। এ মন্দিরটিতে তেমন কোন অলঙ্করণ না থাকলেও, মন্দিরটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রী রাম:/শকাব্দ: ১৭৯৭"। অতএব ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামনে পশ্চিমমুখী তিনটি ক্ষুদ্রাকার আটচালা শিব-মন্দির দেখা

যায় এবং মধ্যের মন্দিরটিতে কিছু পোড়ামাটির ফলকসজ্জাও ছিল। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দির তিনটি আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে অনুমান করা যেতে পারে।

টেপরপাড়া : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা স্টেশন থেকে মেছেদা-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পটাশপুর থানার অন্তর্গত টেপরপাড়া গ্রাম (জে এল নং ৩১)। এ গ্রামে ব্যবর্তা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনজীউর পুবমুখী চারচালা জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। একদুয়ারী প্রবেশপথের খিলানশীর্ষে বাঁকানো কার্নিসের নিচে ও প্রবেশপথের দুধারে খাড়াভাবে একসারি করে পোড়ামাটির ফলক-সজ্জা দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু হল, দশাবতার, ঢোলবাদক ও মোহন্ত প্রভৃতি। মূল মন্দিরের তিন দিকের দেওয়ালে বরণ্ডের উপরে নিবদ্ধ ১′৬″ (৪৫ সে·মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট বৈষ্ণব, মোহন্ত এবং বিভিন্ন রীতির রতিক্রীড়াযুক্ত মিথুনমূর্তির 'টেরাকোটা'-ভাস্কর্যগুলি বেশ অভিনব বলা চলে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

ডাইনটিকরী : মেদিনীপুর-লালগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) লালগড়; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে বীনপুর থানার এলাকাধীন ডাইনটিকরী গ্রাম (জে এল নং ৭০২)। কাঁসাই তীরবর্তী এ গ্রামে পরিত্যক্ত মাকড়াপাথরের এক পুবমুখী পঞ্চরথ পীঢ়া-দেউল এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। স্থানীয় গ্রামবাসীদের মতে এ মন্দিরে নাকি একদা দেবী রঙ্কিনীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু এ ধারণার মূলে কতটা সত্যতা আছে তা জানা না গেলেও, পার্শ্ববর্তী নেতাই প্রভৃতি গ্রামের আশপাশে পাথরের জৈন দেবদেবীর যে সব ভগ্ন মূর্তি-ভাস্কর্যের নিদর্শন ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তা থেকে অনুমান করা যায়, হয়ত আদিতে এটি কোন জৈন দেবতার মন্দির ছিল এবং পরবর্তী সময়ে লৌকিক দেবী রঙ্কিনীর প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকবে। মন্দিরটির সামনের বেশ খানিকটা অংশ বর্তমানে ভেঙে পড়ায়, সেখানে আদিতে কোন মুখমণ্ডপ ছিল কিনা তা বোঝা যায় না। মন্দিরে ব্যবহৃত চৌকো পাথরগুলিকে গাঁথনীর সময় শক্ত করে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে যে লোহার হুকের ব্যবহার হয়েছিল, তার চিহ্নও বর্তমান দেখা যায়। মন্দিরটির উপরের ছাদ নটি ধাপে বিভক্ত এবং ভিতরের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটি খ্রীষ্টীয় বার-তের শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

ডাঙ্গরা : বালীচক রেল স্টেশন থেকে বালীচক-ময়না পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পিঙ্গলা থানার এলাকাধীন ডাঙ্গরা গ্রাম (জে এল নং ৪৮)। এ গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় সেকালে দানবীর হিসাবে খ্যাত চন্দ্রশেখর ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত যে দক্ষিণমুখী দালান রীতির কালী মন্দিরটি দেখা যায়, তার পুব ও পশ্চিমে ছটি করে বারটি শিবের শিখর-দেউল এখানকার পুরাকীর্তি। এ সবকটি শিখর-দেউলই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৭′ (২·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১২′ (৩·৬ মি·)।

এছাড়া ঘোষ পরিবারের ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটির প্রধান চূড়াটি ছাড়া আর সব কটিই ভূপতিত। এ মন্দিরের উত্তর-পুব কোণে শ্যামসুন্দরের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটিও বর্তমানে ভগ্নাবস্থায় পতিত। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও আকার-প্রকারে মন্দির টি আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

এ গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় রুদ্রেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী একদুয়ারী সপ্তরথ শিখর-দেউলটিও উল্লেখ্য। মন্দিরটি স্থানীয় বসু পরিবার কর্তৃক যে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, তা ঐ মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ এক লিপিফলক থেকে জানা যায়। অলংকরণহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·)।

ডিঙ্গল : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের রাধামোহনপুর স্টেশন থেকে পুব-দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার অন্তর্গত ডিঙ্গল গ্রাম (জে এল নং ৪৮৬)। স্থানীয় সুর পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি হলেও, সেটির সামনের অংশ বর্তমানে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু এ মন্দিরটিতে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির বেশ কিছু অংশ এখনও দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের শেষদিকে এ জেলায় যেসব বৃহদায়তন পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছিল, এটি যে সেই ধরনেরই একটি মন্দির, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ মন্দিরটির সামান্য পশ্চিমে সুর পরিবারের পুবমুখী রাজরাজেশ্বরীর দালান রীতির মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও, সেটিতে ব্যবহৃত কাঠ খোদাইয়ের নকশাযুক্ত একটি কাঠের কপাট দেখা যায়। অনুরূপ আর একটি নকশা ও মূর্তি খোদিত সুন্দর কাঠের কপাট স্থানীয় শীতলার মাটির দেওয়ালযুক্ত ঘরে দেখা যায়। এসব কাঠ খোদাইয়ের কাজ দেখে অনুমান করা যায় যে, আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদু'টি নির্মিত হয়ে থাকবে।

শীতলা মন্দিরের সামনেই স্থানীয় নরসিংহ শিবের পশ্চিমমুখী এক আটচালা মন্দির দেখা যায়, যার উত্তর দেওয়ালে একটি মিথুন মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের শেষদিকে নির্মিত বলে মনে হয়। এ মন্দির-চত্বরে মাকড়াপাথরে নির্মিত একটি অশ্বারোহী যোদ্ধামূর্তি ও একটি ক্ষুদ্রাকার শিখর-দেউলের প্রতিরূপ নিবেদন-মন্দির পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এছাড়া গ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত 'দমদমা' নামক ঢিবিটিতে বিস্তর মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ দেখা যায় এবং সাধারণ লোকে এটিকে কোন রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ বলে ধারণা করে থাকেন। সুতরাং সত্যাসত্য নির্ণয়ে এইস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

ডিঞাপুর : 'ঝিকুড়িয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পুবে প্রায় ১১/২ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার অন্তর্গত ডিঞাপুর গ্রাম (জে এল নং ২৮০)। এ গ্রামে চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের পশ্চিমমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে লঙ্কাযুদ্ধ, কৃষ্ণলীলা ও সেকালের সমাজচিত্র বিষয়ক যে পোড়ামাটির ফলকগুলি নিবদ্ধ হয়েছে তা একান্তই চিত্তাকর্ষক। কার্নিসের নিচে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"শকাব্দা ১৭৬২/সন ১২১১ এগার সাল।" অতএব ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩'৬" (৪·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। সরকারী উদ্যোগে মন্দিরটির অবিলম্বে সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য এ মন্দিরটির অনতিদূরে পালিত পরিবারের আটকোণা রাসমঞ্চটিতেও বেশ বড়ো আকারের নিরেট পোড়ামাটির মূর্তি নিবদ্ধ দেখা যায়।

এছাড়া এ গ্রামে পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত প্রায় ২৭' (৮·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট পশ্চিমমুখী আরও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায় এবং সে মন্দিরটিতেও এক সময়ে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটি অলংকরণ-সজ্জা ছিল। বর্তমানে সংরক্ষণের অভাবে মন্দিরটির 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট।

ডিহি গুমাই : মেছেদা-মহিষাদল-নরঘাট পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) নন্দকুমার; সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁটা পথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে মহিষাদল থানার এলাকাধীন ডিহি গুমাই গ্রাম (জে এল নং ৭৭)। এ গ্রামে স্বয়ম্ভু শিব দক্ষিণেশ্বরের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগে বর্তমানে কোন অলঙ্করণ নেই এবং ভক্তদের দাক্ষিণ্যে বর্তমান মন্দিরটির তিনদিকের দেওয়াল মোজেক সিমেন্টযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৫' (৪·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকার-প্রকারে উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত। রোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে দূরব্যাপী খ্যাতির জন্য এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়ে থাকে।

ডিহি চেতুয়া : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বকুলতলা; সেখান থেকে পশ্চিমে পিচের সড়কে (বাস ও রিক্সা চলে) প্রায় ১½ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন ডিহি চেতুয়া গ্রাম (জে এল নং ৪৮)। এখানে চাঁদ খাঁ পীরের মাজারটি বেশ প্রাচীন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এই পীরের দরগায় মানত করে থাকেন। দক্ষিণমুখী অর্ধগোলাকৃতি খিলেন দ্বারা নির্মিত এক সৌধের মধ্যে পীর সাহেবের মাজারটি প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য এই পীরের মাজারস্থান থেকে সামান্য পশ্চিমে বলরামবাজার এলাকায় পুবমুখী শীতলার দালান-মন্দিরটিও দ্রষ্টব্য। ইটের তৈরি মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে এই দালান-মন্দিরটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল মাত্র তিনশত পঞ্চাশ টাকা। মন্দিরে নিবদ্ধ সে প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীশ্রী ৬ শিতলা ঠাকুরাণি/সকাব্দ ১৮০৫ সন ১২৯০ সাল/প শ্রীমত্যা মাধবি দাসী।/তস্বপুত্র শ্রীনবিন চন্দ্র বেরা/সাং ডিহি চেতুয়া পঃ চেতুয়া/শ্রীউদয় চন্দ্র মিস্ত্রি/এই মণ্ডবে ৩৫০ টাকা খরচ হইল/রামস্কন্দ হনুমন্ত. বেনি এবিকদর জংশরস্তি বিরূপ/বিদ্যুৎ ভঅ নাস্তি রাম রাম রাম।" সুতরাং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৬' (৪·৯ মি·), প্রস্থে ১২'৯" (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১০'৬" (৩·২ মি·)।

ডিহি বলিহারপুর : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর;

সেখান থেকে পুবে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটারর দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন পুরুষোত্তমপুর মৌজাভুক্ত (জে.এল.নং ৫৮) ডিহি বলিহারপুর গ্রাম। এ গ্রামে পাঠকগোস্বামী পরিবারের দক্ষিণমুখী রাধাগোবিন্দের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ দৃশ্য। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক লাইন প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:
"শুভমস্তু সকাব্দা ১৭শ ২০ সন ১২০৫ সাল।" অতএব ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৯'৯" (৬ মি·) প্রস্থে ১৮' (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরটির পশ্চিম পাশে প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চটি নবরত্ন রীতির। পুবদিকের দেওয়ালে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ:
"শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৪৯/সন ১২৩৪ সাল"। অতএব ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ রাসমঞ্চটি উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে গোঁসাইপাড়ায় দুটি পুবমুখী জোড়া আটচালা মন্দির দেখা যায়। ঐ দুটি মন্দিরে সংস্থাপিত উৎসর্গলিপি অনুসারে জানা যায় যে, দক্ষিণ পাশের বাণেশ্বর শিবের মন্দিরটি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং উত্তর পাশের বীরেশ্বর শিবের মন্দিরটি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। দুটি মন্দিরেই সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায় এবং মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮' (২·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৪' (৪·২ মি·)।

ঢেকিয়া: 'চণ্ডীপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখানে থেকে পুবে প্রায় ১ কিলোমিটার দুরত্বে খড়্গপুর টাউন থানার এলাকাধীন স্থানীয় পৌরসভার অন্তর্ভূক্ত ঢেকিয়া। মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ঝাড়েশ্বর শিবের পুবমুখী মাকড়া পাথরের একটি শিখর-দেউল এখানকার এক পুরাকীর্তি। বর্তমানে মন্দিরটির বাড় অংশের উপরিভাগ বিনষ্ট হওয়ায় সেটিকে প্রথম দর্শনে দালান-রীতির মন্দির বলে ভ্রম হয়। এছাড়া মন্দিরটির গঠন-স্থাপত্য ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ওড়িশী স্থাপত্যশৈলীর মতই এ মন্দিরেও হয়ত একদা পীঢ়া রীতির জগমোহনটি সংশ্লিষ্ট ছিল। মন্দিরটির ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত এবং স্থাপত্য বিচারে এটি খ্রীষ্টীয় সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

তমলুক: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা স্টেশন থেকে মেছেদা-তমলুক পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) অথবা, হাওড়া-হলদিয়া রেলপথে, তমলুক থানার এলাকাধীন সদর এই তমলুক পৌর-শহর। সাম্প্রতিককালে, এই শহর ও তার আশপাশের এলাকায় বহুবিধ প্রত্নসম্পদ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কারের ফলে এ স্থানটি আজ ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ কর্তৃক প্রাচীন এই স্থানটির আশেপাশে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষামূলক উৎখননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানাবিধ পাথরের হাতিয়ার ও অসম্পূর্ণরূপে পোড়ানো মাটির পাত্রের সঙ্গে ঐতিহাসিক কালের যেসব মৃৎশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি এখানকার অতীত ইতিহাসের এক বিস্ময়কর সাক্ষ্য। এছাড়া রোমক

সভ্যতার সাদৃশ্যযুক্ত যেসব পোড়ামাটির মৃৎপাত্র ও তার ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে তার নজিরে প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত যে, সমকালীন গ্রীস ও রোমের সঙ্গে সমুদ্রপথে হয়ত এ অঞ্চলের এক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রীক ভূগোলজ্ঞ টলেমী, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত তাঁর ভৌগোলিক বিবরণে, 'পালিবোথরা' বা পাটলিপুত্রের দক্ষিণপূর্বে 'কমবাইসন' নদীতীরে 'তমালিটিস' নামে এক নগরীরও উল্লেখ করেছিলেন।

এখান থেকে বিভিন্ন সময়ে অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক তথা তাম্রপ্রস্তর যুগ এবং খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের পোড়ামাটির বহুবিধ মৃৎপাত্র, চাকা লাগানো হাতি ও মেষ মূর্তি সমন্বিত খেলনা, যক্ষিণী মূর্তিসহ নানাবিধ মূর্তিযুক্ত পোড়ামাটির ফলক, প্রাচীন মুদ্রা, পাথরের মাল্যদানা এবং পাথরের মূর্তি-ভাস্কর্য প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। সেজন্য এখানকার এসব অসংখ্য পুরাবস্তুর নিরিখে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অনুমান যে, সেকালের বিবিধ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, বিদেশী বা চৈনিক পর্যটনকারীদের বিবরণাদিতে বিভিন্ন নামে উল্লিখিত সেকালের সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, তাম্রলিপ্তিকা, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্ত, তমোলিপ্তী তমোলিত্তি, তমোলিতি, তম্মোলিতি দামলিপ্ত, তমালিটিস, টলিকটেই ও তম্বলুকই সম্ভবতঃ আজকের এই তমলুক।

সম্প্রতি তমলুক শহরে প্রতিষ্ঠিত, 'তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র' নামক মিউজিয়ামটিতে এই এলাকার পার্শ্ববর্তী নানাস্থান থেকে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান পুরা-নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কাছাকাছি রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী এলাকায় এই সংগ্রহশালার পক্ষে অনুসন্ধান চালিয়ে আনুমানিক আদিপ্রস্তর থেকে মধ্যপ্রস্তর যুগে আদিম মানুষের ব্যবহৃত প্রস্তরীভূত হাড় ও হরিণের শিঙের উপর ক্ষোদিত নকশাযুক্ত যেসব পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে তা একান্তই চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সংগৃহীত প্রাগৈতিহাসিক কালের অন্যান্য পাথর, তামা ও হাড়ের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, মৌর্য-সুঙ্গ যুগ থেকে পাল-সেন যুগ অবধি প্রাপ্ত বহু পোড়ামাটির মৃৎপাত্র মূর্তিকা ও ফলক এবং নানাবিধ খেলনা-পুতুল ছাড়াও, এখানের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল, জাতকের কাহিনী সম্বলিত পোড়ামাটির কয়েকটি ফলক, ব্রাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ হাঁড়ি, গুপ্ত আমলের ব্রাহ্মী লিপি মুদ্রিত মুদ্রাঙ্ক প্রভৃতি। এছাড়া প্রাচীন তাম্রপট্ট, ব্রোঞ্জ নির্মিত ক্ষুদ্রাকৃতি দেবীমূর্তি ও প্রাচীন প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসাবে বেশ কিছু মূর্তির সংগ্রহও এ মিউজিয়ামের বিশেষ আকর্ষণ। এসব মূল্যবান প্রত্নবস্তু বাদেও, মৌর্য-সুঙ্গ আমল থেকে বিভিন্ন যুগের মুদ্রা, মন্দির সজ্জায় ব্যবহৃত পোড়ামাটির নানাবিধ ফলক, প্রাচীন পুঁথি এবং লোকশিল্পের বেশ কিছু নিদর্শনও এ সংগ্রহশালার উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

এ প্রসঙ্গে তমলুক শহরে আর যে প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাটি উল্লেখযোগ্য, তা হল স্বর্গত হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'সতী স্মৃতি সংগ্রহশালা', যেখানে সংরক্ষিত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তু ও জীবাশ্মসহ প্রাচীন মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির মূর্তি-ফলক ও পাথরের মূর্তি প্রভৃতি। কাছাকাছি, হ্যামিল্টন উচ্চ বিদ্যালয়ের নিজস্ব সংগ্রহশালাতেও প্রাচীন মূর্তিভাস্কর্য ও মুদ্রা প্রভৃতি পুরাবস্তু ছাড়াও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত বেশ কিছু জিনিসপত্র সংরক্ষিত হয়েছে।

এসব সংগ্রহশালা ছাড়া শহরের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল দেবী বর্গভীমার পশ্চিমমুখী চারচালা জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউল। মন্দিরটির বরণ্ডের নীচে দু'একটি টেরাকোটা-ফলকের অস্তিত্ব দেখে অনুমান করা যায় যে, একসময় হয়ত গোটা দেওয়াল জুড়েই 'টেরাকোটা'-সজ্জা ছিল। প্রায় ১৩' (৪ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এক ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·) এবং মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮'৯" (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (১২·১ মি·)। মন্দিরে পূজিতা দেবী বর্গভীমার যে পাথরের মূর্তিটি দেখা যায়, সেটির যথার্থ পরিচয় আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে জনশ্রুতি যে, সেকালে ময়ূরধ্বজ নামে তমলুকের এক ভূস্বামীর বংশধর গরুড়ধ্বজ বর্গভীমা দেবীর এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তবে কিংবদন্তী যাই হোক না কেন, আকারপ্রকারে মন্দিরটি সতর শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে অনুমান।

তমলুক শহরের আর একটি পুরাকীর্তি জিষ্ণুহরির মন্দির। এ মন্দিরটি সম্পর্কে কিংবদন্তী যে, তমলুকের রাজা ময়ূরধ্বজের নির্মিত মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদ গর্ভে বিলুপ্ত হওয়ায়, প্রায় পাঁচশো বছর পূর্বে জনৈকা গোপাঙ্গনা জিষ্ণুহরির বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। এ মন্দিরটিও পশ্চিমমুখী চারচালা জগমোহন সহ শিখর-মন্দির। ইঁটের তৈরী এ মন্দিরের দেওয়ালে বরণ্ডের নীচে রামসীতা ও ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মূর্তি 'টেরাকোটা' ফলকে খোদিত দেখা যায়। জগমোহনটি দৈর্ঘপ্রস্থে ১২' ৬" (৩·৮ মি·)ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·) এবং মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০' (৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এ মন্দিরের গর্ভগৃহে পাথরের যে দুটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত হয়েছে, সেগুলি আনুমানিক খ্রীষ্টীয় এগার-বার শতকের বলেই অনুমান। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটিও স্থাপত্য বিচারে আঠার শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই মনে হয়।

তমলুকের হরির বাজারে স্থানীয় তমলুক রাজাদের প্রতিষ্ঠিত রামজীউর চারচালা জগমোহনযুক্ত দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটিও এখানকার এক দ্রষ্টব্য। ইঁটের তৈরি এ মন্দিরে কোন অলংকরণ বা প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও আকারপ্রকারে সেটি আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই ধারণা। মন্দিরটির জগমোহন, দৈর্ঘপ্রস্থে ১১'৬" (৩·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·) এবং মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' (৪·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। কাছাকাছি 'খাটপুকুর' নামে যে বিরাট জলাশয়টি দেখা যায় সেটি বেশ প্রাচীন। কিংবদন্তী যে, এটি নাকি রাজা তাম্রধ্বজের খনিত পুষ্করিণী। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই পুষ্করিণীর পাড় থেকেই একদা বেশ কিছু পুরাবস্তুর নিদর্শন সংগৃহীত হয়। আলোচ্য এই খাটপুকুরের কাছাকাছি পুবমুখী জগন্নাথের আটচালা মন্দিরটিও উল্লেখ্য। এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে বলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথের দারুমূর্তি। ত্রিখিলান এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৪' (১০·৩ মি·),প্রস্থে ২৯' (৮·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে আঠার শতকের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

শহরের পদুমবসানে তমলুক রাজবাড়ি এলাকায় চারচালা জগমোহনযুক্ত দক্ষিণমুখী জোড়া শিখর-দেউলও এখানকার এক পুরাকীর্তি। উত্তরের মন্দিরটির বিগ্রহ হল রাধামাধব এবং দক্ষিণেরটি রাধারমণ। এ মন্দির দুটির সম্মুখভাগে সামান্য পঙ্কের

অলংকরণ ছাড়া আর কোন ভাস্কর্য নেই। উভয় মন্দিরের জগমোহন দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৬" (৩·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·) এবং মূল মন্দির দুটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫'৫" (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। মন্দির দুটিতে কোন প্রতিষ্ঠানলিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে, আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

এ শহরের আর এক পুরাকীর্তি হল, চৈতন্যদেবের অন্যতম সহচর বাসুদেব ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দালান-রীতির মন্দির ও তৎসংলগ্ন ন'চূড়াবিশিষ্ট আটকোণা রাসমঞ্চ। প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব ঘোষ সম্পর্কে, যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, "চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হইলে বাসুদেব অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া তমলুকে মহাপ্রভুর মূর্তি নির্মাণ করাইয়া শোকের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করেন। কিছুদিন পরে তদীয় শিষ্য মাধব দাসের হস্তে সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া তিনি তীর্থপর্যটনে গমন করেন।"

তরুয়াঁ: খড়গপুর-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঠাকুরচক; সেখান থেকে উত্তরে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন তরুয়াঁ গ্রাম (জে· এল· নং ৬৪২)। এ গ্রামে মজুমদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোকুলরায়ের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির স্থাপত্যে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হল, প্রথাগতভাবে মন্দিরের ছাদটি বাঁকানো নয়, পরিবর্তে সেটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট এবং মূল গর্ভগৃহের চতুর্দিকেই ত্রিখিলান অলিন্দ, যা প্রদক্ষিণপথ হিসাবে ব্যবহৃত। অলিন্দগুলি টানা-খিলান করে এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজ করে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৮' ২" (৮.৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২ মি.)। মন্দিরটির পূর্ব ও দক্ষিণদিকের দেওয়ালে যে পঙ্খের অলংকরণ দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু মূলতঃকৃষ্ণলীলা। এছাড়া পুবদিকে ভিত্তিবেদীর গায়ে উৎকীর্ণ হয়েছে নানাবিধ মিথুন দৃশ্য। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ: "কুলদেবতা শ্রীশ্রীঙ গোকুলচন্দ্র রায় জীউ।" কেবলমাত্র এই লিপিটি ছাড়া মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে আকারপ্রকারে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে বলে অনুমান।

তলকুঁয়াই: কেশপুর হয়ে মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশপুর থানার অন্তর্গত তলকুঁয়াই গ্রাম (জে· এল· নং ২০০)। মাকড়া পাথরে নির্মিত কামেশ্বর শিবের এ মন্দিরটিকে সাধারণে অনেকে 'নেড়া দেউল' নামেও অভিহিত করে থাকেন। মূল মন্দিরটি পুবমুখী শিখর রীতির এবং তৎসংলগ্ন জগমোহনটি তিন ধাপযুক্ত পীঢ়া রীতির। উভয়েরই ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। মন্দিরের সামনের চত্বরে মাকড়া পাথরের বৃষ ও হাতীর প্রতিমূর্তি ছাড়াও বৃহদাকার আমলকের ভগ্নাংশও দেখা যায়। জনশ্রুতি যে, এই বৃহদাকার আমলকটি আদিতে এই মন্দিরের শীর্ষেই ছিল এবং কালক্রমে সেটি স্থানচ্যুত হওয়ায় মন্দিরটির মস্তকে কলস ও আমলকের অভাবে সেটি সাধারণ্যে নেড়া দেউল নামে আখ্যা লাভ করে। যদিও বর্তমান মন্দিরে যে আমলকটি সংযুক্ত দেখা যায়, সেটি আকারে একান্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, এটি

পরবর্তীকালে নিবদ্ধ। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২ মি·) এবং জগমোহনটি প্রায় ১৭′ (৫·১ মি·) মন্দিরে নিবদ্ধ একটি সংস্কারলিপি ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, আকার প্রকারে এটি সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

তালবান্দি: 'কৃষ্ণনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটা পথে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার অন্তর্গত তালবান্দি গ্রাম (জে· এল নং ২৪৭)। এ গ্রামে দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাদামোদরের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে যেসব পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়, সেগুলি হল, রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, বিষ্ণুর অনন্তশয্যা এবং দশাবতার প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২′১০″ (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

তালবান্দি: ডেবরা-তাবাগ্যেড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কাঁসাই পার হয়ে তাবাগ্যেড়া-পাটনা রাস্তার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন তালবান্দি গ্রাম (জে· এল· নং ২২)। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে একসারি করে যে পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায় সেগুলি মূলতঃ দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। এ মন্দিরের কার্নিস বরাবর উৎকীর্ণ এক লাইন লিপির পাঠ নিম্নরূপ: "শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজিউ ॥ সকাব্দা ১৭৮১ ॥ সন ১২৭০ সাল তাং ১৫ আসাড়। শ্রীঠাকুরদাস সিল সাং দাসপুর।" অতএব প্রতিষ্ঠালিপি থেকে দেখা যায়, লিপিটিতে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দে চার বৎসরের গরমিল রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিপিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আলোচ্য মন্দিরটির স্থপতি ঠাকুরদাস শীল ইতিপূর্বে চকবাজিত ও চমকা গ্রামের মন্দির নির্মাণেও অংশ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′১০″ (৪·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি.)।

তিলদাগঞ্জ: বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-ময়না পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জলচক; সেখানের লাগোয়া পিংলা থানার অন্তর্গত তিলদাগঞ্জ গ্রাম (জে· এল· নং ২৩৫)। এ গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরের পুবমুখী ইটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের খিলানশীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও, বাঁকানো কার্নিসের নীচে একসারি এবং দু'পাশে খাড়াভাবে দু'সারি করে যে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায় সেগুলি হল, দশাবতার, পৌরাণিক দেবদেবী ও মিথুন মূর্তি প্রভৃতি। পাশাপাশি দুটি 'টেরাকোটা'-ফলকে খোদিত প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"সুভম	সন ১২২৪
স্তু স	সাল তা
কাব্দা	রিক ৫
১৭৩৯	আষাড়।"

অতএব ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ ১″ (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০ মি·)।

অন্যদিকে তিলদাগঞ্জ গ্রামটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসাবে গণ্য হতে পারে। কারণ, তিলদাগঞ্জ গ্রামটির আশপাশে খোলামকুচিতে ভরা বেশ উঁচু ঢিবির ভূমিক্ষয়ের ফলে প্রাচীন পোড়ামাটির ও পাথরের মূর্তি এবং মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। এছাড়া স্থানে স্থানে মাটি খোঁড়ার সময় পোড়ামাটির বেড় লাগান পাতকুয়া এবং প্রশস্ত ইঁটের দেওয়ালও লক্ষ্য করা যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের সময় এখান থেকেই পাওয়া যায় গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা। এইভাবে তিলদাগঞ্জ ও আশপাশ থেকে পাওয়া বেশকিছু প্রত্নসামগ্রী এখানকার স্থানীয় বিদ্যালয় 'জলচক নাটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যালয়'-এ রক্ষিত হয়েছে। তিলদাগঞ্জে একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ দ্বারা এখানের পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হওয়া যেতে পারে।

তিলন্তপাড়া : 'তিলদাগঞ্জ' নিবন্ধে জলচক পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে দক্ষিণে হাঁটাপথে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার এলাকাধীন তিলন্তপাড়া গ্রাম (জে· এল· ২৪৮)। এ গ্রামে মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জানকীবল্লভের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের অংশ ছাড়া পুব ও পশ্চিম দেওয়ালেও পোড়ামাটির ফলকসজ্জা এবং বাকী উত্তর দেওয়ালের সমগ্র অংশ পোড়ামাটির বদলে সেখানে পঙ্খের উপর উৎকীর্ণ ভাস্কর্য-অলংকরণ দেখা যায়। মূলতঃ পঙ্খ বা পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ এসব ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু হল, রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী। স্তম্ভমূলেও ব্যবহৃত হয়েছে প্রথাগত শিকারদৃশ্যের সুদৃশ্য 'টেরাকোটা'-ফলক। মোট কথা, পোড়ামাটি ও পঙ্খ-সজ্জার উৎকর্ষে এটি যে মেদিনীপুর জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির তাতে সন্দেহ নেই। মন্দিরটির কার্নিসের নিচ বরাবর 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ:

"শ্রীশ্রীজান/কি বল্বব/যুভ মস্তু/সকাব্দা/ ১৭৩২/সন ১২/১৮ সাল।"

অতএব ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩০′ (৯·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৫′ (১৩·৭ মি·)।

মন্দিরটির অদূরে ইটের গাঁথনীতে পঙ্খ-পলস্তারা দিয়ে তৈরি বিরাটাকার এক হাতীর মূর্তির উপর নিবদ্ধ তুলসীমঞ্চটি একান্তই আকর্ষণীয়।

তেঁতুলিয়া ভূমযান : খড়্গপুর-বেলদা পিচের সড়কে চাতরীভাড়া; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন তেঁতুলিয়া ভূমযান গ্রাম (জে· এল· নং ৫৫৫)। এ গ্রামে চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন এবং পশ্চিমমুখী সিদ্ধেশ্বর শিবের আটচালা মন্দির দুটি এখানকার পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। তবে অবহেলার ফলে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ায় মন্দিরের বিগ্রহ এখন স্থানান্তরিত। অলঙ্করণহীন, এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ ৬″ (৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·) এ মন্দিরের সামনাসামনি অবস্থিত সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিরটি আটচালা রীতির হলেও সেটি শিখর-দেউলের মতই ত্রিরথ করে নির্মিত। এটিও দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ ৩″(৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·১ মি·)। দুটি

মন্দিরেই কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য নিরিখে এ মন্দির দুটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

ত্রিলোচনপুর : 'গোলগ্রাম' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে গোলগ্রাম-ত্রিলোচনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার এলাকাধীন ত্রিলোচনপুর গ্রাম (জে· এল নং ১০০)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, তাল'ন্দময়ী শীতলার দক্ষিণমুখী ইঁটের পঞ্চরত্ন মন্দির। প্রায় ৪' (১·২ মি.) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' ২" (৪·৯ মিঃ) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি.)। মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটি খ্রীস্টীয় সতের শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবীর মূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত হলেও, সেটি বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকায় বিগ্রহের কোন বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে দেবীর পাশে রক্ষিত পাথরের ক্ষুদ্রাকার মূর্তিটি যে জৈনমূর্তি, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। মন্দিরের সেবাইতদের কাছ থেকে জানা গেল যে, এ মূর্তিটি কাছাকাছি এক পুষ্করিণী খননের সময় পাওয়া গেলে জনৈক ভক্ত সেটি এখানে প্রদান করেন।

দক্ষিণ ময়নাডাল : 'গোপীমোহনপুর' নিবন্ধে কেশাপাটে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায়·৩ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন দক্ষিণ ময়নাডাল (জে· এল· নং ৫২)। এ গ্রামে স্থানীয় মধবাচার্য মঠের রাধাগোবিন্দজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও, সামান্য কিছু 'টেরাকোটা'র ফলকসজ্জাও দেখা যায়। মন্দিরটি সংস্কারের সময় সেটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটি খুলে নেওয়া হয় এবং মোট চারটি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ সে লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ :

"শ্রীপ্রাণবল্লভ/গোস্বামির সেবক/ শ্রীকৃষ্ণচরণ/দাস বৈরাগী/সেবক শ্রীবি/ক্রম দে/সন ১১৪৫ সাল/মাহ বৈশাখ।"

অতএব ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭' (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

দক্ষিণ সিমুলিয়া : কাঁথি-দীঘা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দীঘার পশ্চিমে অবস্থিত দীঘা থানার এলাকাধীন গ্রাম দক্ষিণ সিমুলিয়া (জে· এল· নং ৮৪)। এ গ্রামে স্বয়ম্ভু সুবর্ণেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০' ৬" (৩·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)। মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়ালের কোণে উদগত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

দন্দীপুর : পাঁশকুড়া-ইড়পালা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল থানার এলাকাধীন দন্দীপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৬২)। এখানে বাঙ্গাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ হয়েছে কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক পোড়ামাটির ফলক এবং সেইসঙ্গে স্তম্ভমূলে 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে ইংরেজ সাহেবদের শিকারযাত্রার দৃশ্য। মন্দিরটির

গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দুদিকে দুটি দ্বারপাল মূর্তি ছাড়াও, পশ্চিমে আরও এক প্রবেশপথের দুপাশেও অনুরূপ পোড়ামাটির দ্বারপাল মূর্তি সংস্থাপিত হয়েছে। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটি খ্রীস্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৮′ (৫·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি)।

আলোচ্য মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে একটি ন'চূড়া রাসমঞ্চও দেখা যায়। এ রাসমঞ্চটির প্রতিটি খিলানের স্তম্ভে নিবদ্ধ হয়েছে, নিরেট পোড়ামাটিতে নির্মিত লাঠিধারী দ্বারপাল ও বেহালাবাদিকার মূর্তি। পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "সন ১২৩২ বারসত্ত বোত্তিস সালো/শ্রীরামমোহন বাঙ্গাল/সন ১২৩৩ বার/সত্ত ত্রেত্রিস সাল/তারিখ ১ বৈসাখ তয়ারি।" অতএব ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে রাসমঞ্চটি নির্মিত।

এ রাসমঞ্চের লাগোয়া পশ্চিমে একটি উত্তরমুখী শিখর-দেউল দেখা যায়, যার প্রবেশপথের দুপাশে তলোয়ার হাতে পোড়ামাটির দুটি দ্বারপাল মূর্তি নিবদ্ধ। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

দলপতিপুর : 'দন্দীপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে পশ্চিমে ২ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার অন্তর্গত দলপতিপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৪৩)। গ্রামের মিদ্যাপাড়ায় মিদ্যা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানের এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ রাম-রাবণের যুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখা যায়। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দুপাশে পোড়ামাটির দুটি দ্বারপাল মূর্তিও নিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া এ মন্দিরে কাঠের দরজাদুটির পাল্লাতেও ফুলকারি নক্শার সঙ্গে দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। মন্দিরে নিবদ্ধ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬′ ৪″ (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে মিদ্যা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী শীতলানন্দ শিবের একটি শিখর-মন্দিরও দেখা যায়। সে মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী শীতলানন্দ জীউ মন্দির/শ্রীচরণ ভরসা সন ১২৭৯ সাল। মেরামত সন ১৩১২ সাল।" অতএব ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির ভেতরের দেওয়াল আটকোণা এবং এর ছাদ গম্বুজের উপর রক্ষিত।

গ্রামের মাইতি পাড়ায় সামন্ত পরিবারের দামোদরজীউর দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটিও এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত এক লাইন লিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সকাব্দা ১৭২৫/২"। সুতরাং ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ ৬″ (৪·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। মন্দিরটির বাঁকানো কার্নিসে ও সামনের দেওয়ালে দুপাশে একসারি করে যে 'টেরাকোটা' ফলক দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবী।

এছাড়া জানা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজের পুবমুখী এক পঞ্চরত্ন মন্দির এ গ্রামে দেখা যায়। এ মন্দিরটির প্রবেশপথের দুধারে দুটি পোড়ামাটির দ্বারীমূর্তি ছাড়া একসারি

করে 'টেরাকোটা'-ফলকও দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু পৌরাণিক দেবদেবী মায় মিথুন মূর্তি প্রভৃতি। এ মন্দিরে কোন উৎসর্গলিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে মন্দিরটি আঠার শতকের মধ্য ভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' ১০" (৩·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)।

দাঁতন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-ভদ্রক শাখায় দাঁতন স্টেশন অথবা খড়্গপুর-সোনাকানিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাঁতন থানার এলাকাধীন দাঁতন সদর। এখান থেকে সদরঘাট রাস্তায় ১/৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ভবানীপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৬৫) মন্দিরবাজার এলাকায় প্রায় ৫' (১·৫ মি·) উঁচু এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত শ্যামলেশ্বর শিবের পুবমুখী মাকড়া পাথরের পঞ্চরথ পীঢ়া দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মূল মন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া জগমোহনটি অর্ধগোলাকৃতি ছাদবিশিষ্ট ঢাকা এক লম্বা দালান হলেও, সেটির এবং গর্ভগৃহের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। জগমোহনের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে বিষ্ণুর অনন্তশয়ান মূর্তি এবং অন্য দেওয়ালগুলিতেও মিথুন মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। মন্দিরে প্রবেশপথের সামনে কষ্টিপাথরে নির্মিত বৃষমূর্তিটির ভাস্কর্য খুবই চিত্তাকর্ষক। মন্দিরের উত্তরপ্রান্তে ভিত্তিবেদীর গায়ে একটি বৃহৎ আকারের পাথরের মকরমুখযুক্ত জলনালী লক্ষ্য করা যায়। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১'৬" (৩·৫ মি·) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ১৫' (৪·৫ মি·)। মন্দিরটিতে কোনো উৎসর্গলিপি না থাকায় স্থাপত্যবিচারে এটি খ্রীস্টীয় ষোল শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

দাঁতন বাজারের সন্নিকটে জয়পুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৮৯) পুবমুখী জগমোহনযুক্ত জগন্নাথের একটি নবরথ শিখর-দেউলও দেখা যায়। এ মন্দিরটি মাকড়াপাথরে নির্মিত এবং মন্দিরটির গর্ভগৃহের দক্ষিণ দেওয়ালে একটিমাত্র মিথুন মূর্তি ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই। মন্দিরের জগমোহন ও গর্ভগৃহের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯' (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৫' (১৩·৭ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১৭' (৫·১ মি·), প্রস্থে ১৬' (৪·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭·৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে আঠারো শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

দাঁতনের স্থানীয় গ্রামীণ গ্রন্থাগারে এই এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু পাথরের মূর্তি প্রভৃতি পুরাবস্তু রক্ষিত আছে। কাছাকাছি 'বিদ্যাধর' নামে একটি প্রাচীন সুদীর্ঘ দিঘিও এখানকার এক উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

দামোদরপুর: খড়্গাপুর-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সাউরী; সেখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে দাঁতন থানার এলাকাধীন দামোদরপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২৬৯)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, চৌধুরী দাসমহাপাত্র পরিবারের বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর পুবমুখী চারচালা জগমোহনযুক্ত ইটের শিখর-দেউল। প্রায় ৫' (১·৫ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির জগমোহনের খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও ভিত্তিবেদীর চারপাশে কুলুঙ্গীতে নিবদ্ধ বেশ বড় আকারের 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়। এ সব ফলকগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক দেবদেবীর হলেও মিথুন ফলকও বাদ নেই। এ মন্দিরে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না

থাকলেও স্থাপত্য নিরিখে, খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·), জগমোহন দৈর্ঘ্যে ১১′১″ (৩·৩ মি·), প্রস্থে ৭′২″ (২·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)।

দাসপুর : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন সদর (জে· এল· নং ৬০)। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে সিংপাড়ায় সিংহপরিবারের গোপীনাথের পুবমুখী একরত্ন মন্দিরটি অন্যতম। এ মন্দিরের খিলানশীর্ষে যেমন রামায়ণ কাহিনীর লঙ্কাযুদ্ধের পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ হয়েছে, তেমনি স্তম্ভমূলেও শিকারযাত্রা বিষয়ক 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ দেখা যায়। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শকাব্দা ১৬৩৮ সন ১১২৩ সাল।" অতএব ১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১′ (৬·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′১০″ মি·)। মন্দিরটির ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা খিলান দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ চার দেওয়াল কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে ও ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের বন্যায় এ মন্দিরটি যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেজন্য অবিলম্বে সংস্কার প্রয়োজন। তা না হলে যেকোনো মুহূর্তে এই প্রাচীন মন্দিরটি ভেঙে পড়তে পারে।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য উত্তরে স্থানীয় দাসপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পুবদিকে একটি পশ্চিমমুখী জগমোহনসহ শিখর-মন্দির দেখা যায়। স্থানীয় পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′৫″ (২·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·), সঙ্গের জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ৫′৪″ (১·৬ মি·) প্রস্থে ৬′ (১·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১০′ (৩·১ মি·)। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

সিংপাড়ার উত্তরে পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এখানের এক দ্রষ্টব্য। প্রাচীর ঘেরা এক অঙ্গনের মধ্যে প্রায় ৭′ (২·১ মি·) উঁচু এক ভিত্তিবেদীর উপর অবস্থিত মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে 'টেরাকোটা'-ফলকে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে যা একান্তই আকর্ষণীয়। মন্দিরে নিবদ্ধ পাশাপাশি দুটি ফলকে উৎসর্গলিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী কৃষ্ণ/যুভমস্তু/সকাব্দা/১৭১৩/সন ১১/৯৮ সাল/তারিখ/২৬ আশ্বিন।" অতএব ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·) মন্দিরটিতে কাঠ-খোদাই করা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিযুক্ত একটি মনোরম দরজাও আছে।

পাল পরিবারের উল্লিখিত এ মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে চক্রবর্তী পরিবারের দধিবামনজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটির ত্রিখিলানেও নিবদ্ধ হয়েছে পোড়ামাটির ফলকে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলার দৃশ্য। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশপথের বাঁদিকে পঙ্খ পলস্তারায় উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী জিউ দোধিবামনাসন/সকাব্দা ১৭৬৮ সন১২সে৫৩ সাল/তারি ক ১৫ ফাল্গুন পরিচারক শ্রীযুত/রাসবেহারি চক্রবোর্ত্তির মোন্দির।/কৃত মিস্ত্রি শ্রীঠাকুর দাস সিল/সাংদাসপুর ॥ ইতি সমাপন।" অতএব

১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির শিল্পী-স্থপতি ঠাকুরদাস শীল ইতিপূর্বে আলোচিত চকবাজিত,চমকা ও তালবান্দি গ্রামের মন্দির নির্মাণে যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তা জানা গেছে। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১৮' (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হওয়ায় ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলেছে।

দাসপুরের পেরালপাড়ায় চক্রবর্তী পরিবারের আনন্দময়ী দক্ষিণাকালীর একটি দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির দেখা যায়। মন্দিরে পূজিত পাথরের বিগ্রহটি পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর স্থাপিত বলে জনশ্রুতি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পঙ্খের সামান্য নকাশি অলঙ্করণ দেখা যায়। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৫'৯" (৪·৮ মি·) উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

দাসপুরের পশ্চিমে হুসনাবাজার এলাকায় চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শীতলানন্দ শিবের পশ্চিমমুখী এক শিখর-দেউল দেখা যায়। মন্দিরটির ছাদ আটকোণা দেওয়ালের উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটিতে পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী সীতলানন্দ সিব ঠাকুর সুভমস্ত সকাব্দা/১৭৭১ সন ১২৫৬ সাল তারিক ১৩ ফাল্গুন শ্রীগোলক মস্তরী।" অতএব ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০' (৩·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·২ মি·)।

হুসনাবাজার এলাকায় পূর্বোক্ত শিল্পী ঠাকুরদাসের নির্মিত একটি তুলসীমঞ্চ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এটি এক উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত পঞ্চরত্ন রীতির হলেও এর চারিদিক খোলা। সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়া দক্ষিণ দেওয়ালে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীবিন্দাদেবি সকাব্দা ১৭স ৭৫ সন ১২স ৬০ সাল তারিক ২৭ য়গ্রাণ/পরিচারক শ্রী রাধামহন পরামাণিক মিস্ত্রী ঠাকুর্দাস সিল।" অতএব ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ তুলসীমঞ্চটি স্থানীয় শিল্পী ঠাকুরদাস শীলের অন্যান্য স্থাপত্যকর্মের সঙ্গে আর এক সংযোজন।

দুবরাজপুর : 'তিলদাগঞ্জ' নিবন্ধে জলচক পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার এলাকাধীন দুবরাজপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২৬২)। এ গ্রামে দাস পরিবারের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী ইটের নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগে নিবদ্ধ লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলকসজ্জা ছাড়াও মিথুন ফলকের বেশ প্রাচুর্য দেখা যায়। এ মন্দিরে ব্যবহৃত কাঠের দরজাটির পাল্লায় খোদিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ মূর্তিগুলিও বেশ আকর্ষণীয়। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২১' (৬·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৬' (১১ মি·)।

দেউলপোতা : মেছেদা-হলদিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সুতহাটা থানার এলাকাধীন দেউলপোতা গ্রাম (জে· এল· নং ৪৫)। এ গ্রামে গোপীনাথের পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি একমাত্র পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মহিষাদলের পূর্বতন ভূস্বামী উপাধ্যায় পরিবার। জমিদারী উচ্ছেদের পর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে মন্দিরটি পরিত্যক্ত এবং মন্দিরের বিগ্রহ মহিষাদলরাজের গোপাল মন্দিরে স্থানান্তরিত। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে এক সময় পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল বলে

জানা যায়। মন্দিরের খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ক্ষয়িত লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "সুভমস্তু সক/বধা ১৬৫৪/সন..../১১৫০ সাল।" অতএব ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৬'৯" (১১·২ মি·), প্রস্থে ৩০' (৯·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫·২ মি·)। মন্দিরটির ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা খিলেন দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

দেউলবাড় : মেছেদা-কাঁথি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মারিশদা; সেখান থেকে পুবে হাঁটা পথে আন্দাজ ৫ কিলোমিটার দূরত্বে কাঁথি থানার অন্তর্গত দেউলবাড় গ্রাম (জে· এল· নং ৪৩৫)। এ গ্রামে জগন্নাথের ইটের পুবমুখী জগমোহনসহ শিখর-দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এটির জগমোহন পীঢ়া রীতির হলেও গঠন-স্থাপত্যটি বেশ অভিনব। জগমোহনে প্রবেশপথের দুপাশে নিবদ্ধ পোড়ামাটির কয়েকটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ছাড়া, মন্দির ও জগমোহনের গণ্ডী অংশে চারদিকে চারটি পাথরের লম্ফমান সিংহও গ্রথিত দেখা যায়। এছাড়া জগমোহনে প্রবেশপথের দ্বারশীর্ষে কালো পাথরে ক্ষোদিত ওড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় উৎকীর্ণ যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে সেটির পাঠ 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ : "শকাব্দে রসশূন্যবাণধরণীমানে তৃতীয়াতিথৌ।/বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে যুগাদৌ সিতে ॥/শ্রীযুক্তায় গদাধরায় গুরবে তদ্দেবতানাং মুদে।/দত্তং গ্রামবরোচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউলবাড়াখ্যকম ॥" অতএব এ শিলালিপি থেকে জানা যায়, মন্দিরটি ১৫০৬ শকাব্দায় (অর্থাৎ ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে) বৈশাখ মাসের ১৭ তারিখে বুধবার শুক্লপক্ষের যুগাদ্যাদিনে শ্রীযুক্ত গদাধর নামক গুরুর হস্তে ঐ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সমর্পণ করা হয় এবং তাঁদের প্রীতিকামনায় উক্ত গুরুকে দেউলবাড় নামক গ্রামটিও দান করা হয়।

বর্ণিত এ লিপিটি ছাড়াও মন্দিরের জগমোহন ও গর্ভগৃহের সংযোগপথের উপরে ও গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উপরে অনুরূপ ওড়িয়া অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় পাথরে ক্ষোদিত আরও যে দুটি লিপিফলক আছে, সেগুলিরও পাঠোদ্ধার করে 'মেদিনীপুরের ইতিহাসে' উল্লেখ করা হয়েছে যে," ... কাশীদাসের কুলে পদ্মনাভ দাসের পুত্র বিভীষণ দাস নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া সেইস্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় লিপিটিতে আছে যে, শ্রীযুক্ত অর্জুন মিশ্র নামক আচার্য-চূড়ামণির পৌত্র ভগবান নামক কোন ব্যক্তির পুত্র শ্রীধরণীসুত নামক এক ব্যক্তি এবং উক্ত আচার্য-চূড়ামণির চক্রধর নামক এক পুত্র ইঁহারা উভয়েই উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাবিধি যথানিয়মে সম্পন্ন করিয়া পরলোকগমন করেন।" লিপিতে বর্ণিত বিভীষণ দাস সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা যোগেশচন্দ্র বসু আলোকপাত করে লিখেছেন যে, 'রসিকমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থে সেকালের হিজলী মণ্ডলের যে বিভীষণ মহাপাত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে তিনি এবং এই শিলালিপিতে বর্ণিত বিভীষণ দাস সম্ভবত একই ব্যক্তি। দুঃখের কথা, জগন্নাথের মন্দির বলে কথিত হলেও, মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথ বলরাম বা সুভদ্রার কোনো মূর্তি প্রতিষ্ঠিত নেই। পরিত্যক্ত এ মন্দিরটি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংস্কৃত হয়েছে।

খ্রীস্টীয় ষোল শতকের শেষদিকে নির্মিত এ মন্দিরটি ও জগমোহনের ভিতরের ছাদ

প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী লহরা পদ্ধতিতে গঠিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪'৩" (৭.৩ মি.) ও উচ্চতায় আনুমানিক ৪০' (১২.১ মি.) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬'৯" (৫.১ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০.৬ মি.)।

আলোচ্য এ গ্রামের পার্শ্ববর্তী বাহিরী গ্রামটিও নানাবিধ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ। সে গ্রামের মধ্যে 'পালটিকরী', 'শাপটিকরী', 'ধনটিকরী' ও 'গোধনটিকরী' নামে মাটির যে সুউচ্চ ঢিবিগুলি আছে, সম্ভবতঃ সেগুলি হয়ত কোনো প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ। কয়েক বৎসর আগে, কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে, গুপ্ত-পাল-সেন আমলের বেশ কিছু পুরাবস্তু এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

দেউলবাড় : 'গোপীবল্লভপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে গোপীবল্লভপুর – নয়াগ্রাম পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ধনকামরা থেকে পুবে হাঁটাপথে প্রায় ১২ কিলোমিটার, অথবা মেদিনীপুর – রোহিণী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) রোহিণী থেকে সুবর্ণরেখা পার হয়ে দক্ষিণপশ্চিমে ৫ কিলোমিটার, দূরত্বে নয়াগ্রাম থানার এলাকাধীন দেউলবাড় গ্রাম (জে. এল. নং ৮)। এখানে পুবমুখী রামেশ্বরনাথের মন্দিরটি ওড়িশী শৈলীর মাকড়া পাথরের সপ্তরথ পীঢ়া জগমোহন ও নাটমন্দিরযুক্ত সপ্তরথ শিখর-দেউল। এক উঁচু টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩.৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫.২ মি.) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' (৫.৪ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২.১ মি.)। মন্দিরটির সংলগ্ন টিলার নীচে এক বৃহৎ পুষ্করিণীর নাম কুণ্ডপুকুর। জনশ্রুতি যে, চন্দ্ররেখাগড়ের ভূস্বামী রাজা চন্দ্রকেতু খ্রীষ্টীয় ষোল শতকে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই তবে আকারপ্রকারে এ মন্দিরটি খ্রীস্টীয় ষোল শতকে নির্মিত বলেই অনুমান।

দেউলবাড় গ্রামের প্রায় ৩ কিলোমিটার দক্ষিণে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে তপোবন নামে কথিত স্থানটির সৌন্দর্য খুবই মনোরম। একসময়ে এখানে যে একটি মাকড়া পাথরের মন্দির ছিল, সেটির ভগ্নাবশেষ দেখে অনুমান করা যায়। কাছাকাছি 'সীতা' নামে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়ায় জনশ্রুতি যে, এখানেই নাকি একদা মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ছিল।

দেউলী : 'ক্ষেত্রহাট' নিবন্ধে দেউলিয়া পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে সামান্য দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন মিহিটিকুরি মৌজাভুক্ত (জে. এল. নং ৩০০)। এই গ্রামে সিদ্ধেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী চারচালা মন্দিরটি অবস্থিত। প্রায় ৫' (১.৫ মি.) উঁচু এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭'২" (৫.২ মি.), প্রস্থে ১৫'১০" (৪.৮ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬ মি.)। জনশ্রুতি যে, মন্দিরটি আদিতে ছিল আটচালা রীতির, কিন্তু মন্দিরের উপর ঝড়ে এক প্রকাণ্ড গাছ ভেঙে পড়ার কারণে গ্রামবাসীরা উপরের চারচালা অংশটি বাদ দেওয়ায় বর্তমানে এই রূপান্তর ঘটেছে। একদা মন্দিরটির বহিরঙ্গ সজ্জায় পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলক ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কারের সময় সেগুলির অধিকাংশ বিনষ্ট করে দেওয়া হলেও, এখনও কিছু কিছু 'টেরাকোটা'-ফলকের অংশ দেখা যায়। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপির পাঠ নিম্নরূপ :

"শুভমস্তু শকাব্দা/১৬৪২ মঠদত্ত/শ্রীসুকদেব ঘোষ/গঠিতং শ্রীছকু পাল/সাং মধুসূদনপুর।"

অতএব ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় এই যে, এই মন্দিরের আশপাশে অসংখ্য বিভিন্ন মাপের ইটের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্বে এখান থেকে একটি কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি ও পাওয়া যায় এবং এখনও পাথর খোদাই দু'একটি মূর্তিরও ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এইসব পাথরের মূর্তি ও ইটের ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে এখানে হয়তো কোনো এক প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেজন্য এ গ্রামের নামকরণ হয়েছে দেউলী। অবশ্য সে অনুমানের সমর্থনের জন্য পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

দেউলী : খড়গপুর – বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেলদা ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ১$^{১}/_{২}$ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন দেউলী গ্রাম (জে· এল· নং ৩১২)। এ গ্রামে যোগী দেউল নামে খ্যাত মাকড়া পাথরের একটি ত্রিরথ পীড়া-দেউল এখানকার এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও, এটির স্থাপত্যরীতি বিচারে মন্দিরটি খ্রীস্টীয় ষোল শতকে নির্মিত বলেই মনে হয়। এছাড়া, এ গ্রামে চম্পকেশ্বর শিব মন্দিরটি আধুনিককালে নির্মিত হলেও সেটির সন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে যেসব ভগ্ন পাথরের মূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়, সেগুলি বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। এখানে যেসব মূর্তিভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায়. তার মধ্যে প্রায় ১$^{১}/_{২}$' (০·৪৫ সে· মি·) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কষ্টিপাথরের একটি বৃষ মূর্তি, বার-তের শতকে নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তির মস্তক এবং আরও দুটি মূর্তির নিম্নাংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেভোগ : মেছেদা - হলদিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বাসুদেবপুর থেকে পশ্চিমে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে সুতাহাটা থানার এলাকাধীন দেভোগ গ্রাম (জে· এল· নং ১৪৯)। এ গ্রামের পূর্বপল্লীতে অবস্থিত কার্তিক রায় ও রাধাবল্লভের পুবমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, একদা দোরো পরগণার ভূস্বামী রাজা যাদব রায়চৌধুরী কর্তৃক এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। বিগত ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্পে এ মন্দিরের সব চূড়াগুলি ভেঙে পড়ে। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির সামান্য অলঙ্করণ ছাড়া, এ মন্দিরে মার্বেল ফলকে উৎকীর্ণ সংস্কারলিপিটি বেশ অভিনব। ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত সে লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী রাধাবল্লভজীউ ও/শ্রীশ্রী কার্তিক রায় ঠাকুর/কর্ণসম দানবীর রাজা যাদবরাম।/তার পুত্রবধু সনকারানী নাম ॥/শেষভাগে বারশত বঙ্গ শতাব্দির।/নিরমিয়া নবরত্ন বিখ্যাত মন্দির ॥/শ্রীরাধাবল্লভ কার্তিকরায় যুগলবিগ্রহে।/প্রতিষ্ঠিলা রাধবধু বিপুল আগ্রহে ॥/কালক্রমে ভূমিকম্পে ভগ্নজীর্ণ হয়ে।/গিয়াছে বরষ কত পতিত হইয়ে ॥/মিত্র বংশ অবতংস শ্রীপতি রমাপতি।/লুপ্তকীর্ত্তি উদ্ধারিতে হয়ে এক মতি ॥/আদেশিলা মাইতি শ্যামে করিতে সংস্কার।/গোস্বামী জয়কৃষ্ণ লয়ে কর্মভার ॥/তেরশ তেত্রিশ সাল বঙ্গ গণনায়।/করিল সংস্কার শেষ দেবের কৃপায় ॥"

অতএব প্রায় ৪০' (১২·২ মি)· উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটির এই সংস্কারলিপি ও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য থেকে বেশ বোঝা যায়, মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়েছিল।

দেরিয়াপুর : গড়বেতা– আমলাশোলী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) আমলাশোলী ; সেখান থেকে উত্তরে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার এলাকাধীন দেরিয়াপুর গ্রাম (জে· এল· নং· ২১৭)। এ গ্রামে নন্দী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দধিবামনজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। একসময়ে এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে বেশ কিছু 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে সংস্কারের সময় সেসব পোড়ামাটির ফলকগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের কাছ থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১২৮০ বঙ্গাব্দে নির্মিত। সুতরাং সে হিসাবে এবং স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

এ গ্রামের উত্তর প্রান্তে বেরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটির স্থপতি শঙ্করদাস মিস্ত্রী যে বিষ্ণুপুর থেকে এসেছিলেন, তা প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় এবং সে প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীনারায়ণ বিষ্ণুবেস্মগৃহং প্রতিষ্ঠিতং/দুলাল বেরা দাসস্য পুত্র শ্রীবংশীধর/দাস কৃতং দিগবসু শত বেদ শকে/কুম্ভে স্থিতে রবৌ পঞ্চদশ দিবসে/সম্পূর্ণা, শ্রীশঙ্কর দাস মিস্ত্রী কৃতং/বিরচিতং সাং বিষ্ণুপুর শকাব্দা ১৮০৪/শিলালিপি সংস্কার ১৩৭৪ সাল উদ্যোক্তা শ্রীভূতনাথ বেরা"।

অতএব ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটির অলঙ্করণ-সজ্জায় যে টেরাকোটা'-ফলক ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিরেস মানের হলেও তবলাবাদিকা ও কেশপ্রসাধনরতার মূর্তিগুলি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২′ (৩·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

দেহাটি : 'কাঁটাবনি' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে : সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ১১/২ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন দেহাটি গ্রাম (জে· এল· নং ৭২)। এ গ্রামে মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোপীমোহনের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক দ্রষ্টব্য। মন্দিরটিতে পোড়ামাটির তেমন কোন অলঙ্করণ না থাকলেও, এটিতে নিবদ্ধ কাঠের দরজাটির দুটি পাল্লায় উৎকীর্ণ নকাশি অলঙ্করণ বেশ আকর্ষণীয়। এছাড়া এ মন্দিরে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি দেখা যায়, সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীগুরূপদে মতি শ্রীমন্দির কিত্তি শ্রীঅভয় চরণ দাস মাইতি কিতকর্ম্ম বেক্তী শ্রী গিরি/ধর মিস্ত্রী জাহানাবাদ পরগণার সাং ঘোসপুর তেমর সকাব্দা ১৭৭০ বাংলা সন/১২৫৫ সাল সমাপনায়তি।"

অতএব ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪· মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ মন্দিরের কাছেই গোপীমোহনের আটকোণা রাসমঞ্চটিতে উৎকীর্ণ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, সেটিরও স্থপতি ছিলেন পূর্বোক্ত মন্দিরের কারিগর গিরিধর মিস্ত্রী। রাসমঞ্চে খোদিত ঐ লিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সকাব্দ/১৭৭০/শ্রীযুক্ত অভয়চরণ মাইতি/কৃতকর্ম্ম কত্রিক শ্রীগিরিধর মিস্ত্রী।"

ধামতোড় : পাঁশকুড়া– ডেবরা ৬ নং জাতীয় সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার এলকাধীন ধামতোড় গ্রাম (জে· এল· নং ২০১)। এ গ্রামে বিল্লেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। স্থাপত্যের দিক থেকে মন্দিরটি খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও, এখানকার অধিষ্ঠাতা বিগ্রহ রোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে এ

অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ। প্রায় ৫′ (১·৫ মি·) উঁচু এক ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে তেমন কোনো ভাস্কর্য-অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায় না বটে, তবে মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির বাঁদিকে 'সূর্যস্তম্ভ' নামে পরিচিত একটি মাকড়া পাথরের মূর্তির নিম্নাংশ একান্তই কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

মূর্তির এ অংশটি দেখে মনে হয়, এ ধরনের আরো পাঁচটি অংশ জোড়া দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। গ্রামের বয়োবৃদ্ধদের মতে এটি কাছাকাছি এক পুকুর খোঁড়ার সময় পাওয়া যায়। মূর্তির ভাস্কর্যশৈলী দেখে মূর্তিটি বেশ প্রাচীন বলেই অনুমান করা যায়।

স্থানীয় ভূঁইয়া পরিবারের শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী সপ্তরথ শিখর-দেউলটি পুরাকীর্তির পর্যায়ে না পড়লেও ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সে মন্দিরটির স্থপতি যে দাসপুরের শশীভূষণ শীল তা ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

ধালুয়া : মেছেদা-কাঁথি পিচের সড়কে হেড়িয়া; সেখান থেকে পশ্চিমে হেড়িয়া-মাধাখালি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস ও রিক্সা চলে) প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে ভগবানপুর থানার এলকাধীন ধালুয়া গ্রাম (জে· এল· নং ২৪৩)। এ গ্রামে পুবমুখী রাধাগোবিন্দের নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহ প্রস্তর মূর্তি হলেও, কাঠের এক গৌরাঙ্গ মূর্তিও সেইসঙ্গে দেখা যায়। পঙ্খসজ্জা ছাড়া মন্দিরটিতে যে সামান্য 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ রয়েছে তার বিষয়বস্তু, কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ। মন্দিরটিতে যে সংস্কারলিপি উৎকীর্ণ হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮৯১-১৯০১ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত। তবে মন্দিরটির গঠনস্থাপত্য দেখে অনুমান করা যায় যে সেটি আঠার শতকে নির্মিত হয়েছিল। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ৩১′ ৬″ (৯·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের দক্ষিণে পুবমুখী একটি আটচালা কালীমন্দির দেখা যায়। ত্রিখিলান সে মন্দিরটিতে কোনো অলঙ্করণ নেই এবং স্থাপত্যবিচারে সেটিও আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)।

নতুক জয়কৃষ্ণপুর : 'ঈশ্বরপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে সোজা পশ্চিমে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন নতুক জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৮৫)। এ গ্রামের উত্তরপাড়ায় সাঁতরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর পুবমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সম্মুখভাগে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর তেমন কোনো সজ্জা নেই। তবে মন্দিরে ব্যবহৃত দরজাটি বেশ অলঙ্কৃত। সেটিতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ কাঠ-খোদাই মূর্তি নিবদ্ধ দেখা যায়। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে সেটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৭′ (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (১০ মি·)।

এ মন্দিরের একেবারের লাগোয়া দক্ষিণমুখী মৃত্যুঞ্জয় শিবের বারোচালা মন্দিরটি একান্তই অভিনব। অবশ্য এই রীতির মন্দির সম্পর্কে ইতিপূর্বে জলসরা, চিরুলিয়া প্রভৃতি নিবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য এ মন্দিরটি চালা রীতির হলেও

এটি শিখর-দেউলের মতই ত্রিরথ বিন্যাসযুক্ত। একদুয়ারী এ মন্দিরের প্রবেশপথের দুপাশে দুটি পোড়ামাটির দ্বারপালের মূর্তি ছাড়া তেমন কোনো অলঙ্করণ নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে মনে হয়।

এ গ্রামে পূর্বোক্ত রীতির আরোও এক মন্দির হলো, সাঁতরা পরিবারের পুবমুখী এক শিব মন্দির। এটিও ত্রিরথ বিন্যাসযুক্ত বারোচালা মন্দির এবং এটিরও প্রবেশপথের দুপাশে 'টেরাকোটা'-দ্বারীমূর্তি নিবদ্ধ হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

গ্রামের মাঝ পাড়ায় সাঁতরা পরিবারের শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী দোতলা দালান-মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এটিতে তেমন কোনো ভাস্কর্য-অলঙ্করণ না থাকলেও, এ মন্দিরের নিচের তলায় নিবদ্ধ কাঠের কপাটটিতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বেশ সুন্দর কাঠ-খোদাইয়ের কাজ দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭' (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

নন্দনপুর : 'জয়কৃষ্ণপুর' (দাসপুর) নিবন্ধে তেমোহানী পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে তেমোহানী-জয়কৃষ্ণপুর মোরাম রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন নন্দনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৯৬)। এ গ্রামে ঘোষ পরিবারের দামোদরজীউর পুবমুখী দোতলা দালান-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে সামান্য পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ থাকলেও, এটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপি আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "৭ শ্রীশ্রী দামুদর জীউ/শ্রীরূপচরণ ঘোষ শ্রীরাম/চরণ মিস্ত্রী সাং গোবিন্দনগর/সকাব্দা সন ১২৫১ সালের/মাহ অঘ্রাণ সুরু…সন/১২৫৭ সালের মাহ শ্রাবণ সমাপ্ত ইতি।"

অতএব ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি নির্মাণে যে ছয় বৎসর সময় লেগেছে তা জানা গেল। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১' (৬·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·) কাছাকাছি এ বিগ্রহের যে আটকোণা রাসমঞ্চটি দেখা যায় সেটিতে উৎকীর্ণ পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ তেমন উন্নতমানের নয়।

নন্দীগ্রাম : 'মহিষাদল' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে মহিষাদল-নন্দীগ্রাম পিচের সড়কে (তেরপেখিয়ায় হলদী নদী পার হয়ে বাস বদল করে) নন্দীগ্রাম থানার সদর (জে· এল· নং ১৮০)। এখানে মহিষাদলের রানী জানকী দেবীর প্রতিষ্ঠিত জানকীনাথের আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহ অষ্টধাতুর রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীর। প্রায় ৪০' (১২·১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, স্থানীয়ভাবে জানা যায় যে, এটি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

নবগ্রাম : ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল থানার অন্তর্গত রাধানগর মৌজাভুক্ত নবগ্রাম (জে· এল· নং ৭৮)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলো, রায়পাড়ায় রায় পরিবারের গোপাল ও সিংহবাহিনীর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪' (৭·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·১ মি·)। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলকটির পাঠ নিম্নরূপ : "শকাব্দা ১৬৩১ শো/লষত ত্রেশ যেষ/শ্রীগোপালস্য।"

অতএব ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির খিলানশীর্ষে যে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়, উৎকর্ষতায় সেগুলিকে মেদিনীপুর জেলার এক সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির বলা যেতে পারে। প্রবেশপথের উপরে লঙ্কাযুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য খোদাই পোড়ামাটির ফলকগুলি একান্ত মনোরম। এছাড়া স্তম্ভমূলেও উৎকীর্ণ হয়েছে শিকারযাত্রা ও সন্ন্যাসীদের মিছিল। এ মন্দিরের অলঙ্করণসজ্জার আর এক বিশেষত্ব হল, পোড়ামাটির ফলকের সঙ্গে সবুজ রঙের পাথরে উৎকীর্ণ অনুরূপ ভাস্কর্যযুক্ত ফলকের ব্যবহার, যা এ মন্দিরের শিল্পী-স্থপতির কারিগরী মুন্সীয়ানার প্রমাণ দেয়। মন্দিরটি বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রমশই জীর্ণ হয়ে পড়ছে ; সুতরাং অবিলম্বে এই প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

নাড়াজোল : 'কিসমৎ নাড়াজোল' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন নিজ নাড়াজোল মৌজাভুক্ত নাড়াজোল গ্রাম (জে· এল· নং ১৭)। এখানে যেসব পুরাকীর্তির নিদর্শন দেখা যায়, তার মধ্যে নাড়াজোল রাজবাড়ির রাস্তায় রথতলার কাছে নাড়াজোল-রাজ কর্তৃক নির্মিত বৃহৎ পঁচিশচূড়া রাসমঞ্চটি স্থাপত্যের দিক থেকে বেশ অভিনব। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ রাসমঞ্চটি উনিশ শতকে নির্মিত বলেই অনুমান। ঠিক এই রাসমঞ্চের পশ্চিমে পুবমুখী মোট ছটি আটচালা একদুয়ারী শিব-মন্দিরও দেখা যায় যা পূর্বোক্ত রাসমঞ্চের সমসাময়িক। তবে এই মন্দিরগুলির সামান্য উত্তরে চারিদিক খোলা পঞ্চরত্নরীতির তুলসীমঞ্চটিতে একসময়ে বেশ পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত হওয়ায় সেসব 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ-ফলকগুলির অধিকাংশই আজ বিনষ্ট।

রাজবাড়ির অভ্যন্তরে পশ্চিমমুখী মৃত্যুঞ্জয় শিবের আটচালা মন্দিরটিতে যে 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ দেখা যায়, সেগুলির কারিগরী খুবই নিরেস। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় সেটি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

রাজবাড়ির বৃহৎ দুর্গা দালানটিতেও একসারি দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়। আলোচ্য দুর্গা মন্দিরের দক্ষিণে এক ঘেরা চত্বরে পুবমুখী গোবিন্দজীউর নবরত্ন ও দক্ষিণমুখী রঘুনাথজীউর চুনার পাথরে নির্মিত দালান-মন্দির দুটিও এখানকার এক পুরাকীর্তি।

এ রাজবাড়ির অন্দরমহলে জয়দুর্গার দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যে মন্দিরটি ২২' (৬·৭ মি·), প্রস্থে ১৯' ৬" (৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

নারায়ণগড় : 'কসবা-নারায়ণগড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে ১ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন হাঁদলা মৌজাভুক্ত (জে· এল নং ২৭২) নারায়ণগড়। এখানকার হাঁদলা-গড় রাজবাড়ির ভিতর মহলে ব্রজনাগরের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। বহুবার সংস্কারের ফলে এর পূর্বতন সৌকর্য বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকার-প্রকারে আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমান।

হাঁদলার মধ্যপাড়ায় স্থানীয় লাহা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী রসবিলাসেশ্বর শিবের

এক শিখর-দেউল দেখা যায়। অলঙ্করণহীন এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′ ৬″ (২· ৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)।

নারায়ণগড়ে ব্রহ্মাণীদেবীর এক প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরটি তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এ দেবী সম্পর্কে মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছেন, "নারায়ণগড় রাজবংশের আদিপুরুষ গন্ধর্ব পাল ব্রহ্মাণী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। একসময়ে এ প্রদেশে এই দেবীর অসীম প্রভাব ছিল। জগন্নাথ যাত্রীকে ইহার চরণে প্রণামীর টাকা প্রদানপূর্বক ব্রহ্মাণীর ছাপ (মুদ্রা বিশেষ) গ্রহণ করিয়া তবে পুরী প্রবিষ্ট হইতে হইত।"

নিমতলা : 'ঘাটাল' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে প্রায় ১$^{১}/_{২}$ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন রাণাপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ২০২) নিমতলা গ্রাম। প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে শিলাবতী নদী তীরবর্তী এ গ্রাম যে রেশমশিল্পের এক বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল, তারই নিদর্শনস্বরূপ স্থানীয় শুঁই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রেশমকুঠির সুউচ্চ ইঁটের তৈরি চিমনি আজও এখানে দেখা যায়। এছাড়া, এ গ্রামে হেমন্তনাথ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, বরদার ভূস্বামী শোভাসিংহের ভাই হেম্মত সিংহ নাকি এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়াল জুড়ে যে সব পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায় তার বিষয়বস্তু হলো লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০ মি·)। কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে এটি আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

নুনিয়া : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের গিধনী স্টেশন থেকে উত্তরে পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে জামবনী থানার অন্তর্গত নুনিয়া গ্রাম (জে· এল· নং ১০৮)। এ গ্রামে পানি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী মাকড়া পাথরের একটি ত্রিরথ পীঢ়া-দেউল এখানকার এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির গাঁথনিতে ব্যবহৃত পাথরের অংশগুলিকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য যে লোহার হুক প্রযুক্ত হয়েছিল তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মন্দিরটির ছাদ লহরা করে নির্মিত। এটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, স্থাপত্য নিরিখে বেশ বোঝা যায় যে, এটি আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। দুঃখের কথা, বর্তমানে মন্দিরটি সংস্কার করে সেটির পুরাতন গঠনরীতি পরিবর্তন করে এক অদ্ভুত রূপ দেওয়া হয়েছে।

নুনিয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পিচের সড়কের ধারে এক মাঠে শিখর-দেউলের আকারে বেশ কিছু ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভ দেখা যায়। এরূপ কোন কোন নিবেদন-মন্দিরের চারদিকে জৈন-তীর্থঙ্করের মূর্তি খোদিত থাকায় মনে হয় একদা এখানে হয়ত জৈন ধর্মাবলম্বীদের কোন কেন্দ্র ছিল। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

নৈপুর : মেছেদা—এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পটাশপুর : সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে পটাশপুর থানার এলাকাধীন নৈপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১১)। এখানে মদনমোহনের চারচালারীতির জগমোহনসহ সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। কিংবদন্তী যে, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের আদিপুরুষ বীরসিংহ রায়মল্লের বংশধরেরা কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে

খ্রীস্টীয় ষোল শতকে নৈপুর গ্রামে বসতি করেন এবং সতের শতকে এই বংশের চতুর্ভুজদেব বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে মদনমোহনদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপূর্বক এই মন্দির নির্মাণ শুরু করেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এ মন্দিরের কাজ শেষ না হওয়ায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র সীতরামদেব সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করেন। সেজন্য প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের বক্তব্য অনুযায়ী এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ হলেও এ বিষয়ে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৫′ ৩″ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·) এবং জগমোহন দৈর্ঘ্যে ১৩′ ৬″ (৪·১ মি·), প্রস্থে ৯′ ৬″ (২·৯ মি·) ও উচ্চতায় ১৬′ (৪·৯ মি·)।

পাঁচেট : মেছেদা—এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) নিমজা ; সেখান থেকে পুবে ২ কিলোমিটার দূরত্বে পটাশপুর থানার এলাকাধীন পাঁচেট গ্রাম (জে· এল নং ১০৪)। এখানকার ভূস্বামী দাসমহাপাত্র পরিবারের গড়বাড়ি পাঁচেটগড়ে কিশোররায়ের পুবমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের জগমোহনটি পীঢ়া রীতির হলেও, সেটির কার্নিস প্রথাগতভাবে সমান্তরাল না হয়ে বাঁকানো করে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

কাছাকাছি এক ঘেরা চত্বরের মধ্যস্থলে পশ্চিমমুখী পঞ্চেশ্বর শিবের শিখর-মন্দির ছাড়া সেটির চার কোণে অবস্থিত যে চারটি মন্দির দেখা যায়সেগুলিওশিখর রীতির। এ ছাড়া এ মন্দির চত্বরে প্রায় ৪′ (১·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সেটি এই থানার এলাকাধীন গোকুলপুর গ্রামে এক পুষ্করিণী খননের সময় পাওয়া যায়।

গড়বাড়ির বাইরে শীতলার পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১৯′ (৫·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)।

পলশপাই : 'আজুড়িয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে ১ কিলোমিটার পুবে কাঁচা রাস্তায় দাসপুর থানার অন্তর্গত পলশপাই গ্রাম (জে· এল· নং ৫৬)। এ গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির বরণ্ডের কাছ বরাবর চার দেওয়ালেই একসারি করে 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ রয়েছে। এসব পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে, রাম, সীতা, রাবণ, জটায়ু, কার্তিক, গণেশ, মহিষমর্দিনী ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্তি। মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি দেখা যায় তার পাঠ নিম্নরূপ : "৭ শ্রীশ্রী শ্রীধর জিউ/সকাব্দা ১৭৫৬ সন ১২৪১ সাল/শ্রীগোবিন্দরাম মাইতি।" অতএব ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একদুয়ারী এ মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·) এবং মন্দিরটির ছাদ কাঠের কড়ি-বরগা দিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত।

কাছাকাছি শ্রীধরজীউর নবরত্ন রাসমঞ্চটিতেও বেশ কিছু 'টেরাকোটা'য় উৎকীর্ণ বাদিকামূর্তি দেখা যায়। এ ছাড়া এটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী সিধর জিউ/সকাব্দা ১৭৫৮/সন ১২৪৩ সাল"।

অতএব পূর্বোক্ত মন্দিরের দু বছর পরে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই রাসমঞ্চটি নির্মিত হয়েছে।

কুলঙ্গীতে যথাক্রমে পঙ্খের তৈরি বাতায়নবর্তিনী, নৃসিংহ ও দম্পতির মূর্তি নিবদ্ধ হয়েছে। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৫′ ২″ (১০·৭ মি·), প্রস্থে ২৫′ (৭·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের কাছাকাছি পুবমুখী মদনমোহনের দালান রীতির মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরটিতে পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়াও প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ একটি গরুড় মূর্তি বেশ দর্শনীয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৯′ ৭″ (১২ মি·) প্রস্থে ২৪′ ৩″ (৭·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩ (১০·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

পূর্বোক্ত এ দুটি মন্দিরের সামান্য পুবে মহাপাত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী ষড়ভুজ গৌরাঙ্গের মন্দিরটি দালান রীতির এবং এ মন্দিরের খিলানশীর্ষে পঙ্খ ও 'টেরাকোটা'র কাজ একই সঙ্গে দেখা যায়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটি দারু নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪২′ ৯″ (১৩ মি·), প্রস্থে ২৭′ ৩″ (৮.৩মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠাফলকের অভাবে, স্থাপত্য নিরিখে, এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

পাটতেঁতুল : 'দেরিয়াপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে হাঁটাপথে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার অন্তর্গত পাটতেঁতুল গ্রাম (জে· এল· নং ১৯৮)। এ গ্রামে দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাদামোদরের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের ত্রিখিলানের উপরিভাগে পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর কোনো ভাস্কর্য নেই। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। মন্দিরটিতে কোনো উৎসর্গলিপি নেই বটে, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

পাথরকাটি : ঝাড়গ্রাম - শাঁকরাইল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বখড়াচক থেকে পুবে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে শাঁকরাইল থানার এলাকাধীন পাথরকাটি গ্রাম (জে· এল· নং ১৩৪)। এ গ্রামটিকে কেউ কেউ পিতলকাটিও বলে থাকেন। এ গ্রামে লৌকিক দেবী জয়চণ্ডীর পাথরের দালান-রীতির মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরের বিগ্রহ পাথরের তৈরি জয়চণ্ডী মূর্তি হাতির উপর উপবিষ্ট এবং দেবীর কাছে মানত হিসাবে পোড়ামাটির অসংখ্য হাতিঘোড়া প্রদত্ত হয়েছে দেখা যায়। কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

পাথরঘাটা : 'টেপরপাড়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে পটাশপুর থানার বুলাকিপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৩৫) পাথরঘাটা নামক স্থানটি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল হিসাবে গণ্য হতে পারে। কেলেঘাই নদীর প্রাচীন প্রবাহপথের ধারে অবস্থিত এ স্থানটিতে এক সুউচ্চ ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত কঙ্কেশ্বর মহাদেবের পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি আধুনিককালের হলেও, ঢিবির উপর প্রায় ১০০′ (৩০·৪ মি·) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ইটের যে দেওয়ালটি দেখা যায় তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। এইসঙ্গে এই ঢিবির পুবদিক বরাবর বাঁধানো এক প্রাচীন ঘাটও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ঢিবির উপর ইতস্তত ছড়িয়ে

থাকা ১১′ ৬″ (৩· ৫ মি·) লম্বা ও ২′ ৪″ (০·৭২ সে· মি·) চওড়া পাঁচটি কালো পাথরের স্তম্ভ বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করে। স্তম্ভগুলির নীচের দিক ত্রিরথ ও উপরের দিক আটকোণা খাঁজবিশিষ্ট। উপরের স্তম্ভগাত্রের চারদিকে বা-রিলিফ খোদাই দুটি পদ্মকোরকের মধ্যে ঝুলন্ত এক ঘণ্টার প্রতিকৃতি। ভাস্কর্যশৈলী বিচারে এসব পুরাকীর্তিগুলি খ্রীস্টীয় এগারো-বারো শতকের প্রাচীন বলেই মনে হয় এবং এই ঢিবিতে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ, স্নানের ঘাট ও পাথরের থামগুলি দেখে মনে হয়, অতীতে এখানে হয়তো কোনো প্রাচীন মঠ-মন্দির গড়ে উঠেছিল।

পাথরবেড়িয়া : গড়বেতা – হুমগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) হুমগড় ; সেখান থেকে উত্তর-পুবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার এলাকাধীন গ্রাম পাথরবেড়িয়া (জে· এল· নং ২৭৫)। এখানে দক্ষিণমুখী রামসীতার মাকড়া পাথরের আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, দ্রাবিড় থেকে আগত জনৈক সাধক বাগবীজ গোস্বামীই নাকি এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে এটি সতের শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়।

পাথরা : মেদিনীপুর শহর থেকে পুবে পুরাতন উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড্ ধরে হাঁটা পথে (রিক্সা চলে) প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে হাতীহোল্কা গ্রাম ; সেখান থেকে উত্তর-পুবে কাঁচা রাস্তায় আরও ২ কিলোমিটার দূরত্বে কাঁসাই তীরবর্তী মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন পাথরা গ্রাম (জে· এল· নং ২৪৮)। সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি লোকেশ্বর-বিষ্ণুর মূর্তি প্রাপ্তি থেকে এ গ্রামটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আলোচ্য মূর্তিটি বর্তমানে ক'লকাতার আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হয়েছে এবং মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষের মতে সেটি খ্রীস্টীয় নয় শতকের শেষ দিকে নির্মিত।

পাথরা গ্রামে একসময়ে নীল ও রেশম-শিল্পের দৌলতে ধনবান ব্যক্তিদের নির্মিত বেশ কিছু মন্দির-দেবালয় নির্মিত হয়েছিল এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেসব মন্দিরের বহুলাংশ আজ ভগ্ন ও লুপ্তপ্রায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও যেসব মন্দির-দেবালয় কোনোমতে টিকে আছে সেগুলির মধ্যে গ্রামের পুবপ্রান্তে শীতলার দক্ষিণমুখী শিখর মন্দিরটি অন্যতম। প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও আকারপ্রকারে এটি আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

শীতলা মন্দিরের পশ্চিমদিকে বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন ও আটচালা মন্দির দেখা যায়, যা বর্তমানে জঙ্গলাবৃত। তবে কাঁসাইয়ের তীরে স্থানীয় মজুমদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিশালাকার পশ্চিমমুখী নবরত্ন মন্দিরটি একান্তই উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরের খিলানশীর্ষে একদা রামরাবণের যুদ্ধদৃশ্য খোদিত পোড়ামাটির যে ফলকসজ্জা ছিল সেগুলির অধিকাংশই বর্তমানে অপহৃত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯′ (৫·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

পাথরা গ্রামের উত্তরপাড়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত তিনটি পুবমুখী আটচালা শিব মন্দির দেখা যায়। সেগুলির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ দশাবতার ও বিভিন্ন পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি নিবদ্ধ রয়েছে। উত্তর

দিকে সব শেষের মন্দিরটিতে যে উৎসর্গলিপি আছে, তার পাঠ নিম্নরূপ : "সুভমস্তু সকাব্দা : ১৭৩৮/সন ১২২৪ শ্রীযুৎ/রামসুন্দর বন্দপাধ্যায় ।" অতএব ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সমমাপের এর মন্দির তিনটি দৈর্ঘ্যে ৭'৬" (২.৩মি.) প্রস্থে ৫'৬" (১.৬ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭মি.)। এ মন্দির তিনটির অনতিদূরে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের যে ন-চূড়া আটকোণা রাসমঞ্চটি আছে, সেটি ১২৩৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, তা ঐ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, এছাড়া উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত একটি পিতলের রথও এই প্রসঙ্গে একান্তই উল্লেখযোগ্য।

গ্রামের হাটতলায় এক বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে দুটি পুবমুখী ও দুটি পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির দেখা যায়। মন্দিরগুলি অলঙ্করণবিহীন এবং একটি মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় সেটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।

পান্না : ঘাটাল –চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বরদা–রানীর–বাজার ; সেখানের চৌকোণ থেকে দক্ষিণে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন পান্না গ্রাম (জে· এল· নং ১২০)। সম্প্রতি এই গ্রামে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে বেশ কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রামের হেদুয়া পুকুরের কাছে গুপ্ত, পাল ও সেন আমলের প্রাচীন মৃৎপাত্রসহ পোড়ামাটির ছোটবড় কয়েকটি মূর্তি অনুসন্ধানকালে পাওয়া যায়, যা প্রত্নতত্ত্বের বিচারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাপ্ত এইসব পুরাবস্তুগুলি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়ম, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহশালা এবং হাওড়ার আনন্দনিকেতন কীর্তিশালায় সংরক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এইসব প্রত্নবস্তুগুলির নিরিখে অনুমান করা যায় যে, শিলাবতী নদী তীরবর্তী এই স্থানটিতে একদা এক সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। তবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য পুরাতাত্ত্বিক উৎখনন আবশ্যক।

এছাড়া এ গ্রামে শীতলানন্দ শিবের দালানরীতির মন্দিরটিও পুরাকীর্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটিতে বেশ কিছু পৌরাণিক দেবদেবী বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকও দেখা যায়।

পালপাড়া : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা স্টেশন থেকে মেছেদা –বাজকুল-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পটাশপুর থানার এলাকাধীন পালপাড়া গ্রাম (জে· এল· নং ১৯৫)। এ গ্রামে স্থানীয় রায় মহাপাত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কিশোরজীউ-এর দক্ষিণমুখী ইটের নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দেওয়ালে কূর্ম, মৎস্য, বরাহ ও নৃসিংহের উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২০' (৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৫' (১৩·৭ মি·)। এ দেবালয়ের ত্রিখিলান দালানের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি খিলানের উপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ পাশখিলানের উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ দেবালয়টি স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিচারে সতের শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

পিঙলা : বালিচক –ময়না পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পিঙলা থানার এলাকাধীন সদর (জে· এল· নং ৮৩)। এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলো, স্থানীয় চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তের দক্ষিণমুখী পঞ্চ-রত্ন মন্দির। মন্দিরটি একটি দালান মন্দিরের উপর স্থাপিত যার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে ঈশ্বরপুর ও পাইকভেড়ি

নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। মন্দিরটিতে পোড়ামাটির সামান্য অলঙ্করণ ছাড়া এটিতে নিবদ্ধ সংস্কারলিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ/হাল মেরামত হঅ/সকাব্দা ১৭৭৯/সন ১২৬৪ সাল/কতৃিক শ্রীযুঃ আনন্দলাল পাল চৌধুরী শ্রী··· হরি/দাস মিস্ত্রি সাং দা(স)পুর পঃ/চেতুয়া।" সুতরাং ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এ মন্দিরটি সংস্কৃত হলেও মন্দিরটির গঠন-স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিরিখে এটি আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলে মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৫′ ৯″ (৭·৮ মি·), প্রস্থে ২২′ ৩″ (৬·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·)।

এ মন্দিরটির সামান্য পুবে, পশ্চিমমুখী সদানন্দ শিবের একটি সপ্তরথ শিখর-দেউলের বরণ্ডের নীচে নিবদ্ধ দুটি মালাজপধারী পোড়ামাটির মূর্তি দেখা যায়। একদুয়ারী প্রবেশপথের উপরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

পিঙলার গ্রাম্য দেবীপিঙ্গলাক্ষীর নামেই গ্রামের নাম এবং এ দেবীর পুবমুখী আটকোণা শিখর-দেউল সদৃশ মন্দিরটির স্থাপত্যও বেশ অভিনব। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

পিঙলার পশ্চিমপাড়ায় বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একই চত্বরে স্থাপিত দক্ষিণমুখী, একদুয়ারী জোড়া আটচালা শিব-মন্দিরের কাছাকাছি আরও একটি পশ্চিমমুখী আটচালা শিব মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দির তিনটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। ঐ পরিবারের ভদ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী বাণেশ্বর শিবের আটচালা মন্দির ও আটকোণা এক রাসমঞ্চও এখানকার উল্লেখ্য। এ দুটি স্থাপত্যে কোনো উৎসর্গলিপি নেই তবে আকারপ্রকারে সেগুলি পূর্ব-বর্ণিত মন্দিরগুলির সমসাময়িক। কাছাকাছি চণ্ডী-শীতলার দালান রীতির মন্দিরটিতে উত্তর ও দক্ষিণে প্রবেশপথ আছে। উভয় প্রবেশপথের দুপাশে পঙ্খ পলস্তারায় বাতায়নবর্তিনীর মূর্তি ছাড়া উত্তরে প্রবেশপথের উপরে 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, এ মন্দিরটি ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

পুবপ্রান্তে পিঙলা-টঙ্গুর গ্রাম্যপথের পাশে বুড়ো শিবের পশ্চিমমুখী শিখর-দেউলটির গর্ভগৃহ প্রথাগত বর্গক্ষেত্রে না হয়ে আটকোণা, যদিও বাইরের দেওয়াল চতুষ্কোণ এবং মন্দিরের ছাদ দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরানির্ভর গম্বুজের উপর স্থাপিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত মনে হয়।

পিয়ারডাঙ্গা : চন্দ্রকোণা- পলাশচাবড়ি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বসনছোড়া ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন গ্রাম পিয়ারডাঙ্গা (জে· এল· নং ৭৯)। এখানে হজরত সৈয়দ শাহ্ ঈশা খাঁ পীরের এক গম্বুজ মাকড়া পাথরের সমাধিসৌধটি এক পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ সৌধটি স্থাপত্য বিচারে আঠার শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। কাছাকাছি এক উঁচু টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত মাকড়াপাথরের আরও যে তিন-চারটি মাজার দেখা যায়, সেগুলি কথিত পীর সাহেবের পরিবার-পরিজনদের বলেই জানা যায়।

পুঁএ্যাঘাট : পাঁশকুড়া-ত্রিলোচনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) লোয়াদা ; সেখান থেকে কাঁসাই পেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে ১ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার

এলাকাধীন পুঁঞাপাট গ্রাম (জে· এল· নং ১৩৩)। এ গ্রামে পাল পরিবারের পুবমুখী একরত্ন দুর্গা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির খিলানশীর্ষে ও স্তম্ভমূলে একদা বেশ উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ ছিল, কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলির অধিকাংশই বিনষ্ট। প্রায় ১৭' (৮·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, স্থাপত্য নিরিখে সেটি খ্রীস্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে ভঞ্জ পরিবারের উত্তরমুখী লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও বর্তমানে সংরক্ষণের অভাবে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হলেও, সেটিতে 'টেরাকোটা'-ফলকসজ্জা দেখা যায়। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে সেটি ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতাপদিঘি : 'পালপাড়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পটাশপুর-এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) খড়ুই বাজার হয়ে পুবে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে পটাশপুর থানার এলাকাধীন প্রতাপদিঘি গ্রাম (জে· এল· নং ২৪৫)। এ গ্রামের গোস্বামী-পাড়ায় অবস্থিত পুবমুখী রসিকরায়জীউর মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মূল মন্দিরটি সপ্তরথ শিখর এবং তৎসংলগ্ন জগমোহনটি পঞ্চরথযুক্ত একরত্ন। মূল মন্দির ও জগমোহন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৪' (৪·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

ফকিরবাজার : 'কাদিলপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পলশপাই খালের পশ্চিমপাড়ের বাঁধ ধরে দক্ষিণে ১/২ কিলোমিটার দূরত্বে দাশপুর থানার অন্তর্গত কাদিলপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১০৮) ফকিরবাজার গ্রাম। এখানকার গ্রামস্থ দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন শীতলা মন্দিরটি স্থানীয় উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এটির ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে অনুভূমিক দুসারি এবং দুপাশে খাড়াভাবে একসারি করে পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ এবং তাতে উৎকীর্ণ হয়েছে বিবিধ পৌরাণিক মূর্তির সঙ্গে দশাবতার মূর্তি প্রভৃতি। খিলানশীর্ষে 'টেরাকোটা'-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে দুর্গা, রামসীতা ও কমলেকামিনী প্রভৃতির মূর্তি। প্রবেশপথের উপরে পঙ্খপলস্তারায় উৎকীর্ণ এক লাইন প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ: "সকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৫ সাল শ্রীমহন পরামানিক।" ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির সামনের ত্রিখিলান দালানের ছাদ টানা খিলানের উপর এবং গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানের উপর চার দেওয়াল কোণে উদ্‌গত লহরার উপর স্থাপিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬'(৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭'(৮·২ মি·)।

আলোচ্য এই মন্দিরের কাছাকাছি আমলকযুক্ত আটচালা একটি পশ্চিমমুখী শিবমন্দির ও গোপীনাথজীউর একটি পুবমুখী দালান-মন্দিরও দেখা যায়।

বড়কলঙ্কাই : 'কয়তা' নিবন্ধে তেমাথানী হয়ে মদনমোহনচক পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত বড়কলঙ্কাই গ্রাম (জে· এল· নং ৪৮৬)। এখানে দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউর ইটের পুবমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। প্রায় ১১/২ মিটার উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরের জগমোহনের উপরের ছাদটি

খাঁজকাটা পীঢ়া-দেউলের মতই। জগমোহনে প্রবেশপথের উপরে একসারি পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি এবং উত্তরের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে প্রায় ১১/২′ (০·৪৫ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এক মিথুন ফলক। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩২′ (৯.৭ মি.), প্রস্থে ১৬′ (৪·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)।

বড়িশা : 'তিলদাগঞ্জ' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে সামান্য দূরত্বে পিংলা থানার এলাকাধীন বড়িশা গ্রাম (জে· এল· নং ২৩৩)। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের রাধাবিনোদজীউর দক্ষিণমুখী একটি পঞ্চরত্ন এখানকার এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ থাকলেও, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এগুলি ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলেছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় ২৭′ (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়।

এ গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় গোস্বামী পরিবারের রাধাবিনোদজীউর দক্ষিণমুখী ইঁটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক দ্রষ্টব্য। এ মন্দিরে যেসব 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ রয়েছে সেগুলির অধিকাংশই হলো বেশ বড়ো আকারের দশাবতার মূর্তি। এ মন্দিরেও কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্য নিরিখে তা উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হওয়াই সম্ভব। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৯′ (৫·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

গ্রামের ভট্টাচার্য পরিবারে রক্ষিত দুটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিলদাগঞ্জ থেকে পাওয়া এ মূর্তি দুটি ভাস্কর্য শৈলী নিরিখে খ্রীস্টীয় দশ শতকের বলেই অনুমান করা যায়।

বনপাটনা : খড়্গপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শ্যামলপুরা ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার অন্তর্গত বনপাটনা (জে· এল· নং ৩৪০)। সৎপথী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের মাকড়াপাথরের তৈরি পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানকার এক দ্রষ্টব্য। মন্দিরটির ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ হয়েছে পদ্মের নানাবিধ নকাশি অলঙ্করণ। এ মন্দিরের বিগ্রহের বেদীতে যে চার লাইন লিপি উৎকীর্ণ হয়েছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীব্রজমোহন সর্তপতি শ্রীবিশ্ব/নাথ সতপতি/শ্রী সিতলপ্রসাদ যড়ঙ্গি কৃষ্ণ কারক সন ১২৭৫ সাল ২৫ বৈশাখ/শ্রীনারান দাস মিস্ত্রি রামধন পাতর কারিকর।" অতএব ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৭′৪″ (৮·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরটির চতুর্দিকে প্রাচীর ঘেরা অঙ্গনের মধ্যে দক্ষিণে একটি চারচালা দোলমঞ্চ ছাড়া সামনের চারচালা নাটমণ্ডপটির স্থাপত্য একান্তই চিত্তাকর্ষক। এ মণ্ডপটির ছাদ কুব্জপৃষ্ঠ খিলান (কোভ ডোম) দ্বারা নির্মিত।

এ মন্দির চত্বরের উত্তরে মাকড়া পাথরের পুবমুখী একটি শিবের আটচালা ও কাছাকাছি আরও একটি মাকড়া পাথরের দালান-মন্দির দেখা যায়। মন্দির দুটিতে কোনো প্রতিষ্ঠাফলক নেই বটে, তবে স্থানীয়ভাবে জানা যায়, সে দুটি পূর্বোক্ত রঘুনাথ মন্দিরের সমসাময়িক।

বরদা : ঘাটাল-চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল শহর থেকে

পশ্চিমে, প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার অন্তর্গত রথিপুর মৌজাভুক্ত (জে এল· নং ৬০) বরদা গ্রাম। বাহারিস্তান-ই-গায়েবী নামক এক ফার্সী পুঁথির তথ্য অনুযায়ী একদা খ্রীস্টীয় সতর শতকে এতদঞ্চলের ভূস্বামী দলপত সিংহের এখানেই গড়বাড়িটি অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ এই দলপতের নামেই কাছাকাছি দলপতিপুরের নামকরণ হয়ে থাকবে। তবে দলপতের সে রাজ্যপাটের তেমন কোনো চিহ্নই আর বর্তমান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও বরদার ভিতরগড় ও বাহিরগড় নামে মৃৎপ্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত যে দুটি গড়ের চিহ্ন দেখা যায়, সেগুলি সম্ভবত বাহারিস্তান-ই-গায়েবীর তথ্য অনুযায়ী দলপত সিংহের অধিকারভুক্ত ছিল। পরে মোগল বশ্যতা স্বীকার না করার কারণে তার পতন ঘটায়, এগুলি পরে স্থানীয় ভূস্বামী শোভাসিংহের দখল-কায়েম হয় বলে অনুমান। ভিতরগড়ে জলহরি এবং বাহিরগড়ে রাধাসাগর প্রভৃতি পুষ্করিণী আজও সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য হয়ে আছে। বিশেষ করে রাধাসাগর পুষ্করিণীটি বর্তমানে মজে গেলেও মাকড়া পাথর দিয়ে বাঁধান সেই প্রশস্ত স্নানের ঘাটটি আজও দেখা যায়। এছাড়া গড়ের বাইরে অবস্থিত সিং সাগর, চোংদার দিঘি, রণসায়র ও কাগজকাটা দিঘি প্রভৃতিও আজ প্রাচীন স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে পুরাকীর্তি বলেই গণ্য হতে পারে।

বরদার লৌকিক দেবী বিশালাক্ষী এ অঞ্চলে বেশ জাগ্রত দেবী হিসাবে খ্যাত এবং স্থানীয় ভূস্বামী শোভা সিংহ কর্তৃক এ দেবী প্রতিষ্ঠিত বলেই জনশ্রুতি।

বলরামপুর : 'কাঁকড়া-শিবরাম' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে ১ কিলোমিটার উত্তরে ডেবরা থানার এলাকাধীন গ্রাম বলরামপুর (জে· এল· নং ১৪৫)। এ গ্রামে মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী সীতারামের সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে পীঢ়াদেউলের অনুকরণে চালচালা রীতির এক জগমোহনও এর সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। একসময়ে জগমোহনের বাঁকানো কার্নিসে ও প্রবেশপথের দুপাশে খাড়াভাবে একসারি করে "টেরাকোটা"-ফলকসজ্জা ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেগুলি অপহৃত। মন্দিরটির পশ্চিমদিকের দেওয়ালে যে তিন প্রস্থ উৎসর্গলিপি দেখা যায়, তার মধ্যে নিম্নের ছন্দোবদ্ধ লিপিটি একান্তই অভিনব। সেটির হুবহু পাঠ নিচে দেওয়া হলো : "শ্রীশ্রী সিতারাম চন্দ্র জিউ/সুন সর্ব্বজন : করি নিবেদন : মন্দীর নির্ম্মাণ/কথা : দাসপুরে বাষ : মিস্ত্রী ঠাকুরদাস : শিল/ পদবিতে গাঁথা : মিস্ত্রীর সঙ্গে অশ্টজন : করিল/শুগঠন : শকলে ক্ষেমতা পর্ণ্যঃ আরম্ভ সাতশষ্ঠী/সালে : গেল দিন হরি বলে : আস্শটীর আসাড়ে/সংপূর্ণ্যা।ইতি"। অতএব ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির শিল্পী দাসপুরের ঠাকুরদাস শীল তার আটজন সহযোগীর সাহায্যে এ মন্দির-নির্মাণকার্য যে এক বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন করেছিলেন তা এ লিপি থেকে বেশ অনুধাবন করা যায়। মূল মন্দিরটি, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১২'৫" (৩·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১২'৫" (৩·৮ মি·), প্রস্থে ৬'৬" (১·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিটির সামান্য পশ্চিমে এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী শিবের আরও এক শিখর-মন্দির দেখা যায়। সেটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, এ মন্দিরটিও পূর্বোক্ত শিল্পী ঠাকুরদাস শীলের কৃত। প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)

উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটির দেওয়ালে পঙ্খপলস্তারায় খোদিত এক লিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী শিব ঠাকুর/সুভমস্তু সকাব্দা ১৭স ৭৮/সন ১২ স ৬৩ সাল তারিক/১৪ কার্ত্তিক/ মিস্ত্রি শ্রীঠাকুরদাস শিল/সাং দাশপুর চেতুয়া।" সুতরাং বেশ বোঝা যায়, আলোচ্য এই শিল্পী বলরামপুর গ্রামের এ দুটি মন্দির ছাড়াও, চমকা, চকবাজিত ও দাসপুর গ্রামের মন্দির নির্মাণেও যে অংশগ্রহণ করেছেন, তা ইতিপূর্বে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

বলিহারপুর : 'ডিহি বলিহারপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সে গ্রামটির পার্শ্ববর্তী দাসপুর থানার পুরুষোত্তমপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল.নং ৫৯) বলিহারপুর গ্রাম। এখানে গেঁড়িবুড়িতলায় স্থানীয় লৌকিক্ দেবী গেঁড়িবুড়ির দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "যুভমস্তু/সকাব্দা ১৬৭৯/সন ১১৬৪।" অতএব ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটিতে পোড়ামাটির অলঙ্করণ হিসাবে কয়েকটি ফুল ও রাধাকৃষ্ণমূর্তিযুক্ত ফলক দেখা যায়। এ মন্দিরটির স্থাপত্যগত আর এক্ বৈশিষ্ট্য হলো, এ মন্দিরের তিনদিকেই রয়েছে ত্রিখিলান অলিন্দ যার ছাদ টানা-খিলেন করে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৮'৬" (৮·৭ মি·), প্রস্থে ২১'৪" (৬·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

গ্রামের রায়পাড়ায় অবস্থিত রায় পরিবারের ব্রজরাজকিশোরের দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দিরটি পুরাকীর্তি হিসাবে একান্তই উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরের সম্মুখভাগের দেওয়ালে পোড়ামাটির যেসব অলঙ্করণ দেখা যায় সেগুলির বিষয়বস্তু মূলতঃ লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী। মন্দিরটির স্তম্ভমূলেও দেখা যায় পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ বিভিন্ন শিকারযাত্রার দৃশ্য। মন্দিরে যে সংস্কারলিপিটি আছে তা থেকে জানা যায় সেটি ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৭' (৮·২ মি·), প্রস্থে ২২'৬" (৬·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

কাছাকাছি এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিবের একটি শিখর-দেউলও দেখা যায়। সে মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৭' (২·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)। মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে ব্রজরাজকিশোরের একটি ন'চূড়া রাসমঞ্চও প্রতিষ্ঠিত॥

বলিহারপুর গ্রামের দত্তপাড়ায় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী পঞ্চানন্দের আটচালা মন্দিরটিও আকারপ্রকারে প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। অলঙ্করণহীন, এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯' (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)।

গ্রামের পালপাড়ায় রায় পরিবারের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন শিব-মন্দিরটিতেও একদা বেশ পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু সেটি পরবর্তীসময়ে পরিত্যক্ত হওয়ায়, পোড়ামাটির ফলকগুলির অধিকাংশই আজ অপহৃত। মন্দিরটিতে যে উৎসর্গলিপিটিদেখাযায়, সেটির পাঠ নিম্নরূপ :

"সুভমস্তু সকাবদা ১৭০৯ সন ১১৯৪ সালঃ।" অতএব ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬ মি·)।

বসনছোড়া : 'পিয়ারডাঙ্গা' নিবন্ধে বসনছোড়া পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন বসনছোড়া গ্রামের (জে· এল· নং ৬৮) প্রধান পুরাকীর্তি হলো, মাকড়াপাথরে নির্মিত রাধাগোবিন্দের জোড়বাংলা মন্দির। মন্দিরটির ত্রিখিলানের

উপর নিবদ্ধ পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠাফলক থাকলেও সেটি বর্তমানে ক্ষয়িত হওয়ায় তার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। তবে আকারপ্রকারে মন্দিরটি আঠার শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২০′ (৬·১ মি·), প্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)।

মন্দিরের পুবগায়ে লাগোয়া নাটমন্দিরটি বর্তমানে ভগ্ন হলেও, সেটিতে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপির পাঠ নিম্নরূপ : "৭ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জি/সুভমস্তু সকাব্দা ১৭৩২ সক/সন ১২১৮ সাল। বাঙ্গলা/শ্রীশ্রীমোহনলাল গোস্বামিজ/শ্রীশ্রীনিমাঞি চান্দ গোস্বামিজ/ভিত্তানুভিত্ত শ্রীসেবকরাম সিং/সাকিম দাসপুর পং চেতুয়া।"

এ মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী রাধাকান্তের আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধাকান্ত ঠাকুর জিউ/শ্রীনারায়ণ ॥ সকাব্দা ১৭৫২/সতেরস বাহান্ন মাহ মাঘ/শ্রী উর্দ্ধবানন্দ দেব সমান/শ্রীমতি চাঁদরাণি দেবী ইতি।" অতএব ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় সরকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউয়ের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে।

আলোচ্য এ মন্দিরটির পাশাপাশি এই পরিবারেরই প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী একটি শিখর-মন্দির দেখা যায়। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপর নিবদ্ধ দু'লাইন এক প্রতিষ্ঠালিপির হুবহু পাঠ নিম্নরূপ : "গিরীশচন্দ্র সূত্রধর মিস্ত্রি/শকাব্দা ১৭৭৮ ১ লা শ্রাবণ্য।" অতএব ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৬′ (১·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৪′ (৪·২ মি·)।

বসন্তপুর : 'নন্দনপুর' নিবন্ধে তেমোহানী পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে কাঁসাইয়ের শাখা নদীর বাঁধ ধরে দক্ষিণে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন বসন্তপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৭৭)। এখানে মান্না পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক দালান মন্দিরের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় ইতিপূর্বে আলোচিত ঈশ্বরপুর, পিঙলা ও পাইকভেড়ি গ্রামে। ত্রিখিলান এ মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

বাঘরুই : 'বাদাড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার এলাকাধীন বাঘরুই গ্রাম (জে· এল· নং ৬২১)। এ গ্রামের প্রধান দ্রষ্টব্য মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী ইটের লক্ষ্মীবরাহের নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটির পুব ও দক্ষিণ দেওয়াল জুড়ে কৃষ্ণলীলা ও রামলীলা বিষয়ক পোড়ামাটির ফলকসজ্জা একান্তই আকর্ষণীয়। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, পোড়ামাটিসজ্জার নিরিখে মন্দিরটি খ্রীস্টীয় আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২১′৮″ (৬·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)।

গ্রামের জানাপাড়ায় জানা পরিবারের পুবমুখী লক্ষ্মীজর্নাদনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নদশার পরিণত হলেও, সেটিতে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-ফলকসজ্জা দেখা যায়।

বাড় উত্তর হিংলী : মেছেদা – হলদিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কালিকাকুণ্ডু ; সেখান থেকে দক্ষিণে হাঁটাপথে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে সুতাহাটা থানার এলাকাধীন বাড় উত্তর হিংলী গ্রাম (জে· এল· নং ৫০)। এ গ্রামে পালোধি পরিবারের পুবমুখী রাজরাজেশ্বরীর আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। ইঁটের এ মন্দিরটির সম্মুখভাগে কোনো পোড়ামাটির অলঙ্করণ নেই বা কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে স্থাপত্য বিচারে মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২০'১০" (৬·৩ মি.) প্রস্থে ১৯'৩" (৫·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯মি.)

বাড়গোপাল : 'কোতাইগড়' নিবন্ধে মকরামপুর পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন বাড়গোপাল গ্রাম (জে· এল· নং ৪৭৫)। এ গ্রামে এক দালান-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শাক্ত দেবী ভদ্রকালী এ অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত এবং স্থানীয় সেবাইতদের মতে, এ মন্দিরটি আজ থেকে দেড়শো বছর আগে নির্মিত হয়েছে।

তবে এ মন্দিরের কাছাকাছি ভদ্রেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী সপ্তরথ শিখর-দেউলটিও এক দ্রষ্টব্য। এ মন্দিরে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় আকারপ্রকারে সেটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরটির সংলগ্ন যে জগমোহনটি দেখা যায় সেটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে গর্ভগৃহটি ২০' (৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১৭'৮" (৫·৩ মি·), প্রস্থে ৮' (২·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·)।

বাড় মহিষদা : মেদিনীপুর-নাড়াজোল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কেশপুর থানার এলাকাধীন গ্রাম বাড় মহিষদা (জে· এল নং ২৯৮)। এ গ্রামে বিশালাক্ষীর মাকড়াপাথরের পুবমুখী চারচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। একদুয়ারী এ মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, এ মন্দিরটি, ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১' (৩·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পুবে শীতলেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও আকারপ্রকারে সেটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·২ মি·)। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে বিক্ষিপ্ত মাকড়াপাথরের আমলকশিলা প্রভৃতি দেখে ধারণা হয় যে, অতীতে এখানে হয়ত কোনো বৃহৎ এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বাড়ুয়া : মেদিনীপুর-ভাদুতলা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মেদিনীপুর শহর থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তরে মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন গ্রাম বাড়ুয়া (জে· এল· নং ১৯৫)। এ গ্রামের সাতনারাণীতলা নামে কথিত এক ফাঁকা মাঠের গাছতলায় মাকড়াপাথরের উপর খোদিত কয়েকটি মূর্তি প্রোথিত অবস্থায় দেখা যায়, যা একান্তই কৌতূহলজনক। মূর্তিগুলিকে স্থানীয়ভাবে কেউ কেউ সাতভগ্নী সাতবোনী অথবা

সাতরানীও বলে থাকেন। সাধারণতঃ এখানের এই মূর্তিস্তম্ভগুলিতে উৎকীর্ণ হয়েছে ছত্রধারী, তীরধনুক হাতে তীরন্দাজ, ঢাল-তলোয়ারধারী এবং অশ্বারোহী প্রভৃতির মূর্তি। কি কারণে যে এই মূর্তিগুলি এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। তবে এই মূর্তিগুলির কাছাকাছি যে এখানে একটি পাথরের শিখর-মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ হিসাবে বিরাটাকার এক আমলক শিলা স্থানীয় মণ্ডলপাড়ায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, আদিতে এখানে প্রতিষ্ঠিত কোনো মন্দির প্রাঙ্গনে দেবতার উদ্দেশ্যে এইসব মূর্তিস্তম্ভগুলি মানত হিসাবে নিবেদন করা হতো।

বাদাড় : 'খানামোহন' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে কাঁসাই পেরিয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে কেশপুর থানার এলাকাধীন বাদাড় গোপীনাথপুর গ্রাম । এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলো, জগন্নাথদেবের পুবমুখী নবরত্ন মন্দির। এখানের উপাসিত বিগ্রহ কাঠের তৈরি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৩' (৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·২ মি·)। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে নিবদ্ধ হয়েছে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলঙ্করণসজ্জা, যার বিষয়বস্তু রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার নানা কাহিনী। মন্দিরের স্তম্ভমূলে সামাজিক দৃশ্য হিসাবে বাঘ, কুমীর ও হরিণ শিকারের এবং বিভিন্ন বাদ্যবাদকের দৃশ্য খোদিত হয়েছে। মন্দিরের কার্নিসে সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠাফলকটি বর্তমানে পাঠযোগ্য না হলেও মন্দিরের সেবাইতগণের পক্ষ থেকে জানা যায় যে এটি ১১২৬ বঙ্গাব্দে নির্মিত। সুতরাং সে হিসাবে এবং মন্দিরটির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশৈলী বিচারে এটি আঠার শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেও অনুমান করা যায়।

বারাঙ্গা : মেছেদা – দীঘা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) রামনগর থেকে উত্তরে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে, অথবা এগরা-রামনগর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে), দেপাল-শাসনবাড় থেকে কাঁচা রাস্তায় পশ্চিমে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে রামনগর থানার এলাকাধীন বারাঙ্গা গ্রাম (জে· এল· নং ২৪)। স্থানীয় দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী রাধাবল্লভরায়ঠাকুরজীউর দালান-মন্দির এখানের এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। একদুয়ারী এ মন্দিরটির সামনের ও উত্তর-দক্ষিণের দেওয়ালে অনুভূমিক ও খাড়াভাবে একসারি করে 'টেরাকোটা' ফলক নিবদ্ধ হয়েছে, যার বিষয়বস্তু হলো, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবী প্রভৃতি। প্রায় ৫' (১·৫ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৮'২" (৫·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৮ (৫·৪ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

বালিতোড়া: 'জয়কৃষ্ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন বালিতোড়া গ্রাম (জে. এল. নং ১০৩)। এ গ্রামে চৌধুরী পরিবারের অলংকরণহীন দক্ষিণমুখী শ্রীধর-জীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটিতে পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর তেমন কোনো সজ্জা নেই। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫' (৪.৬ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি.)।

আলোচ্য এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর আটকোণা রাসমঞ্চটিতে কৃষ্ণলীলা

বিষয়ক 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায় এবং সেটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীশ্রীধর/জিউর রাসমঞ্চ/সকাব্দা ১৭৭৪/সন ১২৫৯ সাল।"

রাসমঞ্চটির উত্তরদিকে শীতলানন্দ শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিও রাসমঞ্চটির সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠিত বলে জানা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)।

বালিপোতা : 'নাড়াজোল' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন বালিপোতা গ্রাম (জে· এল· নং ২০)। এ গ্রামে রায় পরিবারের দামোদরের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে পোড়ামাটির যে অলঙ্করণসজ্জা দেখা যায় তার বিষয়বস্তু হলো, লঙ্কাযুদ্ধ, অনন্তশয়ান বিষ্ণু, গজলক্ষ্মী ও দশাবতার প্রভৃতি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫'৫" (৪·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি সম্ভবতঃ আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়ে থাকবে।

এ মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে, কংসাবতীর শাখা নদীটির তীরে পূর্বোক্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শীতলানন্দের পশ্চিমমুখী শিখর-মন্দিরটিও স্থাপত্য নিরিখে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·২ মি·)।

বালিহাটি : খড়গপুর – মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বীরেন্দ্র সেতুর কাছ থেকে নদীর বাঁধে পুবে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর থানার অন্তর্গত বালিহাটি গ্রাম (জে· এল· নং ২১৬)। এ গ্রামে কথিত আঁধারনয়ন নামক স্থানে এক পরিত্যক্ত নীলকুঠির পাশে মাকড়াপাথরে নির্মিত এক ভগ্ন দেবালয় এখানকার এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটি বর্তমানে এমন ভগ্নাবস্থায় পতিত হয়েছে যে, এটির স্থাপত্যরীতি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও অনুমান করা যায় এটি পীঢ়া-স্থাপত্যের কোনো দেবালয় ছিল এবং এটি যে মেদিনীপুর জেলার এক প্রাচীনতম মন্দির সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ মন্দিরটির গঠন-পরিকল্পনায় বেশ অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রামের শিব মন্দিরে নিবদ্ধ কিছু কিছু জৈন মূর্তির ভগ্নাংশ দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে এটি হয়ত কোনো জৈন মন্দির ছিল। পাশাপাশি জিনশহর নামের গ্রামটিতে ভগ্ন শিখর-মন্দিরের আমলকশিলা দেখেও ধারণা করা যায় যে, কোন জৈন মন্দির-দেবালয়ের অস্তিত্বের জন্যই ঐ গ্রামের নাম জিনশহর হয়ে থাকবে।

আলোচ্য এ মন্দিরটি পুবমুখী এবং মন্দিরের গর্ভগৃহের বহির্ভাগ পঞ্চরথ ও অভ্যন্তর বর্গাকার। এছাড়া এ মন্দিরের গর্ভগৃহের চতুর্দিকে এক ঘেরা প্রদক্ষিণপথ এবং মন্দিরে প্রবেশপথের দুদিকে দুটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। মন্দিরের ছাদ লহরা করে নির্মিত। স্থাপত্য বিচারে মন্দিরটি এগারো-বার শতকে নির্মিত বলেই অনুমান। কিন্তু এখানের এই গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকীর্তিটি অবিলম্বে সংস্কার করা না হলে অচিরেই ধ্বংস হবার সম্ভাবনা।

বাসুদেবপুর : 'এগরা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে এগরা-কাঁথি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) এগরা থানার এলাকাধীন বাসুদেবপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২৫৯)। এ গ্রামে জগন্নাথের ইটের তৈরি পুবমুখী পীঢ়া জগমোহনসহ নবরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে পদ্ম-পলস্তারায়

উৎকীর্ণ অলঙ্করণ ছাড়া আর তেমন কোনো সজ্জা নেই। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি আকার প্রকারে, আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৪' (৭·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫·২ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ২০' (৬ মি·), প্রস্থে ১৩'৬" (৪·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০ মি·)।

এছাড়া এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশে রামচন্দ্রের পুবমুখী একটি আটচালা মন্দিরও দেখা যায়। বিগ্রহ কাঠের রামচন্দ্র মূর্তি। সামনের ত্রিখিলানের থামগুলি বর্তমানে পতিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৮' (৮·৫ মি·), প্রস্থে ২৫' (৭·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৬০' (১৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠার শতকের শেষদিকে নির্মিত বলে অনুমান। এ মন্দিরের কাছাকাছি পুবমুখী শিবের আরও একটি সপ্তরথ এক দুয়ারী শিখর-মন্দির দেখা যায়। কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও গঠনস্থাপত্যে মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

বাসুদেবপুর : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন বাসুদেবপুর (জে· এল· নং ৬৩)। এ গ্রামের হাটতলায় পশ্চিমমুখী ইঁটের শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, গুলাব দত্তরায় এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটির বাইরের ছাদ ধাপযুক্ত করে এবং ভিতরের ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটিতে বর্তমানে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থানীয়ভাবে জানা যায় যে, এ মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠাকাল হিসাবে ১১৭২ বঙ্গাব্দ উৎকীর্ণ ছিল। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ৮'৬" (২·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

গ্রামের পঞ্চাননতলায় দক্ষিণমুখী স্বরূপনারায়ণ ধর্মের যে দালান-মন্দিরটি দেখা যায় সেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪'৬" (৪·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)। এ মন্দিরে যে পোড়ামাটির প্রতিষ্ঠালিপি আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী৺স্বরূপনারাণ ধম্ম/সন ১২৬৬ সাল/তাং ২৫ য়াশাড়/মিস্ত্রী শ্রীলোধন সাই সাং/দাসপুর।" অতএব এ মন্দিরটি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

এ গ্রামের কামারনালা নামক স্থানে মহাপ্রভুর দক্ষিণমুখী ইঁটের নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে পোড়ামাটির কোনো অলঙ্করণ না থাকলেও পঙ্খপলস্তারায় উৎকীর্ণ নানাবিধ নকাশি অলঙ্করণ দেখা যায়। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামেরভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরের পশ্চিমমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলকসজ্জা ছিল। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

বীরসিংহ : পাঁশকুড়া-ঘাটাল-খড়ার পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল থানার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রাম (জে· এল· নং ৪৮)। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান হিসেবে খ্যাত এ গ্রামে বিদ্যাসাগরের বসতবাটির কোনো চিহ্ন বর্তমান না থাকলেও তাঁর বাস্তুভিটায় বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির নামে একটি ভবনে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সংগ্রহশালায় বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত পুস্তকাদিসহ তাঁর ব্যবহৃত বাক্স-তোরঙ্গ, ছড়ি প্রভৃতিও সংরক্ষিত হয়েছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বেশ কিছু মন্দির-'টেরাকোটা' ফলকও এ সংগ্রহে দেখা যায়।

গ্রামের ঘোষপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত শীতলানন্দ শিবের দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটিও

এখানের এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ দু'লাইন প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "৺ রামকানাঞ দাস কামার তস্যপুত্র শ্রীযুত নৃসিংহলাল দাস কামার/কৃত সকাব্দা ১৭৫৯ সক সন ১২৪৪ সাল তারিখ মাহ....মাঘ।" অতএব ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির ভিতরের দেওয়াল ছ'কোণা করে এবং ছাদ গম্বুজ দ্বারা নির্মিত।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে ধর্মরাজের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও, গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দুপাশে দুটি দ্বারপালের মূর্তি দেখা যায়। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩'৬" (৪·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে।

বৃন্দাবনপুর : 'জয়কৃষ্ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন বৃন্দাবনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১২৭)। এ গ্রামে মহাপ্রভুর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া নিবদ্ধ হয়েছে দ্বাদশগোপালের বারোটি পোড়ামাটির মূর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া সেবাইতদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্ত হয় যে মন্দিরটি দাসপুরের হরহরি চন্দ্র মিস্ত্রীর দ্বারা কৃত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬'৫" (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

বেঁউদিয়া : মেছেদা–এগরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেঁউদিয়া মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১০৪) শিববাজার এলাকায় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী ইটের শিবমন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মূল মন্দিরটি পঞ্চরথ শিখর-দেউল এবং তৎসংলগ্ন জগমোহনটি চারচালা রীতির। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭·৬ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

বেঙ্‌দা : খড়্গপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেলদা ; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটা পথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন বেঙ্‌দা গ্রাম (জে· এল· নং ৩০৭)। এ গ্রামে নন্দ পরিবারের পুবমুখী রঘুনাথের চারচালা জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এখানকার এক পুরাকীর্তি। জগমোহনের আমলকের ওপর পা রাখা দুটি সিংহের মূর্তি একান্তই অভিনব। এ মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে স্থাপত্য নিরিখে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের মধ্যবর্তী প্রধান চূড়াটির গায়ে কৃষ্ণবলরামের পোড়ামাটির মূর্তি নিবদ্ধ দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পঙ্খের নকাশি সজ্জা ছাড়া একসারি দশাবতার ফলকও বিদ্যমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২৭' (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। এ মন্দিরে দশাবতারের মূর্তি

খোদাই কাঠের কপাটটি একান্তই আকর্ষণীয়।

বেড় জনার্দনপুর : 'পাথরা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে কাঁসাই নদী পেরিয়ে দক্ষিণে খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন বেড় জনার্দনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩৭৭)।এ গ্রামে মজুমদার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী লক্ষ্মীজর্নাদনের মাকড়াপাথরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠালিপি থাকা সত্ত্বেও সেটিতে ক্রমাগত চুনকামের ফলে তা পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। তবে স্থাপত্য নিরিখে মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে এক ঘেরা অঙ্গনের মধ্যে দুসারিতে যে পাঁচটি আটচালা শিব মন্দির দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে পুবের সারির দক্ষিণের মন্দিরটিতে নিবদ্ধ লিপিফলকের পাঠ নিম্নরূপ : "সকাব্দা ১৭০৯ স/ক সন ১১৯৪ সাল/তারিখ ২২ শ্রাবণ/দত্ত শ্রীজিতরাম ম/জুমদার। শ্রীনারা/য়ন ছুতার সাং পাথরা।" অতএব ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি নির্মাণে যে শিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন. তিনি তাঁর কৌলিক বৃত্তি অনুযায়ী পরিচিত ছিলেন।

বেলডাঙ্গা : 'চাঁইপাট' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে চন্দ্রেশ্বর খাল পেরিয়ে দাসপুর থানার এলাকাধীন চাঁইপাট মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ২১৬) বেলডাঙ্গা গ্রাম। এ গ্রামে স্থানীয়, রাজপণ্ডিত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী মদন গোপাল/জিউ সন ১২৩৯ সা/ল সকাব্দা ১৭/৫৪ মাহ ২৫ফা/ল্গুণ শ্রীইন্দ্রনারা/ন মণ্ডল সাং চাঁই/পাট শ্রীসরূপ মিস্ত্রি/সাং দাসপুর পং চেতুয়া।" অতএব ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটিতে বর্তমানে জগদ্ধাত্রীর পিতলের এক মূর্তি দেখা যায়।

বেলাড় : 'জামনা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় হাঁটাপথে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে পিংলা থানার অন্তর্গত বেলাড় গ্রাম (জে· এল· নং ১৭)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলো, জানা পরিবারের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায়, স্থাপত্য নিরিখে খ্রীস্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৫'৬" (৪·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০ মি·)।

বেলিয়াঘাটা : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন বেলিয়াঘাটা গ্রাম (জে· এল· নং ৫৬)। এ গ্রামের পুবপাড়ায় অধিকারী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী মদনগোপালের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটিতে সামান্য পঙ্খের কাজ ছাড়া আর কোনো অলঙ্করণ নেই। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫'৬" (৪·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

এ মন্দিরের সামান্য পুবে সরকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী শ্রীধরজীউর আটচালা মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও একসময়ে সেটির প্রবেশপথের উপরে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা। এ মন্দিরে প্রবেশপথের উপরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীধ/র জিউ/সকাব্দা/১৭০৭ সাল/১১৯৩ সাল।" অতএব ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ

মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)।

বেলুন : 'পিংলা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণপুবে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে পিংলা থানার এলাকাধীন বেলুন গ্রাম (জে· এল· নং ৪৭)। এখানে ঘোষ পরিবারের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে কোনো অলঙ্করণ-সজ্জা বা প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, স্থাপত্য বিচারে এটি যে উনিশ শতকের প্রথমভাগে নির্মিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২১′ (৬·৪ মি·) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ২৭′ (৮·২ মি·)। মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত।

এ গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় ঘোষ পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নাবস্থায় পতিত। তবে আকারপ্রকারে সেটিও উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

গ্রামের অদূরে যোগীরাণা নামক এক ভিটায় ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুব ও পশ্চিমমুখী শিবের দুটি শিখর-দেউল দেখা যায় এবং স্থাপত্য নিরিখে অনুমান এ দুটি মন্দির উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দির দুটি বর্তমানে ভগ্নাবস্থায় পতিত।

বেহারাসাই : 'কিয়ারচাঁদ' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখানকার পার্শ্ববর্তী কেশিয়াড়ী থানার এলাকাধীন গ্রাম বেহারাসাই (জে· এল· নং ২৮)। এ গ্রামে বাসুলী থান নামে একটি গাছের গোড়ায় পাথরের একটি সূর্যমূর্তি পূজিত হতে দেখা যায়। মূর্তিটি উচ্চতায় ২১/২′ (৭৬ সে· মি·) এবং ভাস্কর্য বিচারে এটি দশ-এগারো শতকের বলেই অনুমান করা যায়।

পূর্বোক্ত বাসুলী থানের সামান্য পুবে বালিবিল নামক স্থানে, ৬′৮″ (২ মি·) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ঝামাপাথরের একটি জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তি শায়িত অবস্থায় দেখা যায়। মূর্তিটি বর্তমানে দুটি অংশে বিভক্ত হলেও, সেটি যে দশ-এগারো শতকের প্রাচীন তা সেটির ভাস্কর্যশৈলী দেখে অনুমান করা যায়।

বৈকুণ্ঠপুর : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন বৈকুণ্ঠপুর (জে· এল· নং ৬৪)। এখানে নিম্বার্কমঠ আশ্রমের ঘেরা চত্বরের বাইরে পুবমুখী মদনমোহনের একরত্ন মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে প্রথাগত 'টেরাকোটা'-মূর্তি ভাস্কর্যের বদলে শুধুমাত্র লতাপাতার নকাশি-অলঙ্করণ দেখা যায়। কিন্তু এ মন্দিরে কোনো বিগ্রহ না থাকার কারণে, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরটির দেওয়ালে নিবদ্ধ পোড়ামাটির ফলকগুলি ক্রমশঃ নষ্ট হতে চলেছে। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে এটি আঠারো শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬′৮″ (৫·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

নিম্বার্ক মঠের সামান্য পুবে পশ্চিমমুখী বুড়ো শিবের সপ্তরথ শিখর-দেউলে সামান্য পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর তেমন কোনো ভাস্কর্য নেই। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

বৈচবেড়ে : 'তমলুক' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে তমলুক-শ্রীরামপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) তমলুক থানার অন্তর্গত

বৈঁচবেড়ে গ্রাম (জে· এল· নং ২০৮)। জনশ্রুতি যে, তমলুক রাজাদের এটি ছিল প্রাচীন বসতি। সেজন্য এই গ্রামে রাজাদের সেই বাস্তুভিটাকে বৈঁচবেড়ে গড়ও বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন এই গড় এলাকায় উত্তরমুখী ইঁটের একটি নবরত্ন ও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরগুলিতে কোনো পোড়ামাটির অলঙ্করণ নেই এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দির দুটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে আকারপ্রকারে এ মন্দির দুটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। নবরত্ন মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩০′ (৯·১ মি·), প্রস্থে ২৫′৬″ (৭·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)। অন্যদিকে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২২′ (৬·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দির দুটির পাশাপাশি একটি দালান-মন্দিরে কষ্টিপাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায়, যেটির নির্মাণকাল আনুমানিক দশ-বারো শতক।

বৈদ্যনাথপুর : 'চন্দ্রকোণা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরপুবে মিত্রসেনপুর পল্লীর লাগোয়া চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন বৈদ্যনাথপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৮৫)। এ গ্রামে শীতলানন্দ শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাবে সামান্য পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর কোনো সজ্জা নেই। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৯′ (৫·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)।

ব্রাহ্মণখলিশা : খড়্গপুর-কাঁথি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জাহালদা; সেখান থেকে দক্ষিণে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁতন থানার এলাকাধীন ব্রাহ্মণখলিশা গ্রাম (জে· এল· নং ৩১০)। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলো, সিদ্ধেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী ইঁটের শিখর-দেউল। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ছাড়াও ইংরেজ সাহেবদের কিছু মূর্তিও দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরটিতে কাঠ-খোদাইযুক্ত একটি দরজাও আছে, যা দারু-ভাস্কর্যের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৯′৬″ (৫·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০ মি·)।

ব্রাহ্মণগ্রাম : গড়বেতা শহর বা গড়বেতা রেল-স্টেশন থেকে গড়বেতা-গোয়ালতোড় সড়কে (নিয়মিত বাস ও রিক্সা চলে) ঝাড়বনী ; সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটা পথে প্রায় ১′ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রাম (জে· এল· নং ৫১৩)। এ গ্রামে ঘটক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামচাঁদের পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মাকড়াপাথরে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১২′ (৩·৭ মি·)। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে, তবে স্থাপত্য বিচারে এটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

ব্রাহ্মণবসান : 'কলমীজোড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পলাশপাই খাল পেরিয়ে কলমীজোড়-খানখাল মোরাম রাস্তায় পশ্চিমে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন ব্রাহ্মণবসান গ্রাম (জে· এল· নং ১১১)। এখানকার প্রধান পুরাকীর্তি, মণ্ডলপাড়ায় মণ্ডল পরিবারের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। এ মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ

হয়েছে কৃষ্ণলীলা কাহিনীর মাথুর, দধিমন্থন, পুতনাবধ এবং রামসীতা, দুর্গা, কালী ও লঙ্কাযুদ্ধ প্রভৃতি 'টেরাকোটা'-ফলক। এছাড়া এখানে নিবদ্ধ অর্জুনের লক্ষভেদ বিষয়ক ফলকটি একান্তই উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৪′ (৪·৪ মি·), প্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিচারে এটি আঠারো শতকের শেষে নির্মিত বলেই অনুমিত হয়।

গ্রামের শিবতলায় ভুবনেশ্বরজীউর যে পশ্চিমমুখী আটচালা শিব মন্দিরটি দেখা যায়, সেটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে সেটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমান। মন্দিরটিতে কোনো অলঙ্করণ-সজ্জা নেই বটে, তবে প্রবেশপথের দুধারে নিবদ্ধ হয়েছে দুটি দ্বারপালের মূর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

উল্লিখিত এ মন্দিরটির লাগোয়া শীতলার একটি পুবমুখী দালান-মন্দিরের সম্মুখভাগে পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ নানাবিধ নকাশি-অলঙ্করণ রয়েছে। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দুপাশে নিবদ্ধ হয়েছে দুটি পোড়ামাটির বেহালাবাদিকার মূর্তি এবং এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সকাব্দা ১৭৮৯/সন ১২৭৪ সাল/তারিখ ১ জ্যেষ্ঠ।" অতএব ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১০′ (৩·১ মি·), প্রস্থে ১২′ (৩.৭ সে. মি) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

ভগবানপুর : 'বেঁউদিয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে সামান্য উত্তরে ভগবানপুর থানার সদর (জে· এল· নং ৮৫)। এখানের সৈয়দবাজার এলাকায় রুদ্রেশ্বর শিবের পুবমুখী ইটের সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। একদুয়ারী এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·২মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে আকারপ্রকারে মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষদিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পুবে চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণাকালীর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ দেবালয়ের ত্রিখিলান অলিন্দের ছাদ অর্ধবৃত্তাকার খিলানের দ্বারা এবং গর্ভগৃহের ছাদ পাশ-খিলানের উপর রক্ষিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১′ (৬·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)। এ মন্দিরের দুপাশে দুটি একদুয়ারী দক্ষিণমুখী আটচালা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ দুটি মন্দিরই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ·১২′ (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭·৬ মি·)। আলোচ্য এ তিনটি মন্দিরেই কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে স্থাপত্যবিচারে এগুলি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

ভট্টগ্রাম : 'ব্রাহ্মণগ্রাম' থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটা পথে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার এলাকাধীন ভট্টগ্রাম (জে এল· নং ৩৯৯)। এ গ্রামে ভট্টাচার্য পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরজীউর দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ যে অলঙ্করণ দেখা যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, শিবের দক্ষযজ্ঞ ও সতীকাঁধে ত্রিশূল হাতে শিব এবং অন্নপূর্ণা প্রভৃতি। এছাড়া দশাবতার ও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন কাহিনী সম্বলিত মূর্তি-ফলকও নিবদ্ধ রয়েছে এই মন্দিরে। মহাভারত কাহিনী থেকে আহৃত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও অর্জুনের লক্ষ্যভেদ

ফলকটিও বেশ চিত্তাকর্ষক। সবশেষে স্তম্ভমূলে ইংরেজ সাহেবদের শিকারদৃশ্যের 'টেরাকোটা'-ফলকও এ মন্দিরের আর এক আকর্ষণ। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬'৯" (৫·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·১ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরটির পশ্চিমপাশে ঐ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী আর একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির দেখা যায় এবং সেটিতে নিবদ্ধ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯' (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৮' (৫·৫ মি·)।

ভবানীপুর : ঘাটাল – চন্দ্রকোণা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শিলাবতী নদী তীরবর্তী চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রাম (জে· এল· নং ২১১)। এ গ্রামের দ্রষ্টব্য হল, পুবমুখী শীতলানন্দ শিবের একটি আটচালা মন্দির। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পদ্ম-পলস্তারায় উৎকীর্ণ নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া উত্তর দিকের দেওয়ালে দুটি মিথুন ও বাতায়নবর্তিনীরও মূর্তি দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২০' (৬·১ মি·), প্রস্থে ১৮' (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০ মি·)।

ভৈরবপুর : 'বসনছোড়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার ভৈরবপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৫৫)। এ গ্রামের উকিলপাড়ায় ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গঙ্গাধর শিবের দক্ষিণমুখী শিখর-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি দেখা যায় সেটির পাঠ নিম্নরূপ :"৭শ্রীশ্রী ৬ শিব/ঠাকুর/সকাব্দা ১৭৯১ ।/বাং·সন ১২৭৬ সাল / ইং সন ১৮৬৯।৭০ সন/দস্ত/ শ্রীচিন্তামনি ঘোষ/পংবগড়ি চলীত ১২৭৭ সন/কৃত শ্রীশুবল মিস্ত্রি।" অতএব এ মন্দিরটিতে শকাব্দ ও বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রীস্টাব্দের উল্লেখ একান্তই অভিনব।

আলোচ্য এ মন্দিরটির কাছাকাছি দামোদরের ন'চূড়া রাসমঞ্চটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ রাসমঞ্চের আটটি কোণের প্রতিটি স্তম্ভে দুটি করে পোড়ামাটির বাদিকামূর্তি দেখা যায়। এটির উত্তর পশ্চিম কোণে নিবদ্ধ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, এটি ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

এই রাসমঞ্চটির সামান্য উত্তরে এক ঘেরা চত্বরের মধ্যে অবস্থিত দামোদরের দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরটিতে একসময়ে বেশ পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু সংস্কারকালে সেগুলি বিনষ্ট হয়। এ মন্দিরের পুব পাশে গগনেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী এবং পশ্চিম পাশে বিশ্বম্ভর শিবের দক্ষিণমুখী দুটি শিখর-মন্দির দেখা যায়। এ তিনটি মন্দিরেই কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় যে, এগুলি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।

এ মন্দির চত্বরের সামান্য পশ্চিমে ঘোষ পরিবারের দামোদরের দক্ষিণমুখী এক আটচালা মন্দির দেখা যায় এবং মন্দিরটিতে সামান্য পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫' (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন, এ মন্দিরটিও আনুমানিক উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় গড়গড়ানাথ শিবের মন্দিরটির আশপাশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা

আমলকশিলার ভগ্নাংশ দেখে অনুমান করা যায় যে, অতীতে এখানে হয়ত কোন পীঢ়া বা শিখর-মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল।

মৎনগর : 'বেহারাসাই' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে ১ কিলোমিটার দূরত্বে কেশিয়াড়ী থানার এলাকাধীন মৎনগর গ্রাম (জে· এল· নং ২৭)। এ গ্রামের মনসাতলা নামে খ্যাত একটি বটগাছের তলায় পাশাপাশি রক্ষিত মুগনীপাথরে নির্মিত দুটি বিষ্ণুমর্তি এখানকার এক পুরাসম্পদ । এর মধ্যে বৃহৎ মূর্তিটি উচ্চতায় ৭'৬" (২·২ মি·) এবং অপর মূর্তিটি উচ্চতায় ৩'৮" (১·১ মি·)। এ মূর্তি দুটির আশপাশে মাকড়া পাথরের নানাবিধ আকারের অংশ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকায় অনুমান করা যায় যে, কাছাকাছি হয়ত কোন শিখর বা পীঢ়া দেউলের অস্তিত্ব ছিল।

গ্রামের শিব মাড়োয় কংসেশ্বর শিবের পাথরের আটকোণা স্তম্ভযুক্ত লিঙ্গটি বেশ প্রাচীন বলেই অনুমান করা যায় এবং সেটি গ্রামবাসীদের মতে পাশাপাশি কিয়ারচন্দ্র গ্রাম থেকে আনীত। এছাড়া এ শিবলিঙ্গটির পাশে যে মাকড়া পাথরের প্রায় ৭' (২·১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট মূর্তিটি দেখা যায়, সেটি বিশেষভাবে ক্ষয়িত হওয়ার জন্য সেটি যে কি মূর্তি তা জানা যায় না। এ গ্রামটির আশপাশে বহু পাথরের আমলকশিলার অবস্থান দেখে অনুমান যে, হয়ত এখানে একদা কোন প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মধ্যবাড় : বালীচক – দেহাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জামুয়া ; সেখান থেকে পশ্চিমে হাঁটাপথে ১/২ কিলোমিটার দূরত্বে পিংলা থানার এলাকাধীন ধনেশ্বরপুর মধ্যবাড় মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৯৭) মধ্যবাড় গ্রাম। এ গ্রামে স্থানীয় কুইল্যা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এখানের এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক দেবদেবীর 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ থাকলেও, পশ্চিম দেওয়ালে দুটি মিথুন ফলক উৎকীর্ণ হয়েছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৪'৬" (৪·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, আকারপ্রকারে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

মনিনাথপুর : 'কঁয়তা' নিবন্ধে মনিনাথপুর পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন গ্রাম মনিনাথপুরের (জে· এল· নং ৪৯১) প্রধান পুরাকীর্তি হল, অধিকারী পরিবারের গোপীনাথ ও রঘুনাথের পুবমুখী ইঁটের একরত্ন মন্দির। অলঙ্করণহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮' (৫·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য বিচারে এটি যে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল এমন অনুমান করাযেতে পারে।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পুবে চৌধুরী পরিবারের পুবমুখী রঘুনাথ ও মহাপ্রভুর শিখর-মন্দিরটির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য হলেও সেটি অর্ধশতাব্দী পূর্বে নির্মিত হওয়ায় বর্তমানে পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে না।

মনোহরপুর : ঘাটাল – রানীচক মোরাম রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার পূর্বে ঘাটাল থানার মনোহরপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৫৪)। এ গ্রামের সিংহ পাড়ায় সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি একটি দালান-মন্দিরের উপর স্থাপিত,যার তুল্য উদাহরণ ইতিপূর্বে আলোচিত ঈশ্বরপুর, পাইকভেড়ি ও পিঙ্গলা প্রভৃতি

স্থানে দেখা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২১′ (৬·৪ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.১ মি·)। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

গ্রামের দালাল পাড়ায় শ্যামসুন্দরের বর্তমান দালান-মন্দিরটি পরবর্তীকালে নতুন করে নির্মিত হলেও, এর ন'চূড়া রাসমঞ্চটি একান্তই উল্লেখযোগ্য।রাসমঞ্চের পুবদিকে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী আটচালা শিব মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি বর্তমানে বিনষ্ট হলেও, আকারপ্রকারে সেটিও উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় আনুমানিক ১০′ (৩·১ মি·)।

এ মন্দিরের পুবদিকে বুড়ো শিবের দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটিও এক পুরাকীর্তি এবং এ মন্দিরের ভিতরের পরিসর আটকোণা করে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৭′৬″ (২·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে এ মন্দিরটিও উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।

এছাড়া এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক কাছাকাছি দুটি পশ্চিমমুখী জোড়া আটচালা এবং একটি দক্ষিণমুখী দোতলা দালান-মন্দিরও এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

মনোহরপুর বাজারে শীতলানন্দ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯.১ মি.) এ মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

মনোহরপুর : খড়্গপুর – দাঁতন পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস বলে) মোগলমারী ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁতন থানার এলাকাধীন মনোহরপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৭৪)। এ গ্রামে স্থানীয় বীরবর পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের পুবমুখী পীঢ়া জগমোহনসহ পঞ্চরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। একদুয়ারী মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭·৬ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে মন্দিরটি স্থাপত্য বিচারে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। কাছাকাছি, অনন্তপুরুষোত্তমের পুবমুখী পীঢ়া জগমোহনসহ পঞ্চরথ শিখর-দেউলটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

গ্রামের শীতলা দেবীর পুবমুখী এক দালান মন্দিরে আনুমানিক ১০ – ১১ শতকের একটি জৈন ঋষভনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

ময়না : 'তমলুক' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তমলুক শ্রীরামপুর অথবা মেছেদা-শ্রীরামপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ময়না থানার এলাকাধীন গড় ময়না মৌজাভুক্ত ময়না (জে· এল· নং ২০৭)। ময়নার ভূস্বামী বাহুবলীন্দ্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত এবং পরিখাবেষ্টিত গড়ের মধ্যে অবস্থিত শ্যামসুন্দরের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′(৭ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই ; সুতরাং আকারপ্রকারে সেটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পাশাপাশি লোকেশ্বর শিবের মন্দির স্থাপত্যটি বেশ অভিনব। এ মন্দিরটি পুবমুখী এক ইটের দালানের উপর স্থাপিত আটচালা মন্দির।

মন্দিরটির স্তম্ভমূলে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে সেকালের নৌবহর ও বিদেশীদের শিকারযাত্রার দৃশ্য প্রভৃতি। দৈর্ঘ্যে মন্দিরটি ২৬′ (৭·৯ মি·), প্রস্থে ২৫′ (৭·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি, স্থাপত্য বিচারে আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

মলিঘাটি : ডেবরা থানার এলাকাধীন 'জয়কৃষ্ণপুর নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন মলিঘাটি গ্রাম। (জে· এল· নং ৯২)। এ গ্রামের ভূস্বামী কৃষ্ণমোহন চৌধুরী নির্মিত দক্ষিণমুখী দ্বাদশটি আটচালা রীতির মন্দির এক পুরাকীর্তি। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরগুলি যে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণমোহন চৌধুরী কর্তৃক নির্মিত তা প্রতিটি মন্দিরে নিবদ্ধ পিতলের পাতে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। এখানকার সবকটি মন্দিরই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

চৌধুরী পরিবারের এ মন্দিরগুলির সামান্য পুবে কাঁসাই-এর শাখা নদীর তীরবর্তী রক্ষিত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী একটি একরত্ন মন্দির ভগ্নাবস্থায় দেখা যায়, যা স্থাপত্য বিচারে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলেই অনুমান।

এ ছাড়া এ মন্দিরের সামান্য দক্ষিণে গোস্বামী পরিবারের দক্ষিণমুখী বৃন্দাবনচন্দ্রের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অলঙ্করণবিহীন এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "সকাবদা ১৭৬৬ সাল/শ্রীশ্রীবিন্দাবন চন্দ্র জিউ/পরিচারক শ্রী গদাধর দা/স ভুক্ত। সাং গোপালনগর/পঃ চেতুয়া সন ১২৫২ সাল/তারিখ ১৩ পোষ।"

অতএব ১৮৪৪-৪৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

মহাকালপোতা : পাঁশকুড়া – ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সুলতাননগর থেকে পুবে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন মহাকালপোতা গ্রাম (জে· এল· নং ১৭৮)। এ গ্রামে বাণেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে নিবদ্ধ হয়েছে কৃষ্ণের পুতনা ও কংস বধ, বস্ত্রহরণ, রামরাবণের যুদ্ধ, দশাবতার ও রামসীতা প্রভৃতি টেরাকোটা ফলক। এছাড়া এ মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ "শ্রীশ্রীসিব/সন ১২/২৬ সাল/মন্দির সাঙ্গ।" অতএব ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

মহিষাদল : মেছেদা – হলদিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মহিষাদল থানার এলাকাধীন গড়-কমলপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১১২) মহিষাদল সদর। মহিষাদল-রাজ পরিবারের পুরাতন গড়বাড়ির ভিতর রানী জানকীর প্রতিষ্ঠিত গোপালের পুবমুখী নবরত্ন রীতির মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে যে উৎসর্গলিপিটি আছে সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শুভমস্তু ১৭০০ শকে শ্রীনৃপানন্দলাল/স্যপত্নী শ্রী জানকীতিয়া দ্বন্দ্ব ত্রয়োবিং/শ শনো দিশেসু নবরত্নকং দদেস/পু দশসত শকে গোপাল রায় তৎ/গঠান্ত শ্রী পাচুলাল মিস্ত্রীরে।"

অতএব ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৮′ (১১·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৭০′ (২১·৩ মি·)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে এ ধরনের বিরাটাকার

নবরত্ন মন্দির এ জেলায় বিরল।

মহিষাদলের নতুনবাজার এলাকায় মহিষাদলের ভূস্বামী গর্গ পরিবারের জগন্নাথ গর্গের সহধর্মিণী ইন্দ্রাণী দেবী যে আটকোণা সতের চূড়াবিশিষ্ট বিরাটাকার রাসমঞ্চটি নির্মাণ করেন সেটি ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত যা ঐ রাসমঞ্চে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়।

বর্তমান মহিষাদল-রাজবাড়ির অস্ত্রাগারে যে দুটি মূল্যবান নিদর্শন আছে, তা হল বৈরাম খার নামাঙ্কিত একটি তরবারি ও কবি ফারদৌসী রচিত মোগলযুগের চিত্রকলা সমন্বিত 'শাহনামা' গ্রন্থ।

মাগুরুল ঃ পাঁশকুড়া-সুলতানপুর পিচের সড়কে সুলতানপুর ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন মাগুরুল গ্রাম (জে·এল·নং ১৭৬)। এ গ্রামে বিশ্বেশ্বর শিবের দক্ষিণমুখী একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। একদা এ মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু সংস্কারের ফলে সেগুলি বর্তমানে বিনষ্ট। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬' (৪·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

মাঙলই : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া- মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পাঁশকুড়া বাজারের কাছ থেকে উত্তরে কাঁসাই নদীর বাঁধে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন মাঙলই শ্যামবল্লভপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ২৪) মাঙলই গ্রাম। এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল, মাইতি পরিবারের গৃহদেবতা রাধাদামোদরজীউর পঞ্চরত্ন মন্দির ও একটি সতের চূড়া রাসমঞ্চ। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং সেটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ-সজ্জা রয়েছে। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে এ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সতের চূড়া রাসমঞ্চটি একান্তই দ্রষ্টব্য। তিনটি ধাপে নির্মিত আটকোণা এ রাসমঞ্চটির চতুর্দিকে কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত 'টেরাকোটা'-ফলকসজ্জা দেখা যায়, যা এ জেলার এক বিরল উদাহরণ বলা যেতে পারে। এছাড়া প্রতিটি খিলানের স্তম্ভে নিবদ্ধ হয়েছে বিরাটাকার নিরেট পোড়ামাটির মূর্তি এবং এটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলকটিতে ইংরেজী সালের উল্লেখ একান্তই কৌতূকাবহ। সে লিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধা দামোদর জীউ/শুভমস্তু সকাব্দাঃ/১৭৮০ সক সন ১২/৬৬ সাল। ইঙ্গরাজী/সন ১৮৫৯ সাল/শ্রীঠাকুর দাস/মাইতি।" তবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এমন একটি সুসজ্জিত রাসমঞ্চ ক্রমশই বিনষ্ট হতে চলেছে।

মায়তা : 'কৃষ্ণনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার এলাকাধীন মায়তা গ্রাম (জে· এল নং ৩৯৫)। এখানকার বকুলকুঞ্জ নামক স্থানে দুটি রাসমঞ্চ দেখা যায় এবং প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে কৃষ্ণনগর থেকে কৃষ্ণরায়জীউর বিগ্রহ এখানে আনা হয়।

এছাড়া মায়তা গ্রামের পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বও রয়েছে। শিলাবতী ও পুরন্দর নদের সংযোগস্থলে অবস্থিত গ্রামটি এক উঁচু ঢিবির উপর অবস্থিত, যার চতুর্দিকে শুধু অসংখ্য

খোলামকুচি। কয়েক বৎসর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকালে খ্রীস্টীয় বারো শতকের একটি বরাহমূর্তি ও খ্রীস্টীয় দশ শতকের কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান একটি জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের মূর্তি এবং সেইসঙ্গে বেশ কিছু প্রাচীন মৃৎপাত্রও আবিষ্কৃত হয়। ভবিষ্যতে এই প্রত্নস্থলটি সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

মারকুণ্ডা : খড়্গপুর – কেশিয়াড়ী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) খাজরা থেকে দক্ষিণ-পুবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন মারকুণ্ডা গ্রাম (জে· এল· নং ৫০)। এ গ্রামে মারিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের পুবমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই। মন্দিরটির খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী লক্ষিজনার্দন জিউ চরণে স/দত স্বরণং সন ১২৮৬ শাল তাং ৬ মাঘ।" অতএব ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির কাঠখোদাই শোভিত কাঠের দরজাটিতে উৎকীর্ণ হয়েছে কৃষ্ণরাধা ও বেহালা বাদিকার মূর্তি প্রভৃতি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬'৬" (৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·)।

মারণদিঘি : 'মৎনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে উত্তরে ১ কিলোমিটার দূরত্বে কেশিয়াড়ী থানার এলাকাধীন মারণদিঘি গ্রাম (জে এল· নং ২৪), যা স্থানীয়ভাবে মড়াদিঘি নামেও পরিচিত। এখানে গরামচণ্ডীর থানে একটি মাকড়া পাথরের জৈন ঋষভনাথ মূর্তি দেখা যায়, যেটি উচ্চতায় ৪'৪" (১·৩ মি·) এবং ভাস্কর্যশৈলীর বিচারে এটি খ্রীস্টীয় দশ-এগারো-শতকের বলেই অনুমান।

এছাড়া এ মূর্তির পাশে ক্লোরাইট পাথরে নির্মিত আরও যে একটি মূর্তি দেখা যায় সেটি সম্ভবতঃ লোকেশ্বর বিষ্ণুর মূর্তি বলেই অনুমান। মূর্তিটি উচ্চতায় ২'৭" (৭৯ সে·মি·) এবং ভাস্কর্যবিচারে এটিও খ্রীস্টীয় দশ-এগারো শতকের বলেই অনুমান।

মালঞ্চ : 'চণ্ডীপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে সামান্য উত্তরে খড়্গপুর থানার এলাকাধীন 'মালঞ্চ' গ্রাম (জে· এল· নং ১৩১)। এখানে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণাকালীর দক্ষিণমুখী ইঁটের আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ রামরাবণের যুদ্ধ দৃশ্যটি একান্তই দর্শনীয়। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এবং মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৫'৬" (৭·৭ মি·), প্রস্থে ২৩' (৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫·২ মি·)। বর্তমানে এ মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

এ পল্লীর উত্তরপ্রান্তে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নন্দেশ্বর শিবের মাকড়া-পাথরের পশ্চিমমুখী পীঢ়া জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরের প্রবেশপথের উপরিভাগে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শুভমস্তু সকাব্দা/১৬৪১ সাল/সন ১১২৭ সাল/শঙ্কর শঙ্করি/পদে সদা অভিলাষ/লক্ষ্মীসহ গোবিন্দে/রাখহ পুরি আষ।" অতএব ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটিতে সামান্য পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ দেখা যায় এবং মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·)। অত্যন্ত দুঃখের কথা, এমন একটি প্রাচীন মন্দির সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে

ক্রমশই ধ্বংসের পথে চলেছে।

মীর্জাপুর : 'নৈপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে পটাশপুর থানার এলাকাধীন মীর্জাপুর গ্রাম (জে· এল, নং ১৭১)। এ গ্রামে দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরটি দক্ষিণমুখী শিখর-দেউল এবং এ দেউল সংলগ্ন একটি চারচালা জগমোহনও দেখা যায়। জগমোহনের দু দেওয়ালে সামান্য যে পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়, সেগুলির বিষয়বস্তু লঙ্কাযুদ্ধ, দশাবতার ও মহন্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রভৃতি। এ মন্দিরে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিচারে এটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে মনে হয়। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ৯′ (২·৭ মি·), প্রস্থে ৫′ (১·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)।

মুকসুদপুর : মেদিনীপুর – ডেবরা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বসন্তপুর ; সেখান থেকে উত্তরে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর থানার এলাকাধীন মুকসুদপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৪৭৮)। কাঁসাই নদী তীরবর্তী এ গ্রামে ভূঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ হয়েছে। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২০′৬″ (৬ মি·) এবং উচ্চতায় আনুমানিক ৪০′ (১২·১ মি·)।

এ মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণে উক্ত ভূঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী কাশীনাথ শিবের চারচালা জগমোহনসহ একটি শিখর-দেউলও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৭′৬″ (২·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ৬′৬″ (১·৯ মি·), প্রস্থে ৩′৮″ (১·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′(৪ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

মেঘুলা : মেদিনীপুর-গড়বেতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) গড়বেতা শহর ; সেখান থেকে উত্তরে শিলাবতী পার হয়ে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার এলাকাধীন মেঘুলা গ্রাম (জে· এল· নং ৫৪৫)। এ গ্রামে ঘোষ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী দামোদরজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে সামান্য পঙ্খ সজ্জা ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ নেই এবং এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক সংস্কারফলক থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে পাত্র পরিবারের দক্ষিণমুখী দামোদরের আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের ভিত্তিবেদীতে খোদিত প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী৺ দামোদর জীউ শকাব্দা ১৮০৮ তারিখ ২৪· শে বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত মালিক শ্রীভোলানাথ পাত্র /শ্রী প্রেমচাঁদ মিস্ত্রি সাং বৈতল।" অতএব ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি নির্মাণে যে স্থপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর নিবাস যে বৈতল গ্রামে ছিল, তা এই প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′৬″ (৩·২ মি·) ও

উচ্চতায় প্রায় ১৫' (৪·৬ মি·)।

মেদিনীপুর শহর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেদিনীপুর স্টেশনে নেমে কিংবা ঐ রেলপথের খড়গপুর স্টেশন থেকে খড়গপুর মেদিনীপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) এই শহরে পৌঁছানো যায়। মেদিনীপুর সদর থানার অন্তর্গত এই প্রাচীন শহরটির সীমা বিবরণ দিয়ে যে সংস্কৃত শ্লোকটি প্রচলিত আছে সেটি হল :

"আবাসবাটী যৎউত্তরশ্যাম
গোপশ্চ যৎ পশ্চিমদিগ্বিভাগে।
কংসাবতী ধাবতি দক্ষিণে চ
সা মেদিনীনাম পুরী শুভেয়ম্।"

অর্থাৎ মেদিনীপুর নগরীর উত্তরে আবাসবাটী, পশ্চিমে গোপগিরি এবং দক্ষিণে কংসাবতী নদী।

বাস্তবিকপক্ষে মেদিনীপুর শহরটি যে কতদিনের প্রাচীন তা সঠিক জানা না গেলেও, আইন-ই-আকবরীতে সরকার জলেশ্বরের অধীন এটিকে এক সুবৃহৎ নগরী বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরটিই জেলার প্রধান কেন্দ্র বলে ঘোষিত হয়। তবে এই প্রাচীন শহরটির নানাস্থানে যেসব পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নির্দশন ছড়িয়ে আছে সেগুলির সংখ্যাও কিন্তু কম নয়।

মেদিনীপুর শহরের পুব-দক্ষিণ প্রান্তে কাঁসাই নদী তীরবর্তী নতুনবাজার পল্লীতে পুবমুখী পঞ্চরত্ন এক কালী মন্দির ছাড়াও, এখানকার উত্তরমুখী এক গম্বুজ মসজিদটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। আলোচ্য এ মসজিদটির গম্বুজের গঠনপ্রণালী দেখে অনুমান করা যায় এটি সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় ষোলো শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে।

নতুনবাজার এলাকার সামান্য পশ্চিমে সুজাগঞ্জ পল্লীর ভীমতলা চক। এখানে জগন্নাথের দক্ষিণমুখী নবরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মূল মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে চারচালা রীতির এক জগমোহন। মন্দিরটিতে সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও, পঙ্খের নকাশি-ভাস্কর্যও দেখা যায়। এ মন্দিরের কাঠের দরজাটির পাল্লার উপর দশাবতারের মূর্তি সম্বলিত খোদাইকাজ একান্তই মনোরম। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীজগন্নাথ বাসার্থং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরং/শ্রীজগন্নাথ পদাব্জাস্তৈঃ তাম্বুলিনি করৈঃ কৃতং/শুভমস্তু সকাব্দা ১৭৭৩।" অতএব ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১' (৬·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৭৩' (২২·২ মি·)।

শহরের বড়বাজার এলাকায় প্রায় ১৫ মি· উচ্চতাবিশিষ্ট শীতলার পশ্চিমমুখী এক শিখর-দেউল দেখা যায়। স্থাপত্য বিচারে এটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

বড়বাজারের ধর্মমন্দির গলিতে উত্তরমুখী ধর্ম ঠাকুরের এক জোড়বাংলা মন্দির দেখা যায়। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে এই মন্দিরটির অনুরূপ আর একটি মন্দিরও এই শহরের মীর্জাবাজারে অবস্থিত এবং প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও আকারপ্রকারে এটিও উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

এ শহরের শিববাজার এলাকায় মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তজীউর একটি পুবমুখী নবরত্ন মন্দির এখানকার এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশপথের উপরিভাগে নিবদ্ধ রয়েছে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পোড়ামাটির নানাবিধ

ভাস্কর্য-ফলক। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে আকার প্রকারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৯'৮" (৬ মি·) প্রস্থে ১৮'৯" (৫·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·১ মি·)। এছাড়া এ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিববাজারে আটচালা রীতির দ্বাদশ শিবমন্দির ও একটি রাসমঞ্চও দেখা যায়।

পাশাপাশি মীরবাজার পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত এক গম্বুজবিশিষ্ট টিকিয়া মসজিদটির চারকোণে চারটি মিনার সংস্থাপন করায় এটি এক অভিনব স্থাপত্যকীর্তিতে পরিণত হয়েছে। ৪' (১·২ মি·) চওড়া দেওয়ালযুক্ত এ মসজিদটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৩'৪" (৭·১ মি) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)।

মীরবাজারে পীড়ি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহদাকার আটকোণা রাসমঞ্চও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, এখানে হনুমানজীর মন্দির নামে খ্যাত পুবমুখী রাধাকান্তের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এখানের এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। এ মন্দিরটির দোতলা-দালানের উপরিভাগে বাঁকানো চালের উপর সংস্থাপিত পাঁচটি চূড়ার জন্য মন্দিরটি পঞ্চরত্ন রীতির এক অভিনব স্থাপত্যের নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা রামোপাসক এক সন্ন্যাসী এ মন্দিরে হনুমানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যই পরবর্তীকালে এ মন্দির হনুমান মন্দির নামে খ্যাত হয়। পঙ্খের সামান্য অলঙ্করণযুক্ত এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই বটে তবে স্থাপত্য বিচারে এটি আঠারো শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৫'৪" (৭·৭ মি·), প্রস্থে ২০'৮' (৬·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

শহরের অলিগঞ্জে পুবমুখী তিনগম্বুজ দেওয়ানখানা মসজিদটি এক দ্রষ্টব্য। কিংবদন্তী যে, এ মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আওরঙ্গজেব বাদশাহের দেওয়ান কেফায়েৎউল্লা. যেজন্য এটি দেওয়ানখানা মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫৬' (১৭·১ মি·), প্রস্থে ২৫' (৭·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মসজিদটি স্থাপত্যশৈলী বিচারে সতের শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হওয়াই সম্ভব।

মেদিনীপুর শহরের কর্ণেলগোলা এলাকায় একসময় পাথরের নির্মিত যে দুর্গটি ছিল, তা আজ এক ধ্বংসাবশেষে পরিণত হলেও সেটি এক প্রাচীন পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, মেদিনীপুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা মেদিনীকরই ছিলেন এই দুর্গটির নির্মাতা। কিন্তু এ কিংবদন্তীর পিছনে কতটা সত্য নিহিত আছে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, মোগল রাজত্বে এটি দুর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পরে মারাঠারাও এটি দখল করে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে এটি এক সেনানিবাস ও পরে এটি জেলখানায় রূপান্তরিত হয়।

আলোচ্য এই পুরানো কেল্লার পুবদিক লাগোয়া পশ্চিমমুখী মাকড়া পাথরের এক গম্বুজ একটি মাজার দেখা যায়। সম্ভবতঃ মোগল রাজত্বকালেই হজরত শাহ মুস্তফা মদনী রহমতুল্লাহ আলায়হের এই মাজারটি এখানে নির্মিত হয়ে থাকবে।

মেদিনীপুর শহরের মধ্যস্থলে বিবিগঞ্জ পল্লীতে দেবী দুর্গার এক সুউচ্চ শিখর-দেউল অবস্থিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকার প্রকারে আঠারো শতকের মধ্যভাগে সম্ভবতঃ নির্মিত হয়ে থাকবে।

শহরের পাটনাবাজার এলাকায় মহাপ্রভুর পশ্চিমমুখী একটি আটচালা মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের মতে, এ মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষদিকে নির্মিত। এছাড়া এই পল্লীতে স্থানীয় সাউ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শীতলানন্দ শিবের একটি

দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরও দেখা যায়। এ মন্দিরে যে দুটি প্রতিষ্ঠালিপি নিবদ্ধ রয়েছে তার পাঠ নিম্নরূপ : (বাঁদিকে) "সন ১২৩৩ বাং সন ১২৩৫/ মাহ মাগ ২০ তারিকে সমা/পতঃ শ্রীঅমরা মিস্ত্রি খী... ২৮/সাং মিরজাবাজার" ; (ডানদিকে) "সকাবদা ১৭৫০/ শ্রীতিতু সাউ কোলু সত্তারশও পঞ্চাশ/সাকিম বক্সিবাজার।" অতএব ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি নির্মাণে যে দুটি বঙ্গাব্দ দেওয়া হয়েছে, সম্ভবত সেগুলি আরম্ভ ও সমাপ্তি সন।

এ শহরের খাপরেল বাজার এলাকায় পুবমুখী যে শিবের সপ্তরথ শিখর-দেউলটি দেখা যায়, তার সামনের দেওয়ালে বেশ কিছু পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে।

এ মন্দিরটির সামান্য পশ্চিমে সিপাইবাজার এলাকায় সাধল বা চোল শাহ নামে পরিচিত পুবমুখী যে এক-গম্বুজ মসজিদটি দেখা যায়, সেটি যে সম্রাট শাহজাহানের আমলে নির্মিত তা সে মসজিদে উৎকীর্ণ এক পাথরের লিপি থেকে জানা যায়।

পূর্ববর্ণিত কেল্লার সামান্য উত্তরে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষায় 'বিদ্যাসাগর মন্দির' নির্মিত হয়। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই স্মৃতি মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং এ ভবনের উদ্বোধন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোচ্য এই ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর শাখার উদ্যোগে যে প্রত্নবস্তুর সংগ্রহশালাটি আছে, সেখানে সংগৃহীত হয়েছে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকের শশাঙ্কের প্রদত্ত দুটি তাম্রশাসন, পাথরের জৈন ও বুদ্ধ মূর্তি, মন্দির-টেরাকোটা-ফলক, ফারসী অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি, পোড়ামাটির শীলমোহর, মুদ্রা এবং সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি প্রভৃতি। এ ভবনের এক অংশে প্রতিষ্ঠিত ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থাগারটি বহু মূল্যবান পুস্তকে সমৃদ্ধ।

মেদিনীপুর জজকোর্টের দক্ষিণপুব কোণে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব কালেকটর জন পিয়ার্স সাহেবের যে সমাধি-স্তম্ভটি আছে, সেটিও এ শহরের এক অন্যতম পুরাকীর্তি। প্রায় দুশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এ সমাধি-স্তম্ভটিতে ইংরেজি ও বাংলায় উৎকীর্ণ শিলালিপিটি বর্তমানে অপসারিত। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' রচয়িতা যোগেশচন্দ্র বসু সে লিপিটির যে পাঠোদ্ধার করেছিলেন তার বাংলা অংশ নিচে দেওয়া গেল : "শ্রীরাম/ মেস্ত্র জন পিয়ার্শ সাহেব/জিলা মেদনিপুর বারো ব/ৎসর কেলট্টার কাজ্জ করিয়া/সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই/সন ১১৯৫ বাঙ্গালা ১১ জৈষ্ঠী/কাল হইয়াছে—তাহার কবরে/এই কির্তি করিয়া দেয়া গেল।"

ইংরেজি লিপিটির বয়ান : "To the memory of/John pierce Esquire/who having serve the/East India Company/with Honour and fidality for twenty three years/during last twelve of which he was/Collector at Midnapore/departed the life on the 20 May 1788/in the 49th year of his age Tiuly lamented as valuable friend/affectionate brother/and parent to the indigent."

শহরের মীর্জাবাজার-বকুলকুঞ্জ এলাকায় বেশ কয়েকটি মন্দির-দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। এগুলির মধ্যে দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শিবের পশ্চিমমুখী এবং পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী দুটি আটচালা মন্দির দেখা যায় এবং প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দুটি

মন্দিরই আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। এ ছাড়া ভট্টাচার্য পরিবারের পুবমুখী রাধাবল্লভের নবরত্ন মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরে পঙ্খের নকাশি অলঙ্করণ ছাড়াও বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলকও দেখা যায়। মন্দিরের খিলানশীর্ষে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, এ মন্দিরটি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

পূর্বোক্ত নবরত্ন মন্দিরটির পশ্চিমদিকে ভট্টাচার্য পরিবারের কালীমাতার দক্ষিণমুখী এক জোড়বাংলা মন্দিরও দেখা যায়, যার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে বড়বাজার পল্লীর পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ মন্দিরটিতেও কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, সেজন্য স্থাপত্য নিরিখে বলা যেতে পারে এটিও উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত। আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য দক্ষিণ-পশ্চিমে ভট্টাচার্য পরিবারের পুবমুখী গোপালের এক পঞ্চরত্ন মন্দিরও দেখা যায় এবং প্রতিষ্ঠালিপিহীন, সে মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত।

শহরের মীর্জা মহল্লা এলাকায় খ্রীস্টীয় সতের শতকে নির্মিত পুবমুখী জোড়া মসজিদটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। পুবদিকের ইমারতটি অবশ্য খানকা শরীফ নামে পরিচিত মহম্মদ মৌলানা হজরত সৈয়দ শা মেহের আলী আলকাজুরীর মাজার।

পূর্বোক্ত মীর্জা মহল্লার পশ্চিমে মিয়াবাজার মহল্লায় বেশ কিছু প্রাচীন মসজিদ ও মাজার দেখা যায়। এখানের তিন গম্বুজ মসজিদটি চন্দন সহিদ রহমতুল্লার মসজিদ নামে খ্যাত। এ মসজিদটির সংলগ্ন দুটি চারচালা রীতির ছাদ্‌বিশিষ্ট এবং তিনটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট সৌধের ভিতর চন্দন সহিদ রহমতুল্লা এবং তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও প্রপৌত্র প্রভৃতির মাজার প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় কিংবদন্তী যে, পূর্বোক্ত মসজিদটি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত। কাছাকাছি মহাতাপপুরেও ইয়াদগার শাহ্ সাহেবের মসজিদটিও উল্লিখিত মসজিদের সমসাময়িক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, উল্লিখিত চন্দন সহিদ ও ইয়াদগার শাহ, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই বিশেষ শ্রদ্ধার প্রাত্র।।

মিয়াবাজার মহল্লার সামান্য উত্তরে বর্তমান জজকোর্টের কাছে নরমপুর পল্লীতে যে অসমাপ্ত ইদগাটি আছে, শোনা যায় এখানে নাকি শাহজাদা খুররম একদা নামাজ পড়েছিলেন।

এছাড়া মেদিনীপুর শহরের রেলস্টেশনের সন্নিকটে, সেকপুরায় ইংরেজদের যে সমাধিক্ষেত্রটি আছে, সেটির প্রাচীরবেষ্টিত এলাকার মধ্যেই চার্চ অফ ইংলণ্ড মিশনের সেন্ট জনস্ চার্চ অবস্থিত যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ। এ গীর্জাটি বাদে কেরানীটোলায় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গীর্জাটি ইংরেজ আগমনের পরে নির্মিত হয় বলে জানা যায় এবং শহরের উত্তরাংশে আবাসগড়ের সন্নিকটে আমেরিকান ব্যাপটিষ্ট মিশন সম্প্রদায়ের গীর্জাটিও নির্মিত হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে।

মোগলমারী : 'মনোহরপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দাঁতন থানার এলাকাধীন মোগলমারী (জে· এল· নং ৭৩) গ্রামটি সম্পর্কে 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা যোগেশচন্দ্র বসু লিখেছিলেন, ..."দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত মোগলমারী... গ্রামে একটি মৃত্তিকা ও ইস্টকস্তূপ শশিসেনার পাঠশালা বলিয়া অদ্যাপি অভিহিত হইয়া থাকে। জনশ্রুতি ঐস্থানে রাজা বিক্রমকেশরীর কন্যা শশিসেনা বা

সখিসেনার সহিত অহিমানিকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। শশিসেনা নানা বিদ্যায় ও নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার অনেক কাহিনী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে।" গ্রামটিতে প্রবেশ করতে গেলেই সামনে পড়ে এক সুউচ্চ ইঁটের গাঁথনীযুক্ত মাটির ঢিবি। পুরা ঢিবিটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ২ একর ও উচ্চতায় প্রায় ১৫′ (৪·৬ মি·)। গোটা গ্রামটিতেই ইতস্ততঃ ইঁটের গাঁথনি ও অসংখ্য খোলামকুচি দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে মাটি খোঁড়ার সময় একটি ক্ষুদ্রাকার ঋষভনাথের মূর্তিও এখানে পাওয়া যায়। অনুমান করা যায়, হয়ত এ গ্রামে একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল কোন প্রাচীন মন্দির বা সৌধ। তবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া এ গ্রামে প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পুবমুখী চন্দনেশ্বর শিব মন্দিরটি ছাদ গম্বুজাকৃতি এবং সেটির চারকোণে চারটি চূড়া সংযুক্ত হওয়ায় সেটিকে এক অভিনব স্থাপত্য বলা চলে।

মোহনপুর : এগরা-মোহনপর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মোহনপুর থানা-সদরের ১১/২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত মোহনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩৮৪)। এ গ্রামের হাটতলা এলাকায় করমহাপাত্র পরিবারের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার এবং লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির দুটি উল্লেখ্য পুরাকীর্তি। জগন্নাথ মন্দিরটি পুবমুখী দোচালা জগমোহনযুক্ত একরত্ন রীতির এবং এটির সম্মুখভাগে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-সজ্জা নিবদ্ধ আছে, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ কৃষ্ণলীলা। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৫′৬″ (৭·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৬০′ (১৮·২ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ৩৩১/২′ (১০·২ মি·), প্রস্থে ১৪′৬″ (৪·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭·৬ মি·)। এ মন্দিরের জগমোহনের উত্তর গায়ে প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী লক্ষ্মীজনার্দনের আটচালা মন্দিরটির সামনে ও উত্তর দেওয়ালে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক লক্ষ্য করা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ দুটি মন্দিরই স্থাপত্যনিরিখে আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে অনুমান।

আলোচ্য এ মন্দির দুটির সামান্য দক্ষিণপুবে অবস্থিত রঘুনাথের চারচালা জগমোহনসহ একরত্ন মন্দিরটিতে তেমন কোন অলঙ্করণ নেই। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৪′১০″ (৪·৫ মি·), প্রস্থে ১৪′৩″ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১৭′৬″ (৫·৩ মি·), প্রস্থে ১১′৩″ (৩·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭·৬ মি·)। এ মন্দিরটিতেও কোন উৎসর্গলিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলেই অনুমান।

যমুনা-বৈষ্ণবচক : 'আমোদপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে ডেবরা থানার এলাকাধীন যমুনা – বৈষ্ণবচক গ্রাম (জে· এল· নং ৩২১)। এ গ্রামে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ বিষয়ক 'টেরাকোটা'-ফলকগুলি একান্তই দর্শনীয়। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′৫″ (৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় প্রায় ৩৩ (১০·১ মি·)।

রঘুনাথপুর : মেছেদা – তমলুক পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডিমারী থেকে

পশ্চিমে ১ কিলোমিটার দূরত্বে তমলুক থানার এলাকাধীন রঘুনাথপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৬৭)। এই গ্রামের বসুপাড়ায় স্থানীয় বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দজীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে একদা পঙ্খের অলঙ্করণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেগুলি বিনষ্ট। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকায় স্থাপত্যবিচারে এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

রঘুনাথপুর : 'গোবিন্দনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে তেমোহানী-নন্দনপুর সড়কে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন তাতারখাঁ মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৯৮) রঘুনাথপুর গ্রাম। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক দ্রষ্টব্য। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক। পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীকিস/র মহন জি/ উ চরণে সরণং/ করি মন্দির/আরম্ভ ১০/ফালগুন স/কাব্দা ১৭০৪৪/সন১২০ ২৯ সন।" সুতরাং ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭′ (৫·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

রঘুনাথবাড়ি : 'কৃষ্ণনগর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখানে শিলাবতী নদীর অপর পারেই গড়বেতা থানার এলাকাধীন গ্রাম রঘুনাথবাড়ি (জে· এল· নং ৩৭২)। এ গ্রামে রঘুনাথের দক্ষিণমুখী মাকড়া পাথরের বিশাল নবরত্ন রীতির মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের উপাসিত বিগ্রহ হল রামসীতা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও হনুমানের ধাতুনির্মিত মূর্তি। জনশ্রুতি যে, বগড়ী পরগণার আদি ভূস্বামী গজপতি সিংহের প্রপৌত্র রঘুনাথ সিংহের মাতা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। মন্দিরটি নবরত্ন রীতির হলেও, এর চূড়ার বিন্যাসটি বেশ অভিনব। সাধারণতঃ রত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে তল বাড়িয়ে চূড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু এক্ষেত্রে একটি তলের মধ্যেই মোট আটটি চূড়া সংস্থাপন করা হয়েছে, যা একান্তই অভিনব। মন্দির দেওয়ালের স্তম্ভমূলে বেশ কিছু পাথর খোদাইয়ের উপর পঙ্খ-পলস্তারার প্রলেপ লাগানো ভাস্কর্য দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু পৌরাণিক দেবদেবী প্রভৃতি। ৪′৪″ (১·৩ মি·) উঁচু ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩০′ (৯·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীস্টীয় সতের শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়।

এ মন্দিরের সামান্য পুবে, নদীতীরবর্তী যে পাথরের চারচালা মণ্ডপটি দেখা যায়, সেটিতে প্রতি বৎসর দোলের সময় কৃষ্ণরায়জীউ অবস্থান করেন।

রত্নেশ্বরবাটী : ঘাটাল শহর থেকে পুবে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন রত্নেশ্বরবাটী গ্রাম (জে· এল· নং ১৫৩)। এ গ্রামে ভূঁইয়া পরিবারের প্রতিষ্ঠিত হটনাগর শিবের পশ্চিমমুখী শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির পশ্চিম দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ "চন্দ্রেষু মুনি সংখ্যাতে/শাকে চৈব নিশাপতৌঃ/মাঘস্য পঞ্চবিংশাহে/আরম্ভোহস্য বভূবহ।" ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির তিনদিকের দেওয়ালে রামরাজা, বস্ত্রহরণ ও মিথুন দৃশ্য পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ হয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩

মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)।

রবিদাসপুর : পাঁশকুড়া – ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) জগন্নাথপুর ; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন রবিদাসপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৯০)। এ গ্রামের পুবপাড়ায় অধিকারী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরে উপাসিত বিগ্রহ কৃষ্ণবলরামের কাঠের মূর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়েছে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে খোদিত পোড়ামাটির ফলক। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিটি বিনষ্ট হলেও, আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৯′ (৫·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৬′ (১১ মি·)।

রসকুণ্ড : 'চন্দ্রকোণা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে চন্দ্রকোণা-গড়বেতা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দক্ষিণ-পুবে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরত্বে গড়বেতা থানার অন্তর্গত রসকুণ্ড গ্রাম (জে· এল· নং ৭৪৬)। এ গ্রামে স্বয়ম্ভু শিব বসন্তরায়ের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এ জেলার এক বিখ্যাত শৈব কেন্দ্র। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপরিভাগে একসময়ে সামান্য পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছিল, কিন্তু বর্তমানে চুনকাম করে সেগুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরটিতে কোন লিপিফলক না থাকলেও, আকারপ্রকারে সেটি আঠার শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

আলোচ্য এই মন্দিরের আশপাশে মাকড়া পাথরের আমলকশিলা ও অন্যান্য পাথরের অংশবিশেষ পড়ে থাকায় অনুমান যে, অতীতে এখানে হয়ত কোন এক পাথরের তৈরী মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল।

রাউতমণি : 'চক-কালন্দি' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে ২ কিলোমিটার দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন রাউতমণি গ্রাম (জে· এল নং ৬১৮)। এখানে এক সুউচ্চ ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত রাউতানচণ্ডী নামে দেবীর যে মন্দিরটি আছে তার আশেপাশে ছড়ানো আয়তাকার কিছু মাকড়া পাথর এবং ঐ পাথরের তৈরী একটি আমলক দেখে বেশ বোঝা যায় এখানে হয়ত একদা কোন এক প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে পূজিত বিগ্রহ রাউতানচণ্ডীর সিঁদুরলিপ্ত পাথরখোদাই ভগ্ন মূর্তিটি দেখে অনুমান করা যায় যে, এগুলি আদতে কোন এক বিরাটাকার মূর্তির অংশবিশেষ। আলোচ্য এ ঢিবিটির চতুর্দিকে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ এবং এর পাশ দিয়ে একদা প্রবাহিত কপালেশ্বরী নদীর মজা খাত দেখে অনুমান করা যায় যে, অখ্যাত এই নদীতীরের অনুচ্চ ঢিবিতে হয়ত কোনো প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় মহাপাত্র পরিবারের একটি বৃহদাকার আটকোণা রাসমঞ্চও এখানকার এক দ্রষ্টব্য। এ রাসমঞ্চটির প্রতিটি খিলানশীর্ষে উৎকৃষ্ট পদ্মের অলঙ্করণ ছাড়াও ক্ষুদ্রাকার 'টেরাকোটা'-ফলকও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ রাসমঞ্চটি স্থাপত্যবিচারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

এ রাসমঞ্চের সামান্য পুবে পশ্চিমমুখী শিবের দুটি আটচালা মন্দির দেখা যায় এবং আকারপ্রকারে এ দুটি মন্দিরই পূর্বোক্ত রাসমঞ্চের সমসাময়িক। দুটি মন্দিরই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে

১০′ (৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

উল্লিখিত জোড়া শিবমন্দিরের সামান্য পুবে মহাপাত্র পরিবারের রাধাবল্লভের পুবমুখী একটি ইঁটের পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটিতে সামান্য পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর তেমন কোনো সজ্জা নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৩′ (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)। এ মন্দিরে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে এটিও উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই অনুমান।

রাজনগর : 'ডিহি চেতুয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন রাজনগর গ্রাম (জে· এল· নং ২৫)। এ গ্রামের হাটতলায় পশ্চিমমুখী শীতলানন্দ শিবের সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটি যে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ এক লিপি থেকে জানা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১০′৬″ (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·১ মি·)। আলোচ্য এই মন্দিরটির উত্তরপাশে অবস্থিত দক্ষিণমুখী শীতলার দালান-মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপর পঙ্খের অলঙ্করণ দেখা যায় এবং পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত দু লাইন লিপিফলকের পাঠ নিম্নরূপ : "সন ১২৬৭ সাল/শ্রীগোলক আলু অঁদেত মিস্ত্রী।" অতএব ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

হাটতলার মন্দিরগুলির সামান্য পুবে স্থানীয় বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী পঞ্চরথ শিখর-দেউলটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সকাব্দা ১৭৬৭/সন ১২৫২"। অতএব ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮′ (২·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

রাজনগর : 'গোবিন্দপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে ১ কিলোমিটর দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন রাজনগর গ্রাম (জে· এল· নং ১১০)। এ গ্রামে সামন্ত পরিবারের পাশাপাশি অবস্থিত শিবের দুটি পশ্চিমমুখী শিখর-দেউল এখানকার পুরাকীর্তি। উত্তর পাশের মন্দিরটি অপর মন্দিরটি অপেক্ষা বেশ বৃহৎ এবং এ মন্দিরে বেশ বড় আকারের দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলক ছাড়া মিথুন-ফলকও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান। প্রায় ৪৩′ (১৩·১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটি বর্তমানে সংস্কার অভাবে জীর্ণদশায় পতিত হয়েছে।

দক্ষিণ পাশের শিবের দেউল-মন্দিরটিও পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলে জানা গেল। এ মন্দিরটির চার দেওয়ালে এক সময় বেশ বড় আকারের 'টেরাকোটা'-ফলক উৎকীর্ণ ছিল। বর্তমানে সেগুলি অপসারিত ; মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)।

নদীতীরবর্তী এ গ্রামে 'জগদী' নামক এক উঁচু ঢিবিতে অসংখ্য মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এখানে কোন প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে বলেই ধারণা। তবে সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন বাঞ্ছনীয়।

রাজপাড়া : ঝাড়গ্রাম – শিলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শিলদা থেকে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে বীনপুর থানার এলাকাধীন রাজপাড়া গ্রাম (জে· এল· নং ৪০২)।

এখানে শিবের পশ্চিমমুখী ইটের শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ/সকাব্দা ১৭৬২/সন ১২৪৮ সাল/আমল শ্রীশ্রীরাজা কিসোরমনি/রায় পঃ মেদানমল্ল।" অতএব ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)।

রাজপাড়ায় উল্লিখিত এই মন্দিরের কাছাকাছি একটি স্থানে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি সমন্বিত কিছু জৈন চৌখুপী এবং সেইসঙ্গে দশ-এগারো শতকের দু-একটি জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তিও দেখা যায়। সুতরাং আলোচ্য এই প্রত্নস্থল দেখে অনুমান করা যায় যে অতীতে হয়ত এখানে এক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে কোন জৈন-বিহার গড়ে উঠেছিল।

রাজপুরা : 'মালঞ্চ' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে হাঁটাপথে সামান্য দূরত্বে খড়্গপুর থানার এলাকাধীন রাজপুরা গ্রাম (জে· এল· নং ১৩০)। এখানে স্থানীয় দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী ইটের একটি শিখর-মন্দির এখানের এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে কোনো অলঙ্করণ-সজ্জা না থাকলেও, একটি উৎসর্গলিপি আছে যার পাঠ :"সন ১২৭৫ সাল তারিখ ২০ ফাল্গুন।" অতএব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

রাজপুরা : 'যমুনা-বৈষ্ণবচক' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ১/২ কিলোমিটার দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন রাজপুরা গ্রাম (জে· এল· নং ৪৭৯)। এ গ্রামে মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী পঞ্চরত্ন বিষ্ণুমন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে একদা উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ ছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেসব পোড়ামাটির ফলকগুলি বর্তমানে বিনষ্ট হতে চলেছে। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে সেটি আঠারো শতকের শেষভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬′ (৪·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

রাজবল্লভ : 'ডাঙ্গরা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানকার লাগোয়া পিঙ্গলা থানার এলাকাধীন রাজবল্লভ (জে· এল· নং ৪৯) গ্রামে স্থানীয় পালিত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরীর পঞ্চরত্ন মন্দিরে একদা বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সামনের অলিন্দটি বর্তমানে ভূপতিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯′৬″ (৫·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

এ গ্রামের উল্লেখযোগ্য আর একটি পুরাকীর্তি হল, চন্দ্র পরিবারের প্রাতিষ্ঠিত পুবমুখী দধিবামনের নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটির খিলানশীর্ষে বেশ কিছু নকাশি অলংকরণের সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিও নিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া এ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে কাঠের যে নকাশি কাজযুক্ত কপাটটি আছে, তাও বেশ আকর্ষণীয়। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যে মন্দিরটি ১৭′৬″ (৫·৩ মি·), প্রস্থে ১৬′৯″ (৫·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

রাজহাটি : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাউর স্টেশন থেকে উত্তরে হাঁটা পথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন রাজহাটি গ্রাম (জে· এল· নং ১৩৫)। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত যুগলকিশোরের দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটি এক

পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটিতে বড় আকারের যে 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, রামসীতা ও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন মূর্তি। এছাড়া পুব দেওয়ালে মিথুন-ফলকও দেখা যায়। মন্দিরটিতে একটি কাঠ-খোদাইযুক্ত দরজাও আছে, যার কারিগরি-নৈপুণ্য বেশ প্রশংসাজনক। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'১০" (৩·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

রাণাপুর : 'কুশপাতা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখানকার পার্শ্ববর্তী দাসপুর থানার এলাকাধীন রাণাপুর-গ্রাম (জে· এল· নং ২০২)। এ গ্রামে প্রামাণিক পরিবারের দক্ষিণমুখী রঘুনাথজীউর নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের খিলানশীর্ষে 'টেরাকোটা'-সজ্জা ছাড়াও, মন্দিরের দ্বিতলের খিলানশীর্ষেও পোড়ামাটির অলঙ্করণ রয়েছে। এছাড়া এ মন্দিরের পুব ও পশ্চিম দেওয়ালেও দেখা যায় অনুরূপ পোড়ামাটির ফলক। তদুপরি এ মন্দিরে নিবদ্ধ কাঠের কপাটটিতেও কাঠ-খোদাইয়ের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। মন্দিরের কার্নিসের নিচে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী/রাম জীউ/ষুভম/স্তু সকা/ব্দা ১৭২৩/সন ১২০৮/সাল ৩/রিক ২/৬ জষ্ঠ/শ্রীশ্রীগু/রূচরণে/সরনং।" অতএব ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০'৮" (৬·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩' (১০·১ মি·)।

এ গ্রামের অন্যত্র শিবের পুবমুখী জোড়া আটচালা মন্দির দুটিও এক পুরাকীর্তি। কোনো প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে সে দুটি মন্দির উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে। দুটি মন্দিরই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২'৬" (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)।

কাছাকাছি শুঁই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত উত্তরমুখী আটচালা মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯'১০" (৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·২ মি·)। এ মন্দিরের দেওয়ালে পদ্ম পলস্তারায় বাতায়নবর্তিনীর একটি মূর্তি বেশ দ্রষ্টব্য। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই মনে হয়।

রাধাকান্তপুর : ঘাটাল-পাঁশকুড়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) টালিভাটা ; সেখান থেকে পুবে ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন রাধাকান্তপুর গ্রাম (জে এল· নং ৬৭)। এ গ্রামে দাস পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের একরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ন'লাইন লিপির পাঠ নিম্নরূপঃ

"রাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দ দাস ঃ স্বর্গে বাস এই সে কারণে ঃ মহা মহা পুন্য বলে ঃ সপ্তপুত্র ক্ষিতিতলে ঃ জেষ্ঠ পুত্র স্যামদাস নামে ঃ যিনি দাতা পুণ্যোদঅ/প্রকাসিত মহাসয় মোধ্যম ত্রিতিঅ সহদরে ঃ বর্দ্ধমানে পাঠাইআ গোপিনাথে আনাইআ ঃ স্থাপন করিলা এই ঘরে ঃ নবাব পৃথিবিপতি তার /ভএ বেস্ত ওতি ঃ সিমানা ঘেরিআ খোলিল গড় ঃ দামামা দরজা পরে ঃ জয়চোণ্ডি ক্রিপা বরে ঃ পুস্কন্যি খোলিল তারপর ঃ ॥ সন্ধান পাইল জদি ঃ সভাসিং/হ নরপোতি ঃ এই হেতু কড়া না অইসে ঃ কম্পবান ক্রোধভরে ঃ আজ্ঞা দিল ওনুচরে ঃ হান সির পদাতিক রোসেঃ ॥ বিপক্ষ হইল কাল ঃ কাল হোইল প/ রকাল ঃ কিছু না জানিল মহাসঅ ঃ। তাহাতে ছেদ্দল মুণ্ড ঃ দুগ্গা দুগ্গা ডাকে তুণ্ড ঃ সুনি রাজা মানিল বিস্ময় ঃ কবিতা কোরিতে তার ঃ এইস্থানে আটা ভার ঃ/হোইল দুই

সতেক বৎসর ঃ রির্তানত পিত্রিকিত্তি ঃ এই বংসে অদ্যাবোদি ঃ বন্দনা হোইতেছে সুন্দর ॥ আপদ হোইল ঈথে ঃ বিক্ষ হোইল মোন্দিরেতে সারাইতে সা/ধ্য নাহি কার ঃ নারাণ দাসের বংসে ঃ মোদ্ধম বাড়ির অংসে ঃ জোজ্ঞেস্বর জোম্মেছিল সার ॥ সন ১২৫১ সালে সগোষ্ঠি সহিত মেলে ঃ নানা যুকতি করে জনে জনে ঃ কেহ বলে/লআ কর ঃ কেহ বলে একেই সার ঃ জোজ্ঞেস্বরের কিছু না লঅ মনে ঃ পিতরি কির্ত্তি ডুবাইআঃ কেমনে কোরিব ইহা ঃ সারাইব জা থাকে ভাগ্যেতে ঃ ভদ্রলোক ডাকাইআ ঃ/হিরু মিস্ত্রি আনাইআ ঃ উদজোগ কোরিল সারা ঃ ইতে ঃ সন ১২৫১ সালে ঃ গোপিনাথ ক্রিপা বলে ঃ মোন্দির কোরিল মেরামতি ঃ হিসাব করহ সভে ঃ ইহাতে নিকাশ পাবে ঃ কোবিতা সমাপ্ত হৈল ইতি ঃ ॥" মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২২′ (৬·৭ মি·), প্রস্থে ১৮′ (৫·৫ মি·) উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)।

এ গ্রামের বসুপাড়ায় বসু পরিবারের দধিবামনের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও কাঠের দরজাটির উপর খোদাইকাজ একান্তই মনোরম। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২১′৬″ (৬·৫ মি·), প্রস্থে ১৮′৬″ (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ গ্রামের ঘোষপাড়ায় দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী শিখর-দেউলটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরটি শিবের এবং সেটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গ্রামের শাঁখারী পাড়ায় দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতেও বেশ কিছু পোড়ামাটিরঅলঙ্করণলক্ষ্য করা যায়। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০′ (৩·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

গ্রামের উত্তরপাড়ায় গোপীনাথপুর এলাকায় শীতলার দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগে পঙ্খের সামান্য নকাশি অলংকরণ ছাড়া আর কোনো সজ্জা নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২′৫″ (৩·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

রাধানগর : 'নবগ্রাম' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখানকার পশ্চিমে অবস্থিত ঘাটাল থানার এলাকাধীন নবগ্রাম মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৭৮) রাধানগর গ্রাম। একদা রেশম-বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত এই গ্রামে গোপীনাথের মাকড়া পাথরের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। বর্তমানে এ মন্দিরটি পরিত্যক্ত হওয়ার কারণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। অবিলম্বে এ মন্দিরটির সংস্কার না হলে যেকোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩০′ (৯·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৩′ (১৩·১ মি·)। কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ "খ বেদ রস সংযুক্তে শা/কে চৈব নিশাপতৌ। গোপী/নাথস্য বেস্মেদং ভক্তিতো/দত্তবানহং ॥ ১৬৪০"। অতএব ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে দালালপুকুরের ধারে দুটি আয়তাকার প্রস্তরস্তম্ভ দেখা যায় এবং সে দুটিতে যে লিপি খোদাই রয়েছে সেগুলির সঙ্গে আর্মেনিয়ান লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। একদা রেশমশিল্পের দৌলতে বিভিন্ন দেশের বণিক সম্প্রদায় যে রাধানগরে কুঠি স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ ও হুগলী ছাড়াও আর্মেনিয়ানরা যে এখানে এসেছিলেন, এ স্তম্ভ দুটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ গ্রামের সিংডাঙ্গা এলাকায় পশ্চিমমুখী শীতলানন্দ শিবের একটি শিখর-দেউলও দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

রাধাবল্লভপুর : 'চন্দ্রকোণা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকেদক্ষিণেচন্দ্রকোণা-কেশপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন রাধাবল্লভপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৯৯)। এখানে ধনঞ্জয় শিবের পুবমুখী ইঁটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পত্র-পলস্তারায় নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া আর কোনো সজ্জা নেই। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বলেই মনে হয়।

রানীচক : 'খাঞ্জাপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার অন্তর্গত রানীচক গ্রাম (জে· এল· নং ২১৬)। এ গ্রামে স্থানীয় মণ্ডল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী শ্যামসুন্দর-গোবিন্দজীউর জোড়বাংলা মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগ বর্তমানে বিনষ্ট হওয়ায় সেটিকে অপটুভাবে সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় যে, আদিতে এ মন্দিরটি ছিল তিন বাংলা। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২০′ (৬·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)। একটি নকাশি অলঙ্করণযুক্ত দরজা এ মন্দিরের আর এক দ্রষ্টব্য। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে এটি সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান করা যায়।

রানীর বাজার : 'বরদা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সে গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত ঘাটাল থানার এলাকাধীন রানীর বাজার গ্রামে (জে· এল· নং ৭১) বেশ কয়েকটি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ মন্দির দেখা যায়। তবে এ গ্রামে শ্যামরায়জীউর পুবমুখী একরত্ন মন্দিরটি একসময়ে পোড়ামাটির ফলক-সজ্জায় যে এক সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সে মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পুবে আরো একটি দক্ষিণমুখী শীতলার পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটিও বর্তমানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলেও একসময়ে সেটিতেও বেশ 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ ছিল। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

আলোচ্য এ মন্দির দুটির সামান্য উত্তরে পুবমুখী দামোদরের আরও একটি একরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটিও 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণযুক্ত এবং এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক লিপিফলক থেকে জানা যায় যে, এটি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

রামকৃষ্ণপুর : 'দাসপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে হাঁটা পথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন রামকৃষ্ণপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৯০)। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী বৃন্দাবনচন্দ্রের দালান-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে দশাবতার ও কৃষ্ণলীলা সংক্রান্ত বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়। এটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৭৯২খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৯' (৫·৮ মি·), প্রস্থে ১৬ (৪·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·১ মি·)।

কাছাকাছি এ বিগ্রহের ন'চূড়াবিশিষ্ট আটকোণা রাসমঞ্চটির প্রতি খিলানের স্তম্ভে নিবদ্ধ পোড়ামাটির বাদিকা-মূর্তিগুলিও বেশ দ্রষ্টব্য।

রামগড় : 'গোয়ালতোড়' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে মেদিনীপুর-রামগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বীনপুর থানার এলাকাধীন রামগড় গ্রাম (জে· এল· নং ৬৮৯)। এখানে রামগড়রাজ প্রতিষ্ঠিত কালাচাঁদজীউর পুবমুখী ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। কেন্দ্রীয় খিলানশীর্ষে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানাবিধ পোড়ামাটির অলঙ্করণ ছাড়াও, উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালেও টেরাকোটা-সজ্জা দেখা যায়। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৬'৮" (৮·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৬০' (১৮.২ মি.)

এ মন্দিরের লাগোয়া উত্তরে টিনে ছাওয়া কাঠের খুঁটির যে আটচালা মণ্ডপটি আছে, তা একান্তই মনোরম। কারুকার্যমণ্ডিত এ আটচালার প্রতিটি কাঠের স্তম্ভে নিবদ্ধ লতাপাতার নকশাযুক্ত অসংখ্য ব্র্যাকেটের সঙ্গে নানাবিধ মূর্তি ক্ষোদাই দেখা যায়। বাংলার দারুতক্ষণ শিল্পের নিদর্শনযুক্ত এ কাঠের মণ্ডপটির অবিলম্বে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না হলে, অচিরেই যে সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ গ্রামে প্রধান সড়কের ধারে অবস্থিত পাতালেশ্বর শিবের উত্তরমুখী আটচালাটিতে যে উৎকৃষ্ট পঙ্খের নকাশি-সজ্জা দেখা যায় তা একান্তই উল্লেখযাগ্য। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩' (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

রামচন্দ্রপুর : 'কেনাসী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ময়না থানার এলাকাধীন রামচন্দ্রপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৭১)। এ গ্রামে ঘোড়ই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। দক্ষিণ ও পুবপাশের দেওয়ালে নিবদ্ধ কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক পোড়ামাটির অলঙ্করণগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের মতে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২৫' (৭·৬ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৫০' (১৫·২ মি·)।

এ নবরত্ন মন্দিরটির সামান্য উত্তরে পুবমুখী ইটের এক আটচালা শিব মন্দিরের খিলানশীর্ষে পৌরাণিক দেবদেবীর বেশ কিছু মূর্তিফলক দেখা যায়। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপিটি নিম্নরূপ : শ্রীশ্রী সিব ঠাকুর/সকাব্দ ১৭৮১/সন ১২৬৬ সাল/তারিখ ২০

মাঘ।" অতএব ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬' (৪·৮ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

রামজীবনপুর : 'জাড়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে ক্ষীরপাই-রামজীবনপুর সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন রামজীবনপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৬)। এখানকার নতুন হাটএলাকায় পুবমুখী ইটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পরিত্যক্ত হলেও, 'সেটি একদা পোড়ামাটির অলঙ্করণসমৃদ্ধ ছিল। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪'৬" (৪·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)

নতুনহাট এলাকার বুড়োশিবতলায় বুড়োশিবের অলঙ্করণহীন আটচালা মন্দিরটি ছাড়াও সরকার পরিবারের পুবমুখী দালান রীতির দুর্গা মন্দিরটিতে এক সারি 'টেরাকোটা'-ফলক নিবদ্ধ যার বিষয়বস্তু হল, দশাবতার ও পৌরাণিক দেবদেবী প্রভৃতি। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৯' (৫·৭ মি·), প্রস্থে ১৫'৬" (৪·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৪' (৪.২ মি.)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলে অনুমান।

এছাড়া এখানকার শীল পরিবারের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। এটির সম্মুখভাবে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধ দৃশ্য ও কৃষ্ণলীলার বহুকাহিনী। এ মন্দিরে নিবদ্ধ কাঠের কপাটটিতে বেশ কিছু খোদাই কাজ দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু নানাবিধ দেবদেবী প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠাফলকের অভাবে, স্থাপত্যনিরিখে মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয়ে থাকবে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭'৬" (৫·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

এখানকার বাজারপাড়া-কালীতলায় হোতা পরিবারের যে দুটি পুবমুখী জোড়া পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়, তার মধ্যে দক্ষিণের মন্দিরটি শিব এবং উত্তরের মন্দিরটি লক্ষ্মীজনার্দনের। শিবমন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৩" (৩·১ মি·), লক্ষ্মীজর্নাদনের মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১০'৮" (৩·২ মি·) এবং উভয় মন্দিরই উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে এ দুটি মন্দিরই উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

গোকুলবাজার পল্লীতে পাল পরিবারের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে। এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩'১০" (৪·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০' (৬ মি·)।

পুরাতনহাট এলাকায় পার্বতীনাথের আটচালা মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলকথেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। তবে এই এলাকার প্রামাণিকদের দামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বেশ উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "৭ শ্রীশ্রী দামোদর ঠাকুর জিউ/৭ শ্রীশ্রী লক্ষ্মিনারায়ণ জিউ/সকাব্দা ১৭৬২/সন ১২৪৭ সাল/তারিখ ২৩ জোষ্ট/শ্রীবংসীধর দাস/প্রামাণিক মিস্ত্রী শ্রী/পেলারাম সুত্রধর সাং রা/মজীবনপুর।" অতএব ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

রামদাসপুর : 'বালীপোতা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন রামদাসপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৯)। এ গ্রামে মাইতি পরিবারের দধিবামনজীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে একসময়ে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু সেটির সামনের বেশ কিছু অংশ ভেঙে পড়ায় সেগুলির অধিকাংশই আজ বিনষ্ট। এছাড়া এ মন্দিরে কাঠের যে কপাটটি আছে তার পাল্লায় খোদিত হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধদৃশ্য ও নানা দেবদেবীর মূর্তি। মন্দিরটিতে কোনো প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় যে, সেটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৬' (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

রামপুর : 'আজুড়িয়া' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখানের পার্শ্ববর্তী দাসপুর থানার এলাকাধীন গ্রাম রামপুর (জে· এল· নং ৮১)। এ গ্রামের মাড়োতলায় যে কটি বিভিন্ন রীতির মন্দির দেখা যায়, তারমধ্যে কালুরায় ধর্মের পুবমুখী দোচালা মন্দিরটি একান্তই চিত্তাকর্ষক। অলঙ্করণহীন এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১১' (৩·৪ মি·), প্রস্থে ৭'৬" (২·২ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৮' (২·৪ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও মন্দিরটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই মনে হয়। এছাড়া এখানকার আরও একটি প্রাচীন মন্দির হলো পশ্চিমমুখী আটচালা এক শিব মন্দির এবং সেটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২'১০" (৩·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ১৩' (৪ মি·)। এছাড়া এখানে আরও যে মন্দিরগুলি দেখা যায় সেগুলি ঠিক পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে না।

রামবাগ : 'মহিষাদল' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে মহিষাদল থানার এলাকাধীন রামবাগ গ্রাম (জে· এল· নং ১৫২)।এ গ্রামে রানী জানকীদেবী প্রতিষ্ঠিত রামজীউর পুবমুখী ইঁটের আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপিটি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

রেয়াপাড়া : মেছেদা– তেরপেখিয়া পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) হলদী নদীতীরবর্তী তেরপেখিয়া ; সেখান থেকে নদী পার হয়ে মোরাম রাস্তায় দক্ষিণে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে নন্দীগ্রাম থানার এলাকাধীন রেয়াপাড়া গ্রাম (জে· এল· নং ১৩০)। এ গ্রামে মহারুদ্রসিদ্ধিনাথজীউর জগমোহনযুক্ত পুবমুখী সপ্তরথ শিখর-দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। প্রায় ৫০'(১৫·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটির বরণ্ডের নিচে পাল-সেন আমলের একটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি নিবদ্ধ রয়েছে, যা একান্তই অভিনব। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে, সতের শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

লক্ষ্মীপুর : ক্ষীরপাই– রামজীবনপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) শ্রীনগর : সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে চন্দ্রকোণা থানার এলাকাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩০)। এ গ্রামে চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দয়ানাথ শিবের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের

সম্মুখভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ হয়েছে কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধের কাহিনী সমন্বিত 'টেরাকোটা'-ফলক। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৩′ (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ মন্দিরটির উত্তর গায়ে পুবমুখী অলঙ্করণবিহীন আটচালা মন্দিরটি, আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। তবে এ মন্দিরটির সামান্য উত্তরে রামসুন্দর শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটিতে যে 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ দেখা যায়, সেগুলির কারিগরি বেশ উচ্চাঙ্গের। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১১′ (৩·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩′ (৭ মি·)।

লছিপুর : 'নতুক জয়কৃষ্ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে প্রায় ২ কিলোমিটার পুবে ঘাটাল থানার এলাকাধীন লছিপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৯৬)। এ গ্রামে বাগ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর পুবমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির যে অলঙ্করণ দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু কৃষ্ণ, বলরাম, বেহালাবাদিকা ও খঞ্জনীবাদিকা প্রভৃতি। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সন ১২৬৩ সাল শ্রীশ্রীসি/ধর জিউ সকাব্দা ১৭৭৮ সক/শ্রীপেলারাম বাগ/···।" অতএব ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। এ মন্দিরের দরজায় যে কাঠখোদাইযুক্ত কপাটটি আছে, তা বেশ আকর্ষণীয়।

কাছাকাছি উমাপতি ও রমাপত্তি শিবের দুটি পশ্চিমমুখী শিখর-দেউলে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দির দুটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দুটি মন্দিরই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৮′ (২·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

এই পরিবারেরই প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর আটকোণা সতেরচূড়া রাসমঞ্চটিও এক দ্রষ্টব্য। এ রাসমঞ্চটি পূর্বোক্ত শিখর মন্দির দুটির যে সমসাময়িক তা ঐ রাসমঞ্চে উৎকীর্ণ দু পঙ্ক্তির এক লিপি থেকে জানা যায়। সে লিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী শ্রীধরচন্দ্র জীউ এর নিলাকরনাথ মঞ্চ উৎপন্ন সন ১২৬৭ সাল তারিখ ১ বৈশাখ/দাশানুদাশ পরিচারক শ্রীঅরুণ চন্দ্র বাগ সাং লোছিপুর রাজহাটি নিবাশি দারিখানাথ মিস্ত্রির কৃত।" পূর্বে আলোচিত 'গোবিন্দপুর' নিবন্ধে তারকনাথ শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে রাজহাটি গ্রামের এক মন্দির-স্থপতির পরিচয় পাওয়া গেছে এবং আলোচ্য এ রাসমঞ্চের লিপিতেও রাজহাটির দ্বারিকানাথ মিস্ত্রীর নাম উল্লিখিত হওয়ায় বেশ বোঝা যায় ঐ গ্রামটিতে একদা মন্দির-নির্মাণশিল্পীদের কেন্দ্রীভূত বসবাস ছিল।

লস্করদিঘি : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-মেদিনীপুর পিচের সড়কে পাঁশকুড়া বাজার ; সেখান থেকে উত্তরে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন লস্করদিঘি গ্রাম (জে· এল· নং ৬৩), যা স্থানীয়ভাবে নস্করদিঘি নামেও পরিচিত। এ গ্রামে পাণ্ডা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী রঘুনাথজীউর নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটি যে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, তা এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। মন্দিরটিতে রামসীতা ও কৃষ্ণের 'টেরাকোটা'-ফলক ছাড়া আর কোনো অলঙ্করণ নেই। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৭′ (৮·২ মি·)

ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)। মন্দিরটি বহুবার সংস্কারের ফলে অনুমান যে, এ মন্দিরে উৎকীর্ণ অন্যান্য পোড়ামাটির ফলকগুলি বিনষ্ট হয়েছে।

লাওদা : 'দাসপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তরে মোরাম রাস্তায় প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন লাওদা গ্রাম (জে· এল· ৫৫)। এ গ্রামে বালিওল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী বাঁকারায়ের নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সম্মুখভাগে নিবদ্ধ যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-ফলক দেখা যায় তার বিষয়বস্তু রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী। মন্দিরটিতে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সুভমস্তু/সকাব্দা/১৭২৩ সন/১২০৮ সাল।" অতএব ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০′ (১২·১ মি·)।

এছাড়া এখানের ভূতনাথ শিবের বৃহদাকার দালান-মন্দিরটির দুপাশের বারান্দায় সুউচ্চ গোলাকার গ্রীসীয় স্তম্ভ ও তৎসহ পঙ্খের অলঙ্করণ এক উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য। প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে এ মন্দিরটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

লালগড় : মেদিনীপুর– লালগড় পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বীনপুর থানার এলাকাধীন লালগড় (জে· এল· নং ৭৯০)। এখানে রাধামোহন ও কৃষ্ণরাধিকাজীউর পুবমুখী মাকড়া পাথরের জোড়বাংলা মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের হলেও সেটিতে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিসমন্বিত 'টেরাকোটা'-ফলকও দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২২′ (৬·৭ মি·), প্রস্থে ২০′ (৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·১ মি·)। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক সংস্কার-ফলক থেকে জানা যায় যে সেটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত।

আলোচ্য এ মন্দিরের পাশেই দক্ষিণমুখী একটি দোতলা দালান-মন্দির দেখা যায়। এটিতে পঙ্খের যে অলঙ্করণসজ্জা উৎকীর্ণ হয়েছে তার বিষয়বস্তু হল দশাবতার, দুর্গা, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি। স্থানীয়ভাবে জানা যায় যে, পূর্বোক্ত জোড়বাংলার বিগ্রহ গ্রীষ্মের সময় এই মন্দিরে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটিও দৈর্ঘ্যে ২৫′ (৭·৬ মি·), প্রস্থে ১৯′ (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

এছাড়া লালগড়ে সর্বমঙ্গলার দক্ষিণমুখী মন্দিরটির স্থাপত্যগঠন বেশ অভিনব। আদিতে এ মন্দিরে কোন রত্ন ছিল কিনা বোঝা যায় না। সুতরাং এটি বাঁকানো চালবিশিষ্ট দালান-রীতির কোন মন্দিরও হতে পারে বলে অনুমান। এ মন্দিরটিতেও বেশ কিছু পোড়ামাটির ও পঙ্খের অলঙ্করণ দেখা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ২০′ (৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। এটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য নিরিখে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

লালজল : ঝাড়গ্রাম বাঁশপাহাড়ী পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বীনপুর থানার এলাকাধীন লালজল গ্রাম (জে· এল· নং ৩৪)। পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন এ গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে প্রাচীন ও নব্যপ্রস্তর যুগের পাথরের কুঠার ও সচ্ছিদ্র বলয় প্রভৃতি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতাত্ত্বিক অধিকারের পক্ষ থেকে অনুসন্ধানের ফলে

এখানের সুউচ্চ এক টিলায় প্রাচীন গুহামানবদের ব্যবহৃত একটি গুহায় প্রস্তর যুগ ও পরবর্তীযুগের কিছু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় হল, সে গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রেরও নিদর্শন রয়েছে। সুতরাং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বের ঐতিহ্যসম্পন্ন গ্রামটিতে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

লোয়াদা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-লোয়াদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ডেবরা থানার এলাকাধীন লোয়াদা গ্রাম (জে· এল· নং ১৩৮)। স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের কাছাকাছি চারচালা জগমোহনযুক্ত পুবমুখী রাধাগোবিন্দজীউর পরিত্যক্ত শিখর-দেউল এখানকার এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের জগমোহনের সামনের দেওয়ালে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-দেবদেবীর মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′৬″ (৪·৫ মি·), জগমোহনটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৬′ (৭·৯ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৩′ (১৩·১ মি·)।

এ মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে রঘুনাথের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্নটিও এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ দেখা যায়, যার বিষয়বস্তু মূলতঃ লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা। মন্দিরটি যে ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল তা এটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৭′৬″ (৫·৩ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। মন্দিরটি বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংস হতে চলেছে এবং অবিলম্বে সরকারী উদ্যোগে এটির সংস্কার প্রয়োজন।

লোয়াদার হাটতলায় পশ্চিমমুখী শিবের শিখর-দেউলটিও এক দ্রষ্টব্য। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দাসপুর গ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র মিস্ত্রীর দ্বারা নির্মিত।

শিরোমণি : 'পাঁচখুরি' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে মেদিনীপুর সদর থানার এলাকাধীন শিরোমণি গ্রাম (জে· এল· নং ২২২)। এ গ্রামে রঘুনাথের পুবমুখী একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে কোন পোড়ামাটির সজ্জা না থাকলেও এটিতে পঙ্খ-পলস্তারায় উৎকীর্ণ হয়েছে নকাশি অলঙ্করণ।গর্ভগৃহে প্রবেশপথের দুপাশে পঙ্খ-পলস্তারায় নির্মিত দুটি দ্বারপালের মূর্তি দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০′ (৬·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)। জনশ্রুতি যে, কর্ণগড়ের রানী শিরোমণিই নাকি এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য-শৈলী বিচারে এটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

শিলদা : ঝাড়গ্রাম-শিলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বীনপুর থানার এলাকাধীন শিলদা (জে· এল· নং ৩০৫)। এখানে নতুনবাজার এলাকায় শিলদার রানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশনাথ শিবের পশ্চিমমুখী চারচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′ (৪.৫ মি.) এবং উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)। এছাড়া এ মন্দিরের দক্ষিণ পাশে পশ্চিমমুখী আপালগঞ্জনাথের একটি আটচালা শিবমন্দিরও দেখা যায় এবং এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২′ (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)।

উল্লিখিত দুটি মন্দিরের সামান্য পশ্চিমে শম্ভুনাথ শিবের পশ্চিমমুখী এক

শিখর-মন্দিরও দেখা যায়, যেটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′ (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫.১ মি.)। পূর্ববর্ণিত তিনটি মন্দিরেই কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই, তবে আকারপ্রকারে এগুলি উনিশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

এখানের রাজকাছারী এলাকায় কিশোরকিশোরীর পুবমুখী ঝামাপাথরের আটচালা মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে পঙ্খ-পলস্তারায় খোদিত সামান্য অলঙ্করণ ছাড়া, আর তেমন কোন সজ্জা নেই। এটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯′ (৫·৭ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য পুবে দক্ষিণমুখী এক দালান-মন্দিরও দেখা যায় এবং সে মন্দিরটির খিলানশীর্ষে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি নিবদ্ধ রয়েছে। পুবদিকের দেওয়ালে পাথরের উপব খোদিত প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ/সকাব্দা ১৭৪৮/সন ১২৩৪ সাল/মাহ বৈশাখ।" অতএব ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭′ (৫·১ মি·), প্রস্থে ১৫′৬″ (৪·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১০′ (৩ মি·)।

উল্লিখিত রাজকাছারী এলাকার দক্ষিণে এক বৃহৎ পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে উমেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী একটি পঞ্চরত্ন মন্দির দেখা যায়। এ মন্দিরটি যে শিলদার রানী কিশোরমণি কর্তৃক ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তা ঐ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় এবং সে প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "৭শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ/সকাব্দা ১৭৬৭ সট্রি/সন ১২৫১ সাল য়া/মলে শ্রীশ্রীরাজাকিসোরমণি।"

শ্যামপুর : 'রাধানগর' নিবন্ধে সেখানে পৌছবাব পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে কাঁচা রাস্তায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন শ্যামপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৮১)। এ গ্রামে গোস্বামী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কিশোরীমোহন ও গোপীমোহনের একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। বর্তমানে মন্দিরটির সামনের অংশ ভেঙ্গে পড়লেও মন্দিরের গর্ভগৃহের প্রবেশ পথের দেওয়ালে উৎকৃষ্ট 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিরিখে এটি আঠারো শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলে অনুমান।

শ্যামসুন্দরপুর - পাটনা : 'মাংলই' নিবন্ধে সেখানে পৌছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখানকার পশ্চিমে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন শ্যামসুন্দরপুর মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ৬) শ্যামসুন্দরপুর-পাটনা গ্রাম। এ গ্রামে পাহাড়ী পরিবারের দক্ষিণমুখী রঘুনাথের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগে ত্রিখিলানের উপর নিবদ্ধ পোড়ামাটির অলঙ্করণ-সজ্জা ছাড়াও মন্দিরটির কাঠের কপাটের পাল্লাতেও ক্ষোদিত হয়েছে নানাবিধ পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি। এ মন্দিরে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শুভমস্তু/সকাব্দা/১৭৩৫/সন ১২২০।" অতএব ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১′৬″ (৬·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫′ (১০·৬ মি·)।

এ গ্রামের সিদ্ধিকুণ্ড-পাটনা নামে পরিচিত এলাকায় নাথযোগী সম্প্রদায়ের পরিচালিত মঠের চত্বরে সিদ্ধিনাথের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। জনশ্রুতি যে, মঠের অন্যতম মহন্ত সিদ্ধিনাথের সমাধির উপরই তদানীন্তন কাশীজোড়া

পরগণার ভূস্বামীদের আনুকূল্যে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির ত্রিখিলানের উপরিভাগে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'- অলঙ্করণ ছাড়াও, গর্ভগৃহে প্রবেশপথে নকাশি কাজযুক্ত কাঠের অলঙ্কৃত দরজাটিও এক বিশেষ আকর্ষণ। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ/শুভমস্তু শকাব্দা/১৬৮৯ সাল/সন ১১৭৫ সাল/শম্ভুনাথ।" অতএব ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২১'৬" (৬·৫ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

একই চত্বরে ঐ মন্দিরটির পুবদিকে অবস্থিত পশ্চিমমুখী আটচালা রীতির শীতলানন্দ শিব-মন্দিরটিতে কেবলমাত্র রাবণের মূর্তিযুক্ত পোড়ামাটির এক ফলক দেখা যায়। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী সিব ঠাকুর সুভমস্তু শকাব্দা/১৭৬৯ সন ১২ স ৫৪ সাল/তারিক ৪ চোইত্রি।" অতএব ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭'৬" (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। কাছাকাছি স্থাপিত বিশ্বনাথ শিবের দক্ষিণমুখী একদুয়ারী পঞ্চরথ শিখর-দেউলটিতে কোন অলঙ্করণ বা প্রতিষ্ঠালিপি নেই। তবে আকারপ্রকারে এটি পূর্ববর্ণিত মন্দিরের সমসাময়িক। বর্তমানে এ অস্থলটি দমদম-নাগের বাজারেরগোরক্ষনাথ মঠের অধীন।

শ্রীধরপুর : 'রাধাকান্তপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে দক্ষিণে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন শ্রীধরপুর গ্রাম(জে· এল· নং ১৮২)। এ গ্রামে সামন্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে খোদিত নানাবিধ পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্তি নিবদ্ধ দেখা যায়। এছাড়া মন্দিরটিতে যে কাঠের কপাটটি আছে, সেটির পাল্লায় কাঠ খোদাইয়ের অলঙ্করণগুলি একান্তই উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, আকারপ্রকারে মন্দিরটি উনিশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২'৮" (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

এ গ্রামের বেরাবাগানে বেরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত সীতারামের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন এক মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে, স্থাপত্য নিরিখে এ মন্দিরটিও প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে মন্দিরটি ১২'৮" (৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। এছাড়া এ মন্দিরের পাশে শিবের দক্ষিণমুখী এক শিখর-দেউলও অবস্থিত। সে মন্দিরে উৎকীর্ণ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

শ্রীপুর : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস বলে) খুকুড়দহ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন শ্রীপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৫১)। এ গ্রামে শীতলানন্দ শিবের পশ্চিমমুখী শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে পোড়ামাটির দ্বারপালের মূর্তি ছাড়া আর তেমন কোন অলঙ্করণ নেই। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় মন্দিরটি দাসপুর গ্রামের বৈষ্ণবদাস মিস্ত্রী কর্তৃক ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২' (৩·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪৬' (১৪ মি·)।

'জোতবাণী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে;

সেখান থেকে সামান্য উত্তরে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ১১/২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন শ্রীরামপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১১৭)। এ গ্রামে মহান্তি পরিবারের গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনজীউর দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরে প্রবেশপথের উপরিভাগে পঙ্খ-পলস্তারায় নকাশি অলঙ্করণ ছাড়া যে প্রতিষ্ঠালিপিটি আছে, সেটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী লক্ষ্মি জনাদন জী/উ চরণে স্বরনং সন ১২/৪৩ সাল তারিখ ১৫ আ/সাড়ে আরভ কত্তা শ্রীজুৎ/গদাধর উধিকারি কা/রিকর শ্রীবিন্দাবন চন্দ্রমি/স্ত্রী সাং দাসপুর।" অতএব ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২'৮" (৪ মি.) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

শ্রীরামপুর : 'করকাই' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে প্রায় ১/২ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার এলাকাধীন শ্রীরামপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৩৯)। এ গ্রামে জানা পরিবারের লক্ষ্মীজনার্দনের দক্ষিণমুখী ইঁটের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের খিলানশীর্ষে যে পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার নানাবিধ কাহিনী। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যে মন্দিরটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭'৬" (৫.৩ মি) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

সত্যপুর : 'পাইকপাড়ি' নিবন্ধে. সত্যপুর পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; ডেবরা থানার এলাকাধীন এ গ্রামের (জে· এল· নং ২৬০) মাড়োতলায় মাকড়া পাথরের সত্যেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী শিখর-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। ওড়িশা স্থাপত্যশৈলী প্রভাবিত এ মন্দিরের সম্মুখভাগে বেঁকির নিচে গণ্ডী অংশে প্রায় ৩'৩" (১ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট পাথরের এক বিষ্ণুমূর্তি নিবদ্ধ রয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় সতের শতকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান।

সত্যেশ্বর শিব-মন্দিরের উত্তর গায়ে দক্ষিণমুখী শিবের আটচালা মন্দিরটির স্থাপত্য একান্তই অভিনব। কারণ এ মন্দিরটি শিখর-মন্দিরের মতই ত্রিরথ করে নির্মাণ করা হয়েছে। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

গ্রামের বাঁড়ুজ্জেপাড়ায় স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের শীতলানন্দের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটিতে সামান্য 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ দেখা যায়, তবে কোন প্রতিষ্ঠালিপি নেই। সেজন্য স্থাপত্য নিরিখে মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষদিকে নির্মিত হয়ে থাকবে বলেই অনুমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২৩'৪" (৭·১ মি·) ও উর্চ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·২ মি·)। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের নচূড়াবিশিষ্ট আটকোণা রাসমঞ্চটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ রাসমঞ্চটিতেও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়, যার ভাস্কর্যশৈলী তেমন উৎকৃষ্ট নয়।

সবং : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক - সবং পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সবং থানার এলাকাধীন সদর (জে· এল· নং ২৯৩)। এখানে পাহান পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যাম চাঁদের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হলেও, বর্তমানে সেটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রায়। একদা এ মন্দিরটিতে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ ছিল। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলেই অনুমান।

আলোচ্য এ মন্দিরটির অদূরে কপালেশ্বরী নদীর ধারে প্রায় ৪′ (১·২ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পাথরখোদাই বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায়, যা ভাস্কর্য বিচারে খ্রীষ্টীয় বারো-তেরো শতকের বলেই অনুমান।

কাছাকাছি কসবা সবং পল্লীতে রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের পুবমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে রামসীতা, কৃষ্ণরাধা ও বন্দুকধারী যোদ্ধা প্রভৃতির মূর্তিসমন্বিত পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ হয়েছে। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই অনুমান।

সয়লা : পাঁশকুড়া-ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) সুলতাননগর থেকে পুবে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার অন্তর্গত সয়লা গ্রাম (জে· এল· নং ১৭১)। এ গ্রামে স্থানীয় সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে কোন পোড়ামাটির অলঙ্করণ না থাকলেও সেটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫′৯″ (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)। মন্দিরটির গর্ভগৃহে একটি নকাশি অলঙ্করণযুক্ত কাঠের কপাটও লক্ষ্য করা যায়।

সরবেড়িয়া : 'জয়কৃষ্ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে মোরাম রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন সরবেড়িয়া গ্রাম (জে· এল· নং ১০৪)। এ গ্রামে পণ্ডিত পরিবারের সত্যনারায়ণের দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা'-ফলকগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-বলরাম ও তৎসহ তাঁদের দশটি সখার মূর্তি বেশ দ্রষ্টব্য। মন্দিরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দাসপুরের শিল্পী হরহরি চন্দ্র কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′ (৪·৯ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

এ গ্রামের পাশাপাশি হাট সরবেড়িয়াতে ঘোষ পরিবারের শ্রীধরজীউর দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরটিতেও একসারি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক 'টেরাকোটা'-অলঙ্করণ দেখা যায়। সেটিতে নিবদ্ধ এক উৎসর্গলিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৬′ (৪·৯ মি·), প্রস্থে ১৫′ (৪·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

সহস্রলিঙ্গ : 'চন্দ্ররেখা' নিবন্ধে বালিগেড়িয়া পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে দক্ষিণে বালিগেড়িয়া-ধূমসাই পিচের সড়কে পলাশিয়া থেকে পশ্চিমে ৩ কিলোমিটার দূরত্বে নয়াগ্রাম থানার এলাকাধীন সহস্রলিঙ্গ ওরফে সন্তনি গ্রাম (জে· এল· নং ১৯১)। এখানে পশ্চিমমুখী পীঢ়া জগমোহনসহ মাকড়া পাথরে নির্মিত ওড়িশী শৈলীর শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ শিবলিঙ্গের গায়ে দশটি সারিতে একহাজারটি লিঙ্গমূর্তি খোদিত হওয়ায় এটি সহস্রলিঙ্গ শিব নামে খ্যাত। জনশ্রুতি যে, এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্ররেখাগড়ের রাজা চন্দ্রকেতু স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে এই মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মূল মন্দিরটি ১৬′(৪·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৬০′ (১৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে নির্মিত বলেই অনুমান। মন্দির প্রাঙ্গনে বেশ কয়েকটি ভগ্ন প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়।

সাউরি 'দামোদরপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে;

সেখানকার পার্শ্ববর্তী দাঁতন থানার অন্তর্গত গ্রাম সাউরি (জে· এল· নং ২৬৭)। এ গ্রামেব শীতলাতলায় শীতলার পুবমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। প্রতিষ্ঠালিপির অভাবে মন্দিরটি স্থাপত্যনিরিখে উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪′ (৪·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·১ মি·) এবং জগমোহনটি দৈর্ঘ্যে ১০′৬″ (৩·২ মি·), প্রস্থে ৮′৬″ (২·৫মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১০′ (৩ মি·)।

সাগরপুর : 'দাসপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে **পুবে প্রায়** ৪ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন সাগরপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৯২)। এ গ্রামে হাইত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরজীউর একরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এ মন্দিরের সম্মুখভাগ এখন বিধ্বস্ত হলেও, সেখানে বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক বর্তমান। এছাড়া, এ মন্দিরে ব্যবহৃত কাঠের দরজাটির পাল্লায় নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৬′৮″ (৫·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ মন্দিরটি স্থাপত্য নিরিখে আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

সামাট : 'জনার্দনপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে কাঁসাইয়ের শাখানদী পার হয়ে প্রায় $^1/_2$ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন সামাট গ্রাম (জে· এল· নং ২৩)। এ গ্রামের উত্তরপাড়ায় পণ্ডা পরিবারের রঘুনাথের দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হলেও সেটিতে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক দেখা যায়। এছাড়া এ মন্দিরে নিবদ্ধ বাদিকা ও দ্বারপালিকার পোড়ামাটির মূর্তিগুলির ভাস্কর্য বেশ উৎকৃষ্ট। মন্দিরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬·১ মি·)।

গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় রামানুজ সম্প্রদায়ের মদনগোপালের দক্ষিণমুখী দালান মন্দিরটিতে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিসমন্বিত বেশ কিছু 'টেরাকোটা'-ফলক দেখা যায়। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪৩′ (১৩·১ মি·), প্রস্থে ৩২′৬″ (৯·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)।

সারতা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-দেহাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) চাঁদকুড়ি থেকে পুব-দক্ষিণে হাঁটাপথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার এলাকাধীন সারতা গ্রাম (জে· এল· নং ৩৪১)। এখানে দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সম্মুখভাগে কৃষ্ণ, দশাবতার ও বাদক-বাদিকার মূর্তি খোদাই একসারি পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া মন্দিরে উৎকীর্ণ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ১৭′ (৫·১ মি·), প্রস্থে ২৫′ (৭·৬ মি) ও উচ্চতায় প্রায় ৫০′ (১৫·২ মি·)। মন্দিরটির সামনের চত্বরে সতের চূড়াযুক্ত বৃহদাকার রাসমঞ্চটিতে ফুলপাতা ও জ্যামিতিক নকসাযুক্ত পঙ্খের অলঙ্করণ দেখা যায়। রাসমঞ্চের কাছাকাছি একটি পুকুরঘাটের দুপাশে প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা মন্দিরের স্থাপত্য শিখর-মন্দিরের মতই রথপগ বিন্যাস করা—যা একান্তই অভিনব। এ

মন্দির দুটির দেওয়ালে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেদুটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরের নির্মাণকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাহাচক : মহাকালপোতা নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখানকার সংলগ্ন উত্তরে দাসপুর থানার এলাকাধীন সাহাচক গ্রাম (জে· এল· নং ১৭৭)। এ গ্রামে নীলকণ্ঠ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ পীঢ়াদেউলের যে প্রতিকৃতিগুলি দেখা যায়, তা একান্তই অভিনব। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীনীলকণ্ঠ শিব ঠাকুর/সাং শাহাচক।/শকাব্দা ১৮১০ সন ১২৯৫ সাল/তারিখ ২৮ পৌষ।/মিস্ত্রি।/শ্রীশিবনারাণ দে/সাং দাশপুর।" অতএব ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি ঠিক পুরাকীর্তির পর্যায়ে না পড়লেও, এ মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিতে স্থপতির নামের যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১'৬" (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭' (৫·২ মি·)।

সাহারা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক-ময়না-সবং-দেহাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) মুণ্ডমারী ; সেখান থেকে কাঁচা রাস্তায় পশ্চিমে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরত্বে পিংলা থানার এলাকাধীন সাহারা গ্রাম (জে· এল· নং ৪)। এ গ্রামের ভট্টচার্য পরিবারের পুবমুখী রঘুনাথের নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির খিলানশীর্ষে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যে পোড়ামাটির ফলক নিবদ্ধ রয়েছে তার কারিগরি বেশ উচ্চাঙ্গের। এ মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "সকাব/দা ১৭২১/সন ১২০৬/সালে সায়।" অতএব ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫'৬" (৪·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৪০' (১২·১ মি·)। এছাড়া, এ মন্দিরটিতে কৃষ্ণলীলা ও দশাবতার বিষয়ক খোদাইকাজযুক্ত কাঠের কপাটটিও বেশ আকর্ষণীয়।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে মিশ্র পরিবারের পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। যদিও মন্দিরটি বর্তমানে পরিত্যক্ত, তাহলেও একদা এটিতে উৎকৃষ্ট পঙ্খের অলংকরণ ছিল। প্রতিষ্ঠালিপিহীন, এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১২' (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)।

সিংপুর : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের বালীচক স্টেশন থেকে বালীচক- দেহাটি পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বাদলপুর ; সেখান থেকে হাঁটাপথে পশ্চিমে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে সবং থানার অন্তর্গত সিংপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৭০)। এখানে দে পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরজীউর পুবমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে একদা বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকসজ্জা ছিল, বর্তমানে সংস্কারের সময়ে সেগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এটিতে দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ একটি কাঠের কপাটও দেখা যায়। দৈর্ঘ্য প্রস্থে মন্দিরটি ২২' (৬·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, স্থাপত্য নিরিখে মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

এ মন্দিরের উত্তরে আর একটি দক্ষিণমুখী আটচালা শিব-মন্দির দেখা যায়। সে মন্দিরটিতে পোড়ামাটির দুটি দ্বারপাল ছাড়া আর কোন অলঙ্করণ দেখা যায় না।

মন্দিরটি আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসাময়িক বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ৮′ (২·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩′ (৪ মি·)।

সিদ্ধা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা থেকে মেছেদা-খড়্গপুর জাতীয় সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন সিদ্ধা (জে· এল· নং ২২৭)। এখানে পুবমুখী শীতলানন্দ শিবের শিখর-দেউলটি এক পুরাকীর্তি। অলঙ্করণবিহীন, এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও, আকারপ্রকারে সেটি আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলেই মনে হয়।

মন্দির প্রাঙ্গনে এক গাছতলায় রক্ষিত পাথরের একটি সূর্যমূর্তি একান্তই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গঠনশৈলী বিচারে এ মূর্তিটি দশ-এগারো শতকের বলেই অনুমান।

সিমুলিয়া : 'ভগবানপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে পশ্চিমে ভগবানপুর-পটাশপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে ভগবানপুর থানার এলাকাধীন সিমুলিয়া গ্রাম (জে· এল· নং১২৫)।

এখানে সড়কের দক্ষিণ ধারে অবস্থিত দেবী ভীমেশ্বরীর বিশাল আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। দুঃখের বিষয়, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মন্দিরটির সম্মুখভাগ বর্তমানে বিধ্বস্ত। বিগ্রহ পুত্রকন্যাসহ দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ২০′ (৬·১ মি·) এবং উচ্চতায় প্রায় ৪৫′ (১৩·৭ মি·)। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি ভাস্কর্য বিচারে আঠারো শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান।

আলোচ্য এ মন্দিরের প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে শিমুলেশ্বর শিবের শিখর-দেউলটিও এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক না থাকলেও স্থাপত্যবিচারে সেটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলেই অনুমান।

সুন্দরনগর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে পাঁশকুড়া-তমলুক পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) রঘুনাথবাড়ি ; সেখান থেকে পুবে কাঁচা রাস্তায় প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন সুন্দরনগর গ্রাম (জে· এল· নং ৩৩৫)। এ গ্রামে কাশীযোড়া পরগণার ভূস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায়ের দক্ষিণমুখী দালান-মন্দিরটি এখানকার এক পুরাকীর্তি। মন্দিরটির প্রবেশপথের উপর নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউ/সকাব্দা ১৭৬৮/সন ১২৫৩ সাল/তারিখ ২৫ আশ্বিন।"

অতএব ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির গর্ভগৃহের ছাদ টানা-খিলেন করে নির্মিত।

সুরতপুর : 'খোর্দা বিষ্ণুপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে; সেখান থেকে উত্তরে দাসপুরে থানার অন্তর্গত সুরতপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৪১)। এ গ্রামে হাজরা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী শীতলার পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সামনের দেয়ালে অজস্র পোড়ামাটির ফলকসজ্জা বিদ্যমান এবং সেগুলির বিষয়বস্তু হল, রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার নানাবিধ কাহিনী। কার্নিসের নিচে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রীসি/তলা মাতা/সকাব্দা/১৭৭১/সন ১২ স/৫৬ সাল।"

এ লিপিটি ছাড়াও পুব দেওয়ালে যে আরো একটি প্রবেশপথ রয়েছে সেটির উপরিভাগে পঙ্খ-পালস্তারায় উৎকীর্ণ লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী সিতলা

মাতা/সকাব্দা ১৭৭১ সন ১২৫৬/সাল তারিখ ১৮ বৈসাখ/পরিচারক শ্রীযুক্ত/সেত্রুখণ হাজরা মিস্ত্রি ঠাকুর দাস সিল/সাকিম দাসপুর পরগণে চেতুয়া ইতি।”

অতএব ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটির স্থপতি ঠাকুরদাস শীল যে এ জেলার আরও অন্যান্য মন্দির নির্মাণ করেছেন, তার বিবরণ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

সুরা-নয়নপুর : ‘ডিহি চেতুয়া’ নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন সুরা-নয়নপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৪৬)।এ গ্রামে স্থানীয় চক্রবর্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমমুখী পার্বতীনাথ শিবের যে শিখর-দেউলটি দেখা যায়, সেটিতে নিবদ্ধ হয়েছে রাধাকৃষ্ণ ও মিথুন ফলক। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্য প্রস্থে মন্দিরটি ৭′৬″ (২·২ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১৩ (৪ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে শীতলানন্দ শিবের দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দিরটি অবস্থিত সে মন্দিরে নিবদ্ধ শিবদুর্গার ‘টেরাকোটা’-ফলকটি বেশ আকর্ষণীয়। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে সেটি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১১′·(৩·৪ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ১৭′ (৫·২ মি·)

সুলতানপুর : ‘খড়ার’ নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে খড়ার - সুলতানপুর পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) ঘাটাল থানার এলাকাধীন সুলতানপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৫)। এ গ্রামের মণ্ডলপাড়ায় মণ্ডল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সামনের দেওয়ালে নিবদ্ধ যে পোড়ামাটির ফলকসজ্জা দেখা যায়, তার বিষয়বস্তু হল, দশাবতার ও কৃষ্ণলীলার নানাবিধ কাহিনী। কার্নিসের নিচে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৮′ (৫·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৩′ (১০·১ মি·)।

গ্রামের বক্সীপাড়ায় বক্সীপরিবারের দামোদরজীউর পশ্চিমমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, মন্দিরটি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৩′৬″ (৪·১ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০′ (৯·২ মি·)।

আলোচ্য মন্দিরটির লাগোয়া উত্তরে আর একটি পশ্চিমমুখী শিখর শিব মন্দির দেখা যায়। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটিও আকারপ্রকারে পূর্বোক্ত মন্দিরের সমসমায়িক। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৯′ (২·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২০′ (৬ মি·)।

উল্লিখিত এ দুটি পশ্চিমমুখী মন্দিরের সামনে দক্ষিণমুখী দশভূজার একটি দালান-মন্দিরও দেখা যায়। এ মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে।

সৈঁকুয়া : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর স্টেশন থেকে খড়্গপুর-বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) বেনাপুর বাজার ; সেখান থেকে পুবমুখী মোরাম রাস্তায় প্রায় ৫ কিলোমিটাব দূরত্বে খড়্গপুর লোক্যাল থানার এলাকাধীন সৈঁকুয়া গ্রাম (জে· এল· নং ৩৯৮)। এ গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি হল, হাটপাড়ায় অবস্থিত চন্দনেশ্বর শিবের মাকড়াপাথরের পশ্চিমমুখী পীঢ়া-দেউল। এখানকার মূল মন্দির ও জগমোহন দুটিই

ছোট-বড় আকারের পীঢ়া রীতির এবং মন্দিরের ছাদ লহরা পদ্ধতিতে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি, আকারপ্রকারে ষোল শতকে প্রতিষ্ঠিত বলেই অনুমান। মন্দিরটির দক্ষিণপাশে রক্ষিত একটি চামুণ্ডা মূর্তি নাকি পাশাপাশি আর একটি মন্দিরে রক্ষিত ছিল এবং সে মন্দির ভগ্ন হওয়ায় মূর্তিটিকে এখানে এনে রাখা হয়েছে।

সোনাখালি : 'সয়লা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন সোনাখালি গ্রাম (জে· এল· নং ১৭২)। এ গ্রামের হাটতলায় পশ্চিমমুখী পঞ্চানন শিবের আটচালা মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দৃশ্য খোদিত ছাড়াও বেশ কিছু কামবদ্ধ নরনারীর মূর্তিফলকও দেখা যায়। মন্দিরটিতে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গিবান্ধা গ্রামের জনৈক কৃপাবাম সেন এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৮′ (৫·৫ মি·), প্রস্থে ১৫′৯″ (৪·৮ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২ মি·)।

সোনামুই : পাঁশকুঁড়া ঘাটাল পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) দাসপুর থানার এলাকাধীন সোনামুই গ্রাম (জে· এল· নং ৮৬)। এ গ্রামে অধিকারী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পুবমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দিরে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটিতে সামান্য পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়া আর কোন সজ্জা নেই। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৪′ (৪·৩ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫′ (৭·৬ মি·)।

সৌলান : 'জয়কৃষ্ণপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ½ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন সৌলান গ্রাম (জে· এল· নং ১০৫)। এ গ্রামের পুবপাড়ায় অধিকারী পরিবারের শ্যামসুন্দরের দক্ষিণমুখী, পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে নিবদ্ধ রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলা কাহিনী অবলম্বনে খোদিত টেরাকোটা'-ফলকগুলির ভাস্কর্য যে অতি উৎকৃষ্টমানের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ মন্দিরে কাঠ-খোদাইযুক্ত কাঠের কপাটটিও বেশ মনোরম। কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, আকারপ্রকারে মন্দিরটি আঠারো শতকের শেষদিকে নির্মিত বলেই অনুমান। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি ১৮′ (৫·৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭′ (৮·২মি·)। এ মন্দিরের সামান্য উত্তরে এই পরিবারের ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণমুখী দুর্গামণ্ডপটির লাগোয়া শ্যামসুন্দরের ন'চূড়া আটকোণা রাসমঞ্চটির প্রতি কোণে নিবদ্ধ পোড়ামাটির বিভিন্ন বাদিকামূর্তি ছাড়াও আর যে পোড়ামাটির অলঙ্করণ দেখা যায় সেগুলির বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা, রামসীতা, কমলেকামিনী প্রভৃতি। এছাড়া কাছাকাছি স্থাপিত দক্ষিণমুখী তিনটি একদুয়ারী আটচালা শিবমন্দির ও শীতলার একটি দক্ষিণমুখী সপ্তরথ শিখর-দেউল সংরক্ষণের অভাবে এখন জীর্ণ হলেও, আকারপ্রকারে দেবালয়গুলি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

এ গ্রামের ব্রাহ্মণ পাড়ায় ভূঁইঞা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর ন'চূড়া আটকোণা রাসমঞ্চটিও এক দ্রষ্টব্য। সে রাসমঞ্চে নিবদ্ধ এক প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এ রাসমঞ্চে উৎকীর্ণ টেরাকোটা'-ফলকের বিষয়বস্তু হল, কৃষ্ণ-যশোদা, কমলেকামিনী রাম-সীতা ও নবনারীকুঞ্জর প্রভৃতি।

হরিণাগেড়িয়া : ইয়াকুবপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ;

সেখান থেকে দক্ষিণে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে ঘাটাল থানার এলাকাধীন হরিণাগেড়িয়া গ্রাম (জে· এল· নং ৮৮)। এ গ্রামে সিংহহাজারী পরিবারের রঘুনাথজীউর দক্ষিণমুখী নবরত্ন মন্দিরটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। মন্দিরটির সম্মুখভাগে পঙ্খের অলঙ্করণ ছাড়াও পোড়ামাটির সজ্জাও রয়েছে এবং সেসব ফলকের বিষয়বস্তু মূলতঃ দশাবতার ও কৃষ্ণ-যশোদা প্রভৃতি। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠাফলক নেই, তবে স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে এটি উনিশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত বলেই অনুমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১১'৯" (৩·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩০' (৯·১ মি·)।

আলোচ্য এ মন্দিরটির সামান্য উত্তরে এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বর শিবের পশ্চিমমুখী মন্দিরটির গঠনস্থাপত্য একান্তই অভিনব। মন্দিরটির আকৃতি শিখর রীতির হলেও বরণ্ডের উপরের অংশটি ঘণ্টা আকৃতির। এ মন্দিরে শিব-দুর্গার 'টেরাকোটা'-ফলক ছাড়াও বেশ কিছু পঙ্খের নকাশি-অলঙ্করণ রয়েছে। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে মন্দিরটি৮(২·৪ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ১০' (৩·১ মি·)।

হরিপুর : 'ব্রাহ্মণখলিশা' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাঁতন থানার এলাকাধীন হরিপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩১৮)। এ গ্রামেব উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি হল স্থানীয় মাইতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী ইঁটের সিদ্ধেশ্বর শিবের একরত্ন মন্দির। এ মন্দিরের একটিমাত্র চূড়ার পরিসর, প্রায় গোটা ছাদের বিস্তারের কাছাকাছি হওয়ায়, এটিকে শিখর-দেউলের মত দেখায়। ঠিক এই ধরনের স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যযুক্ত মন্দিরের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে 'আদাসিমলা' নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২'৬" (৩·৮ মি) ও উচ্চতায় প্রায় ২৭' (৮·২ মি·)। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, বিগ্রহের গৌরীপট্টে, ওড়িয়া ভাষায় উৎকীর্ণ যে লিপিটি আছে, তা থেকে জানা যায় মন্দিরটি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আলোচ্য এই মাইতি পরিবারের বাড়ির সদর-দেউড়ীটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কারণ সেটির কাঠের খুঁটিতে ও কড়ি বরগায় যে নানাবিধ খোদাই কাজ দেখা যায়, তা একান্তই মনোরম। দুঃখের বিষয়, কাঠখোদাইয়ের এই মূল্যবান ভাস্কর্য-নিদর্শনটি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রমশঃ ধ্বংস হতে চলেছে।

হরিরামপুর : 'সুরা-নয়নপুর' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে পশ্চিমে প্রায় ২ কিলোমিটার দূরত্বে দাসপুর থানার এলাকাধীন হরিরামপুর গ্রাম (জে· এল· নং ৩৮)। এ গ্রামে শীতলানন্দ শিবের পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরটির সামনের দেওয়ালে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে রূপায়িত হয়েছে লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী। মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও স্থাপত্য বিচারে এটি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়ে থাকবে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ১৭' (৫·২ মি·), প্রস্থে ১৬'৬" (৫ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৩' (৭ মি·)।

হরেকৃষ্ণপুর : 'মাংলই' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখানকার পার্শ্ববর্তী পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত পাতন্দা মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ২৩) হরেকৃষ্ণপুর গ্রাম। এ গ্রামের জানা পাড়ায় জানা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত পুবমুখী শ্রীধরজীউর নবরত্ন মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। এ মন্দিরের সম্মুখভাগে নিবদ্ধ কৃষ্ণলীলা ও লঙ্কাযুদ্ধ বিষয়ক পোড়ামাটির অলঙ্করণ-সজ্জা ছাড়া, মন্দিরের ত্রিখিলানের উপর

উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী শ্রীধর জিউ শকাব্দা ১৭৭৬/বাঙ্গালা সন ১২৬১ সাল।" অতএব ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এ মন্দিরটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৯' (৫·৭ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫' (১০·৬ মি·)। এই পরিবারের নির্মিত আটকোণা ন'চূড়া বিশিষ্ট রাসমঞ্চটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাসমঞ্চটির প্রতি কোণে পোড়ামাটির নিরেট বিভিন্ন বাদিকামূর্তি নিবদ্ধ এবং এটির পাঁচ লাইন উৎসর্গলিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী খিরদশাই দধিপাবন জিউ সেবাইত/শ্রী সিদ্ধেশ্বর জানা সাকিন হরেকৃষ্ণপুর/পরগণে কিঃ কাশিজোড়া সকাব্দা ১৮···/সন ১২৬৩ সাল শ্রীবদন চন্দ্র মিস্ত্রি/সাকিম কলমিজোড়।" অতএব রাসমঞ্চটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

হাসিমপুর : 'কেশিয়াড়ী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দক্ষিণে কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত হাসিমপুর গ্রাম (জে· এল· নং ১৪৮)। এখানে স্থানীয় পতি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাম-সীতার ঝামাপাথরের পুবমুখী দালান-মন্দিরটি এক পুরাকীর্তি। মন্দির দেওয়ালে পঙ্খ-পলস্তারায় ক্ষোদিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতির মূর্তি দেখা যায় এবং উত্তর দেওয়ালে একটি মিথুন-ফলকও নিবদ্ধ আছে। মন্দিরটি দালান রীতির হলেও এটির গর্ভগৃহের ছাদ পাশখিলানসহ চার দেওয়ালের কোণে উদ্গত লহরার উপর স্থাপিত গম্বুজ দ্বারা নির্মিত। প্রায় ১২' (৩·৬ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট এ মন্দিরটিতে কোন প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, পারিবারিক শ্রুতি ও স্থাপত্যশৈলীর নিরিখে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ দিকে নির্মিত বলে মনে হয়।

কাছাকাছি নুরদীপুর পল্লীতে সাউ পরিবারের পুবমুখী রাধাকৃষ্ণের পঞ্চরত্ন মন্দিরটিও এক পুরাকীর্তি। অলঙ্করণহীন এ মন্দিরটির স্থাপত্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাহল, প্রথাগতভাবে বাঁকানো চালের পরিবর্তে দালান রীতির মন্দিরে চূড়া সংযোগ করে পঞ্চরত্ন রীতির রূপ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২৫' (৭·৬ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট, প্রতিষ্ঠালিপিহীন এ মন্দিরটি আকারপ্রকারে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে মনে হয়।

হিজলী : 'খেজুরী' নিবন্ধে সেখানে পৌঁছবার পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে ; সেখান থেকে দক্ষিণে হাঁটা পথে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরত্বে সমুদ্রতীরবর্তী খেজুরী থানার এলাকাধীন নিজকসবা মৌজাভুক্ত (জে· এল· নং ১১৯) হিজলী। এখানে বিখ্যাত তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলার উত্তরমুখী তিন গম্বুজ মসজিদটি এক পুরাকীর্তি। তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ছিলেন একদা হিজলীর অধিপতি। ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে আজও তিনি পীররূপে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র। আলোচ্য এ মসজিদে নিবদ্ধ এক লিপি থেকে জানা যায় যে, সেটি ১৬৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৪৯'৪" (১৫ মি·), প্রস্থে ২৫' (৭·৬ মি·) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫' (৭·৬ মি·)।

হীরাপাড়ি : খড়্গাপুর - বেলদা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) উকুনমারি ; সেখান থেকে পশ্চিমে হাঁটাপথে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে নারায়ণগড় থানার এলাকাধীন হীরাপাড়ি গ্রাম (জে· এল· নং ৪৬৫)। এ গ্রামে একটি গাছের তলায় ৪'৬" (১·৩ মি·) উচ্চতাবিশিষ্ট একটি পাথরের বিষ্ণুমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া একটি বিরাটাকার আমলক-শিলাও এর পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভাস্কর্যশৈলী অনুসারে মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় এগারো-বারো শতকের বলেই অনুমান। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর

খণ্ড, আমলক-শিলা ও এই বিষ্ণুমূর্তিটি দেখে অনুমান করা যায় যে, সম্ভবতঃ এখানে একটি বিরাট মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেখানে এই বিষ্ণুমূর্তিটি বিগ্রহ হিসাবে পূজিত হত।

হোগলা : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের মেছেদা স্টেশন থেকে মেছেদা - মানিকতলা পিচের সড়কে (নিয়মিত বাস চলে) কাঁকটিয়া ; সেখান থেকে পুবে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরত্বে তমলুক থানার এলাকাধীন হোগলা গ্রাম (জে· এল· নং ৪২)। এ গ্রামে কর পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদরজীউর দক্ষিণমুখী জগমোহনযুক্ত শিখর-দেউলটি এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি। জগমোহনের পশ্চিম দেওয়ালে পদ্ম-পলস্তারায় উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠালিপির পাঠ নিম্নরূপ : "শ্রীশ্রী সম্ভোধমেসু। শ্রীনিমাই/চরণ করস্য পঞ্চ সহোদরা পা/দ পদ্মো-বত্রিত সকাব্দ ১৭২০/সন ১২০৫ সাল তারিখ ৫ অঘ্রাণ।" অতএব ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটিতে নিবদ্ধ দরজার পাল্লায় উৎকীর্ণ কাঠ-খোদাইয়ের কাজ একান্তই আকর্ষণীয়।

গ্রন্থপঞ্জী

আইচ, কে·সি — হিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট অফ্ দি মহিষাদল রাজ এস্টেট ঃ ১৯৪৫

ও' ম্যালী, এল·এস·এস· — বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স, মিডনাপোর ঃ ১৯১১

করণ, মহেন্দ্রনাথ — হিজলীর মসনদ-ই-আলা (২য় সং)ঃ ১৯৫৮

কুণ্ডু, কমল — 'ভারতের হরপ্পা তমলুক' (প্রবন্ধ)ঃ দৈনিক বসুমতী, ৩ চৈত্র, ১৩৮৩

খাঁড়া, সুধীর — 'শিলাবতীর প্রত্নতাত্ত্বিক পটভূমি' (প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ৫ম সংখ্যা, ১৩৭৮

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার — বাংলার ভাস্কর্য ঃ ১৯৪৭

গুঁই, রাধাশ্যাম — মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ' (প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ১২শ সংখ্যা, ১৩৮২

গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ — শ্রীশ্রীচৈতন্যচবিতামৃত (বইপত্র সং)ঃ ১৩৮৮

গোস্বামী, রামানন্দ — গোবর্ধন চরিতঃ ১৯৫৬

ঘটক, অধর — নন্দীগ্রাম ইতিবৃত্ত ঃ ১৯৬৪

ঘটক, শম্ভুনাথ — 'গড়বেতার আগুইবনীব প্রত্ন-ঐশ্বর্য' (প্রবন্ধ)ঃ গড়বেতা কলেজ পত্রিকা, ১৯৭৬

ঘোষ, দেবপ্রসাদ — ভাবতীয় শিল্পধারাঃ প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তব ভাবত, ১৯৮৬

ঘোষ, বিনয় — পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (২য় খণ্ড)ঃ ১৯৭৮

চক্রবর্তী, দেবকুমাব — 'পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিক প্রত্নানুসন্ধান' (প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ১০ম সংখ্যা, ১৯৭৬

চক্রবর্তী, পঞ্চানন — রামেশ্বর রচনাবলী ঃ ১৩৭১

চন্দ্র, ব্রজনাথ — শোলাঙ্কি বা শুক্লি জাতিব আদি বৃত্তান্তঃ ১৩১৪

চৌধুরী, শশীভূষণ — এথনিক সেটেলমেন্ট ইন অ্যানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়াঃ ১৯৫৫

জানা, সুরেন্দ্রনাথ — বৃহত্তর ময়নার ইতিবৃত্ত ঃ ১৯৭১

দত্ত, অক্ষয়কুমার — ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১ম ও ২য় ভাগ)ঃ ১৩৭৬

দাশগুপ্ত, পরেশচন্দ্র — 'স্টোরী অভ্ অ্যা ফরগটন্ সিভিলিজেশন্' (প্রবন্ধ)ঃ দি উয়ীকলি ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১২·১০·১৯৬১

দাস, কৃষ্ণচরণ — শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ঃ ১৩৮৪

দাস, দীপকরঞ্জন — 'বালিহাটির জৈন মন্দির'(প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ১০ম সংখ্যা, ১৯৭৬

দাস, নরেন্দ্রনাথ — দি হিস্ট্রি অভ্ মিডনাপোর (ভল্যুম ওয়ান)ঃ ১৯৭২

দাস, পূর্ণচন্দ্র — কাঁথির লোকাচার, ১৯৭৮

দে, সুধীন — 'লালজলের প্রত্নানিদর্শন' (প্রবন্ধ)ঃ অন্বেষা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৩

পতিশর্মা, রাধানাথ — কেশিয়াড়ি ঃ মেদিনীপুর, ১৩২৩

প্রাইস, জে·সি· — নোটস্ অন দি হিস্ট্রি অভ্ মিডনাপোর ঃ ১৮৭৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার — দেখা হয় নাই, ১৩৮০
— বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি (২য় সং)ঃ ১৯৭৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত — রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহ ও শ্রীশ্রীসিশালাক্ষ্মী মাতার ইতিবৃত্ত, ১৯৪১

বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত — 'অতীতের হাতছানি' (প্রবন্ধ)ঃ বিশেষ্য, মেদিনীপুর, ১৯৭৮

বসু, ত্রিপুরা — 'আঞ্চলিক ইতিহাসের বৃত্তে বাহিরীর জগন্নাথ মন্দির' (প্রবন্ধ)ঃ বিশ্ববাণী, অগ্রহায়ণ, ১৩৯১
— 'হিজলী রাজ্য ও মসনদ-ই-আলা প্রসঙ্গে' (প্রবন্ধ)ঃ সমকালীন, শ্রাবণ, ১৩৮৮

বসু, প্রবোধচন্দ্র — মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার ইতিবৃত্তঃ কলিকাতা, ১৯৭৬

বসু, যোগেশচন্দ্র — মেদিনীপুরের ইতিহাসঃ কলিকাতা, ১৯৩৬

বসু, সন্তোষ — 'ভারতীয় শিল্পকলায় দেহজশ্রমের অভিব্যক্তি (২য় পর্ব) (প্রবন্ধ)ঃ পট, ১ সংখ্যা, ১৯৮৫

বেলী, এইচ·ভি — মেমর‍্যান্ডা অভ্ মিডনাপোর ঃ কলিকাতা, ১৯০২

ভৌমিক, প্রবোধকুমার — মেদিনীপুরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ঃ ১৯৮৪

মজুমদার, রমেশচন্দ্র — বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ)ঃ ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮১

মণ্ডল, প্রশান্তকুমার — 'ইওসিনিক ফসিলস্ ফাউন্ড ইন্ তমলুক' (প্রবন্ধ)ঃ দি টেলিগ্রাফ, ১৫·২·১৯৮৪

মান্না, শিবেন্দু — 'জগন্নাথ মন্দিরঃ বাহিরী-দেউলবাড়' (প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ১০ম সংখ্যা, ১৩৭৯
— 'মেদিনীপুরের এক সুপ্রাচীন দুর্গ' (প্রবন্ধ)ঃ সাপ্তাহিক বসুমতী, ১০·২·১৯৭২

মিচেল, জর্জ (সম্পাদিত) — ব্রিক টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গল-ফ্রম দি আর্কাইভস্ অভ্ ডেভিড ম্যাককাচ্চন ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, নিউ জার্সি, ১৯৮৩

মিত্র, অশোক (সম্পাদিত) — ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস্-মিডনাপোর, ১৯৫১ঃ কলিকাতা, ১৯৫১
— 'নিওলিথিক ইমপ্লিমেন্টস্ ফ্রম তাম্রলিপ্ত' (প্রবন্ধ)ঃ ইন্ডিয়ান ফোকলোর, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮
— লেট মিডিভ্যাল টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গলঃ কলিকাতা, ১৯৭২
— 'নোটস্ অন্ সাম রিপ্রেজেন্ট্যাটিভ টেম্পলস্ অভ্ মিড়নাপোর ডিস্ট্রিক্ট' (প্রবন্ধ)ঃ সেনসাস্ হ্যান্ডবুক-মিডনাপোর, ১৯৬১ঃ কলিকাতা, ১৯৬৬

রক্ষিত, ত্রৈলোক্যনাথ — তমোলুকের ইতিহাসঃ ১৮৭৪

রাজপণ্ডিত, তাপসকান্তি — 'বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে কোলাঘাট' (প্রবন্ধ)ঃ রজত স্বাক্ষর, ১৯৭৩

রায়, অনিরুদ্ধ — 'সপ্তদশ শতাব্দীর সুবা বাংলার শেষ বিদ্রোহ' (প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ১-১০ম ও ১১শ-১২শ সংখ্যা, ১৩৮৩
রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)ঃ কলিকাতা, ১৩৫৯
রায়, পঞ্চানন — বাংলার মন্দির ঃ ১৯৭৪
— দাসপুরের ইতিহাস ঃ ১৯৫৯
রায়, বঙ্কিমচন্দ্র — 'নায়েক বিদ্রোহের এক অজানা তথ্য' (প্রবন্ধ)ঃ কৌশিকী, ২য় সংখ্যা, ১৩৭৭
রায়, বি (সম্পাদিত) — ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস্ হ্যাণ্ডবুক, ১৯৬১-মিড়নাপোর, ভল্যুম ১ঃ কলিকাতা, ১৯৬৬
রায়, মৃগাঙ্কনাথ — মেদিনীপুর জেলার জাড়া রায় বংশের পরিচয় ঃ মেদিনীপুর, ১৩৬৮
রায়, যোগেশচন্দ্র — "মেদিনীপুর-ইতিহাস" (প্রবন্ধ)ঃ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬
রায়, সুধাংশুকুমার — দি ফোক-আর্ট অভ্ ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯৬৭
ষড়ঙ্গী, সত্যেন — শাঁকরাইল থানার কথা ঃ কলিকাতা, ১৯৬৪
সরকার, দীনেশচন্দ্র — 'শশাঙ্কের রাজত্বকালীন এগরা তাম্রশাসন' (প্রবন্ধ)ঃ 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৭
সরস্বতী, সরসীকুমার — আর্লি স্কালপ্চার অভ্ বেঙ্গলঃ কলিকাতা, ১৯৬২
সাঁতরা, তারাপদ — বাংলার দারু ভাস্কর্য ঃ হাওড়া ১৯৮০
— মন্দিরলিপিতে বাংলার সমাজচিত্র ঃ কলিকাতা, ১৯৭৬
— মেদিনীপুরঃ সংস্কৃতি ও মানবসমাজঃ হাওড়া, ১৯৮৭
— হাওড়া জেলার পুরাকীর্তিঃ কলিকাতা, ১৯৭৬
— পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদঃ উত্তর মেদিনীপুর, কলিকাতা, ১৯৮৭
— 'আর্কিটেকট্ অ্যান্ড বিল্ডার্স' (প্রবন্ধ)ঃ 'ব্রিক টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গল-ফ্রম দি আর্কাইভস্ অভ্ ডেভিড ম্যাককাচ্চন'ঃ প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি, নিউ জার্সি, ১৯৮৩
— 'ক্যাটালগিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন্ অভ্ মিডিভ্যাল টেম্পলস্ অভ্ বেঙ্গলঃ অ্যান এ্যানালিসিস্ অভ্ প্রবলেমস্ এ্যান্ড মেথড্স' (প্রবন্ধ)ঃ ক্যালকাটা রিভিউ', ১৯৭২
— 'পঙ্খের ভাস্কর্য-অলংকরণ ঃ একটি প্রাচীন শিল্পপদ্ধতি' (প্রবন্ধ)ঃ 'পট', ১ম সংখ্যা, ১৯৮৫
— 'মেদিনীপুরের একজন মন্দির স্থপতিঃ শিল্পনিপুণ জীবন পরিচয়' (প্রবন্ধ)ঃ 'চতুষ্কোণ', আশ্বিন, ১৩৭৭
— 'স্মৃতিরক্ষার প্রাচীন এক প্রথা ঃ সন্ধানও সংরক্ষণ' (প্রবন্ধ)ঃ তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র স্মরণিকা, ১৯৮২
সান্যাল, হিতেশরঞ্জন — সোশ্যল মোবিলিটি ইন্ বেঙ্গল ঃ কলিকাতা, ১৯৮১

সান্যাল, হিতেশরঞ্জন — রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা ঃ কলিকাতা, ১৯৮০

সামন্ত, বিশ্বনাথ — 'লালজলের চিত্রকলা' (প্রবন্ধ)ঃ তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র স্মরণিকা, ১৯৮২

সিংহ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ — দি হিস্ট্রি অভ্ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫)ঃ কলিকাতা, ১৯৬৭

সিংহ, রাধারমণ — চন্দ্রকোণায় নবকুঞ্জ মহোৎসব ঃ ১৩৮৩

সিংহ রায়মল্ল, নিরঞ্জন — বঙ্গোৎকলে আগত শোলাঙ্কী রাজপুত ক্ষত্রিয় ঃ ১৯৭২

সেন, প্রবোধচন্দ্র — 'সাম জনপদ্স অভ্ অ্যানসিয়েন্ট রাঢ়' (প্রবন্ধ) 'ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল সোসাইটি, ভল্যুম ৮, ১৯৩২

হরি মোহন — চেরো ঃ অ্যা স্টাডি ইন এ্যাকাল্চারেশন, ১৯৭৩

হাজরা, প্রবালকান্তি — 'ইতিহাসে খেজুরী' (প্রবন্ধ)ঃ দক্ষনাবিক, শ্রাবণ, ১৩৮৮

হান্টার, ডাবলিউ ডাবলিউ — অ্যা স্টাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্টস্ অভ্ বেঙ্গল ঃ ভল্যুম ৩, ১৮৭৬

অনুক্রমণিকা

আলোকচিত্র

[পরবর্তী আলোকচিত্রগুলি শ্রীশিবেন্দু মান্না (২, ১৩, ৩২, ৩৯, ও ৬২ নং), শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল (৩৫, ৩৬, ৪৩ ও ৬৭ নং), তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র (৯ নং), শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৬৯ ও ৭০ নং) এবং অবশিষ্ট ৬৩টি শ্রীতারাপদ সাঁতরা কর্তৃক গৃহীত ও সেগুলির সর্বস্বত্ব, যথাক্রমে, তাঁদের দ্বারা সংরক্ষিত ।]

(১) রক্ষিনীর ঝামাপাথরের পীঢ়া-দেউল ঃ ডাইনটিকরি (পৃ ঃ ৮৫)
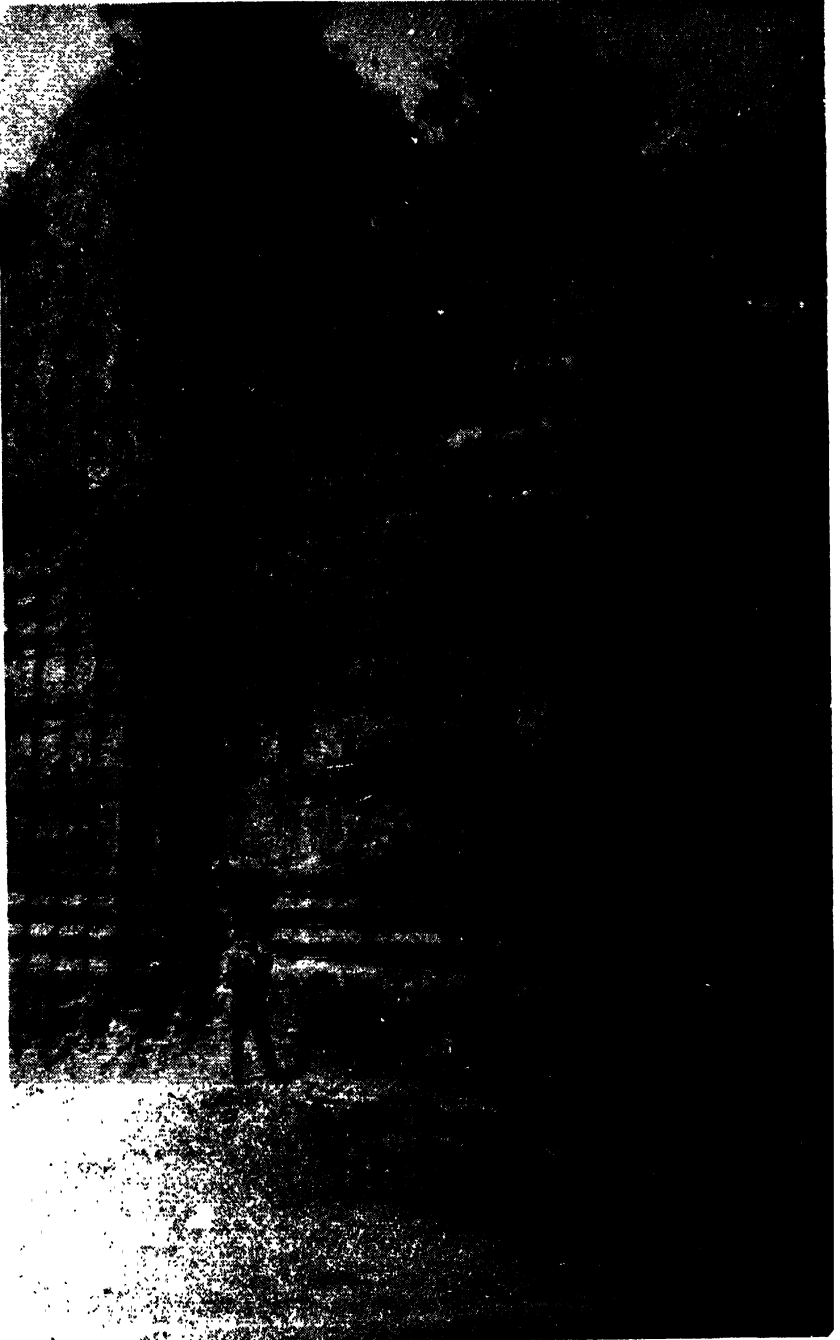
(২) ইটের পরিত্যক্ত শিখর-দেউল (সংরক্ষণের পূর্বে) : দেউলবাড় (পৃ : ৯৯-১০০)
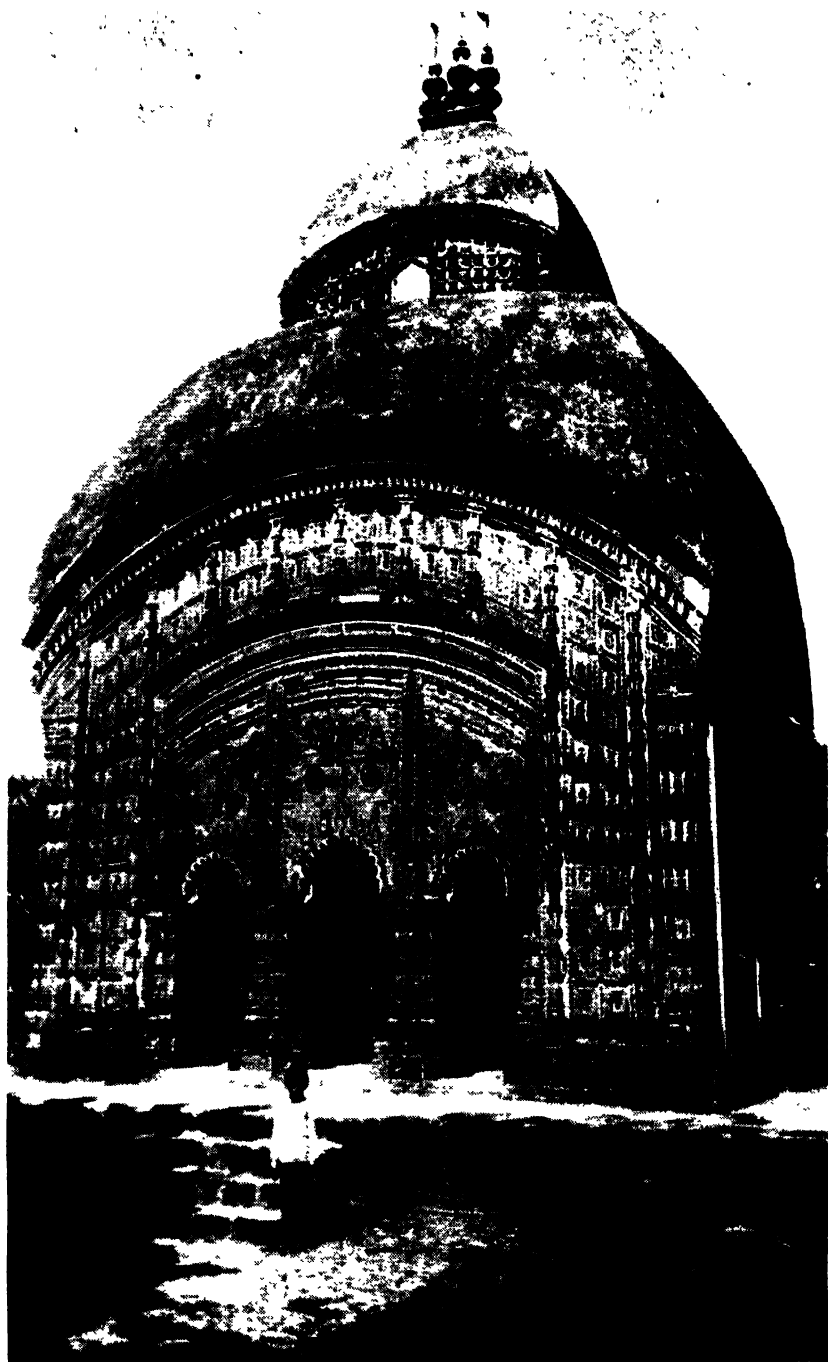
(৩) দক্ষিণাকালীর আটচালা মন্দির : মালঞ্চ (পৃ : ১৩৩)
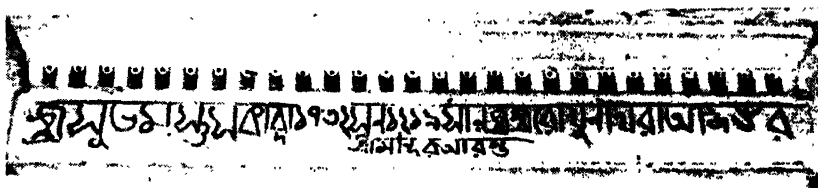
(৪) দণ্ডেশ্বর শিবের পাথরের দেউল : কর্ণগড় (পৃ : ৩২-৩৩)

(৫) রঘুনাথ মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপি : আলঙ্গিরী (পৃ : ২৪)

(৬) তুলসীমঞ্চে উৎকীর্ণ লিপি : হুসনাবাজার (পৃ : ৯৮)
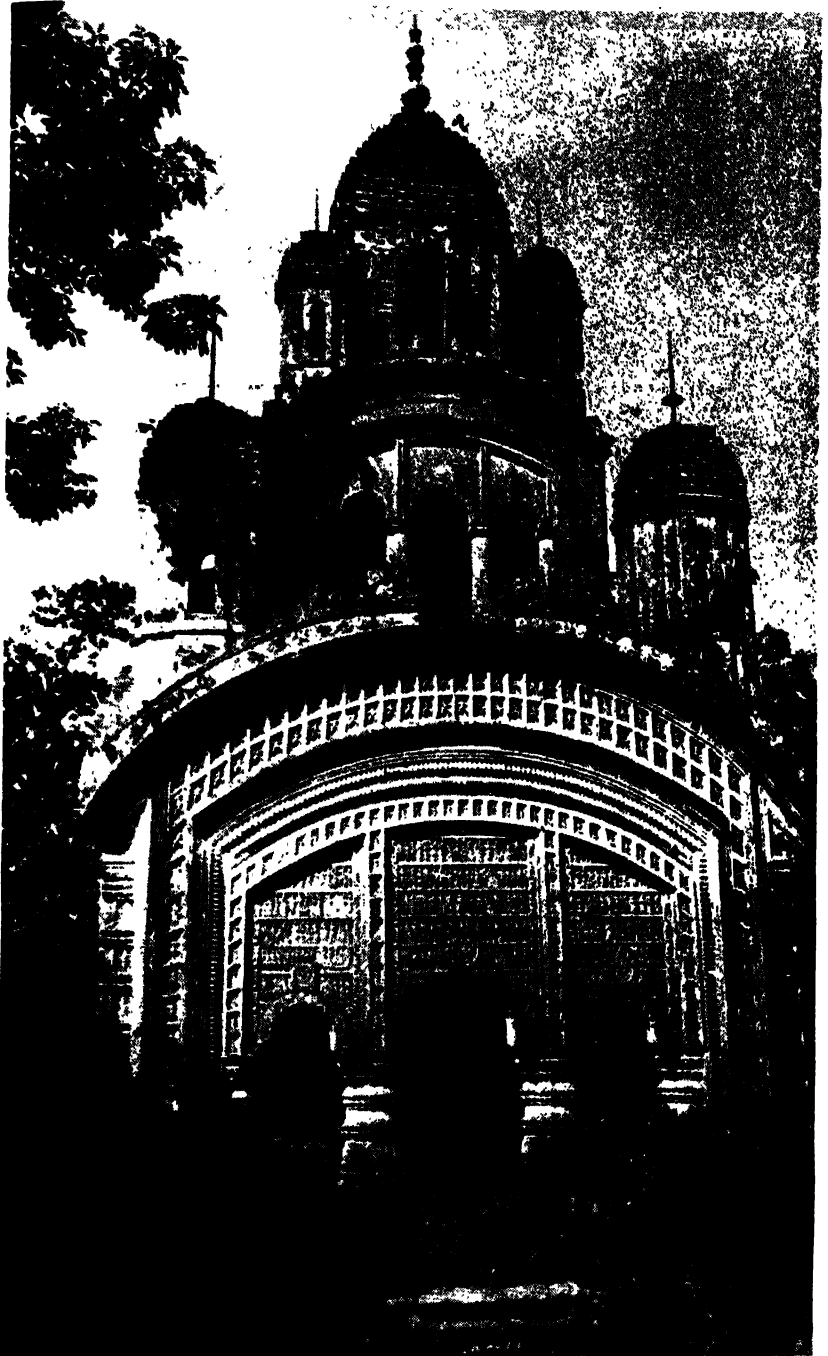
(৭) শ্রীধরজীউর নবরত্নমন্দির : চমকা (পৃ : ৭৫)
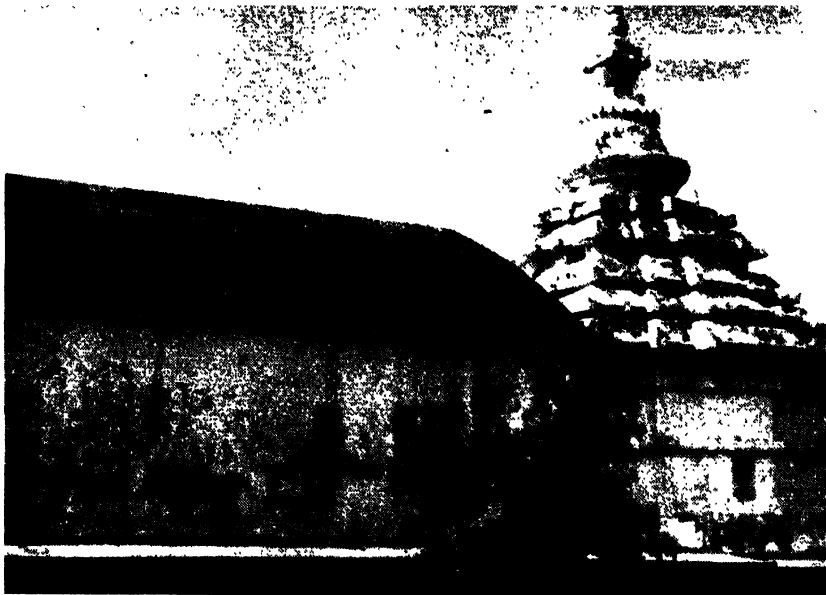
(৮) শ্যামলেশ্বর শিবের পীঢ়া-দেউল : দাঁতন (পৃ : ১৬)

(৯) পোড়ামাটির বিদেশিনী নারীর মুখ (আ : খ্রীঃ পূ : ৩য় শতক) : তমলুক (পৃ : ৮৮-৮৯)

(১০) সহস্রলিঙ্গের পাথরের মন্দির : সহস্রলিঙ্গ (পৃ : ১৫৬)

(১১) বটেশ্বরের পাথরের দেউল : কাষ্টখামার (পৃ : ৩৭-৩৮)

(১২) পোড়ামাটির ফলকে কমলেকামিনীঃ সৌলান (পৃ : ১৬১)

(১৩) কেদার-পাবকেশ্বরের শিখর মন্দির : কেদার (পৃ : ৪১)

(১৪) পার্বতীনাথের সতেরচূড়া মন্দির : চন্দ্রকোণা (পৃ : ৭১)
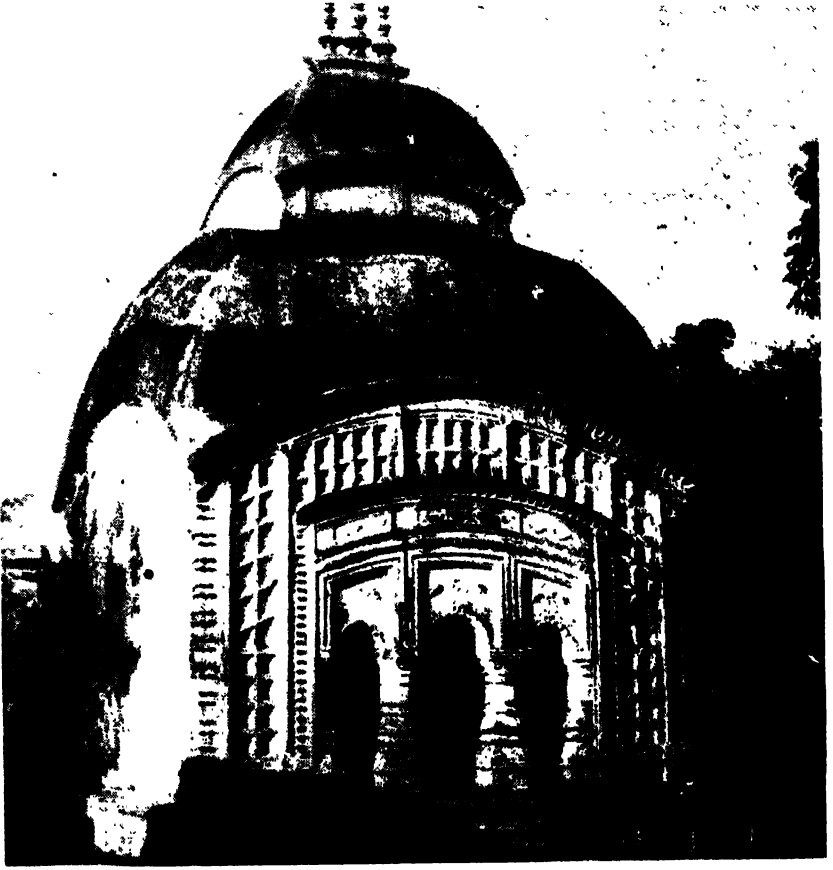
(১৫) শীতলানন্দ শিবের আটচালা মন্দির : বৈদ্যনাথপুর (পৃ : ১২৬)

(১৬) জানকীবল্লভের মন্দিরে পোড়ামাটির শিকার দৃশ্য : তিলন্তপাড়া (পৃ : ৯৩)
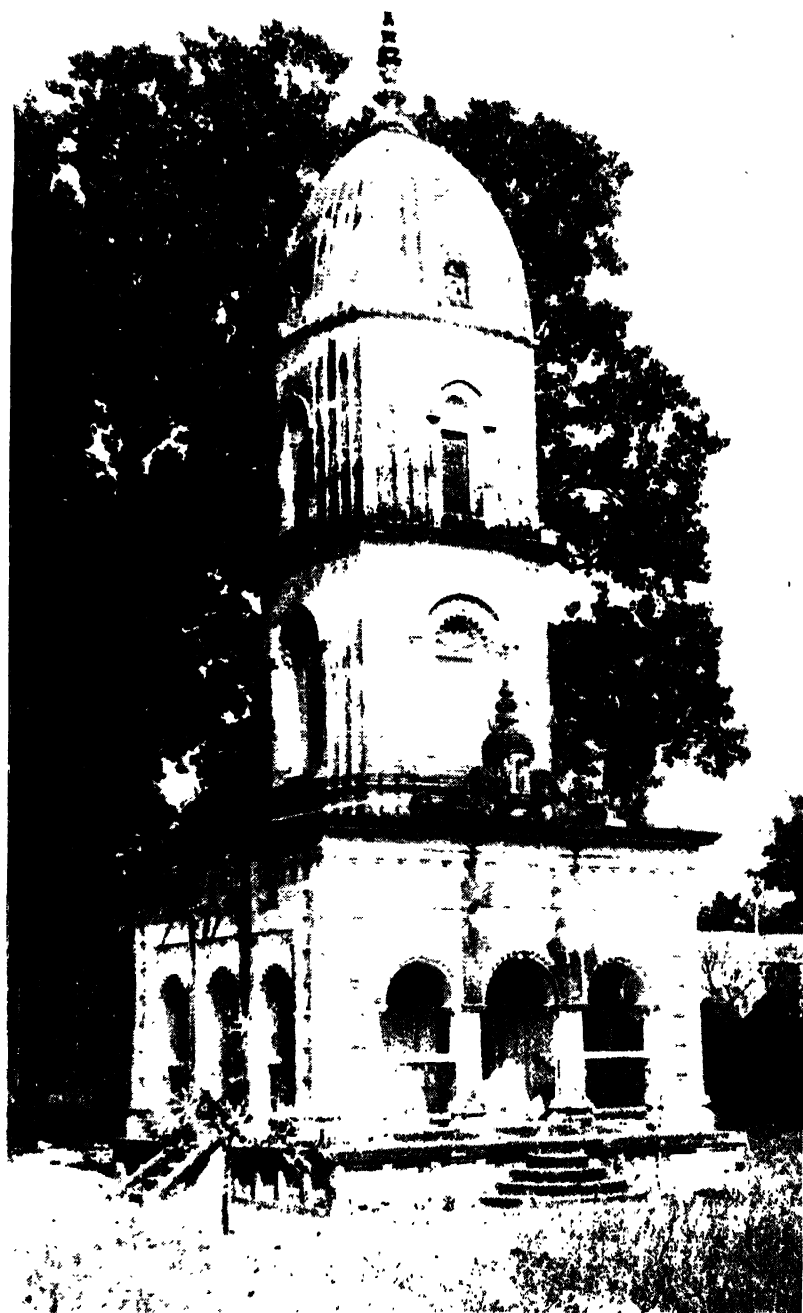
(১৭) অভিনব স্থাপত্যের একরত্ন মন্দির : চিলকীগড় (পৃ : ৭৭)

(১৮) বসন্তরায়ের আটচালা মন্দির : রসকুণ্ড (পৃ : ১৪১)

(১৯) শ্রীধরজীউ মন্দিরে 'টেরাকোটা'-সজ্জা : চাউলি (পৃ : ৭৫-৭৬)
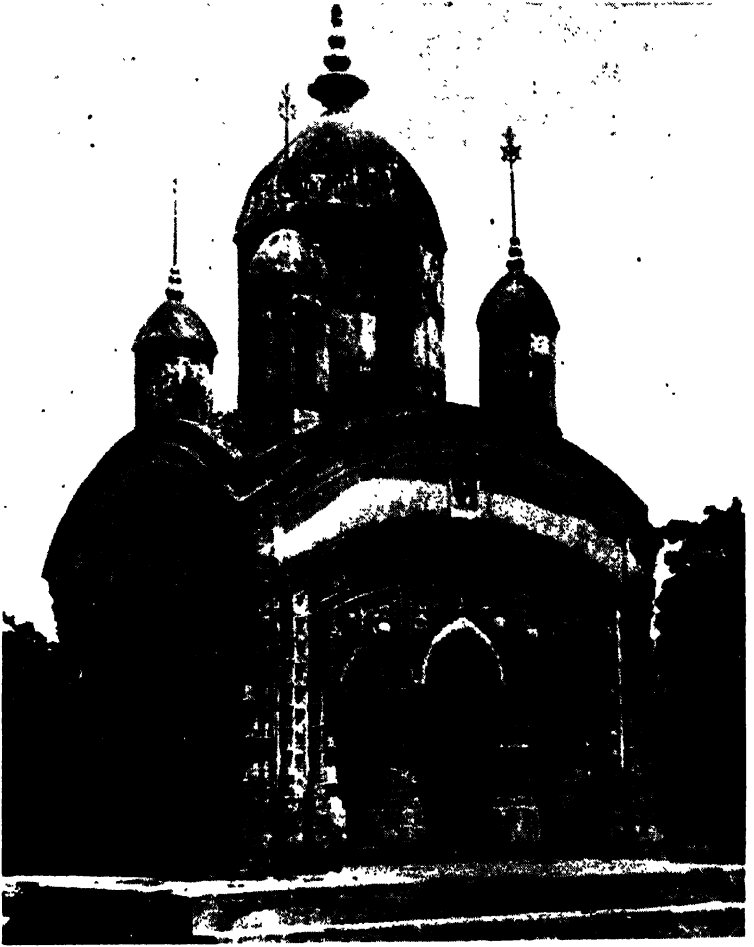
(২০) রত্নেশ্বর শিবের পঞ্চরত্ন মন্দির : গোবর্ধনপুর (পৃ : ৬২-৬৩)

(২১) পোড়ামাটির ফলকে যুদ্ধ দৃশ্য : মালঞ্চ (পৃ : ১৩৩)
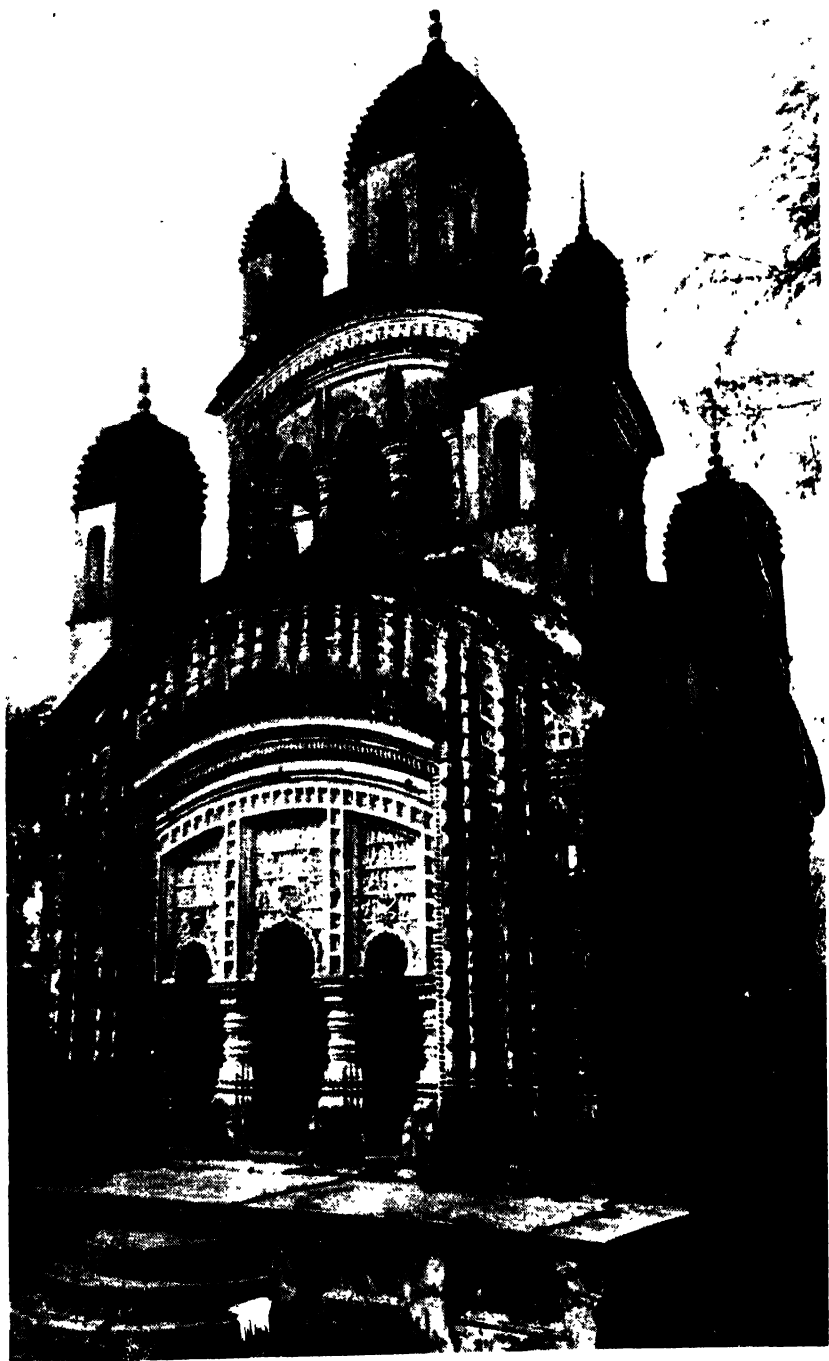
(২২) লক্ষ্মীজনার্দনের নবরত্ন মন্দির : মুকসুদপুর (পৃ : ১৩৪)

(২৩) গোপীনাথ ও রঘুনাথের একরত্ন মন্দির : মনিনাথপুর (পৃ : ১২৯)

(২৪) পঙ্খসজ্জাযুক্ত রাসমঞ্চ : পলাশী (পৃ : ১০৮)

(২৫) দামোদর মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলা : আনন্দপুর (পৃ : ২১)
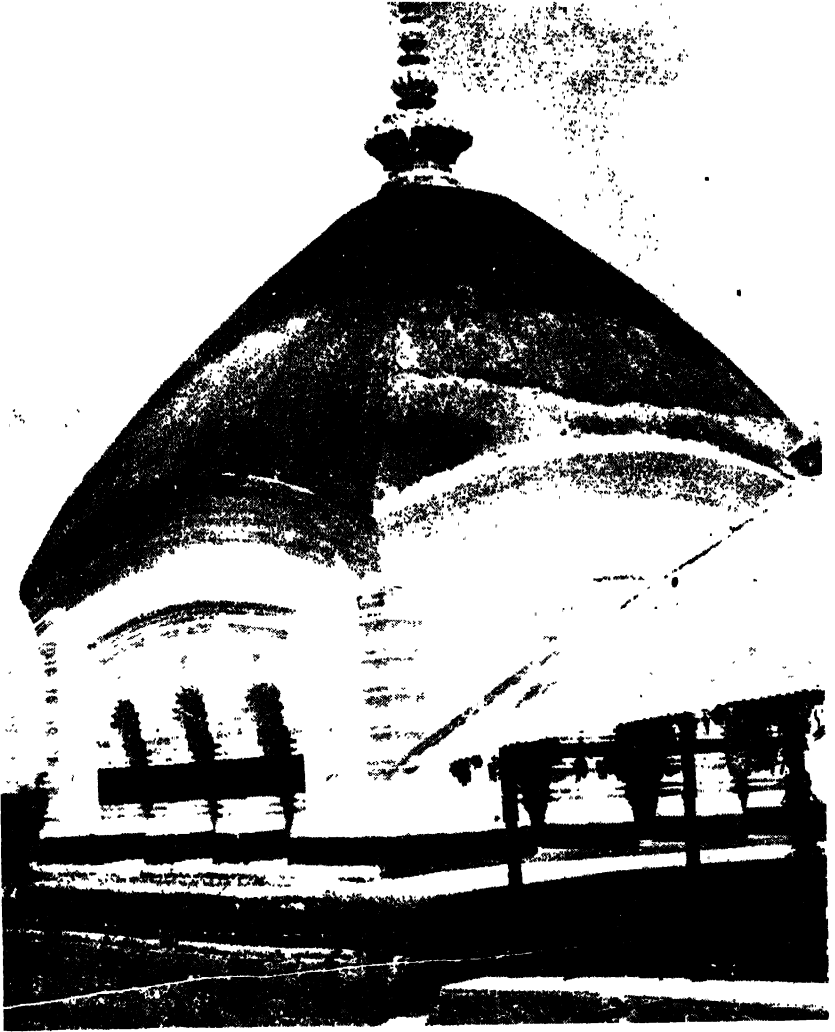
(২৬) দেবী সনকার পাথরের চারচালা মন্দির : গোয়ালতোড় (পৃ : ৬৩-৬৪)

(২৭) পোড়ামাটির ফলকে কৃষ্ণলীলা : কঁয়তা (পৃ : ৩১)
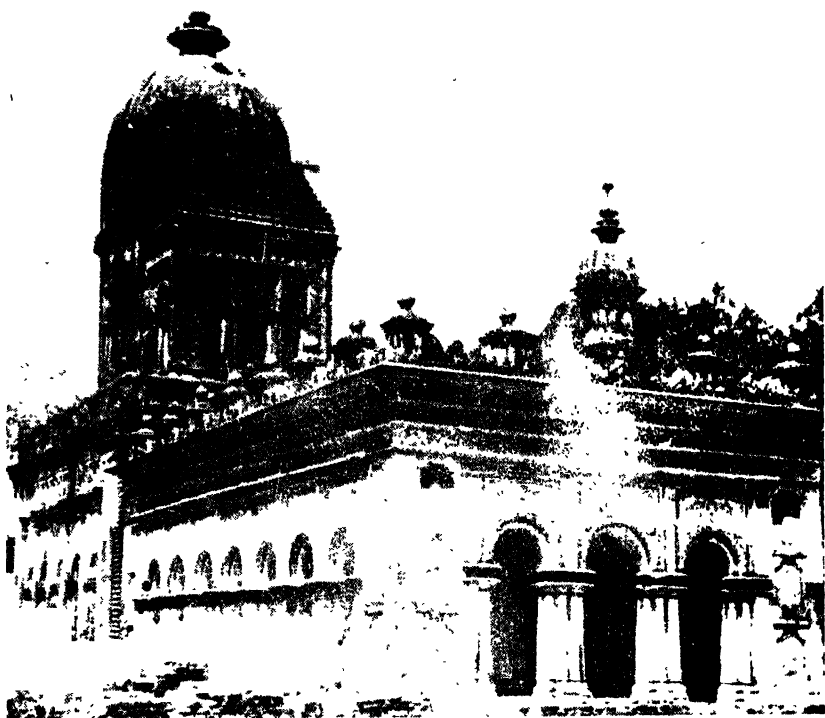
(২৮) রাধাবিনোদের দালানসহ শিখর মন্দির : পাঁচরোল (পৃ : ১০৯-১১০)

(২৯) শীতলানন্দ শিব মন্দিরে পোড়ামাটির অলংকরণ : হরিরামপুর (পৃ : ১৬২)
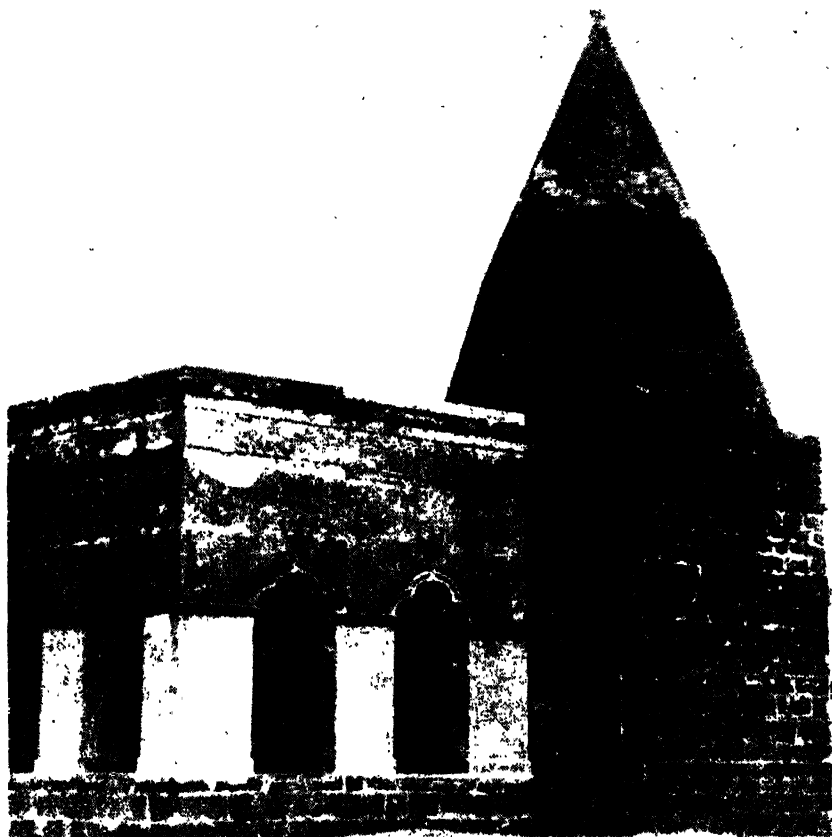
(৩০) চন্দ্রশেখর শিবের পাথরের মন্দির : চন্দ্রী (পৃ : ৭৪)

(৩১) রাধাগোবিন্দ মন্দিরে বানরসেনার সেতুবন্ধ দৃশ্য : চাঁইপাট (পৃ : ৭৫)

(৩২) লোকেশ্বর শিবের মন্দির : ময়না (পৃ : ১৩০-১৩১)

(৩৩) কিশোররায়ের শিখর-দেউল : পঁচেট (পৃ : ১০৭)

(৩৪) কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে পোড়ামাটিসজ্জা : রবিদাসপুর (পৃ : ১৪১)
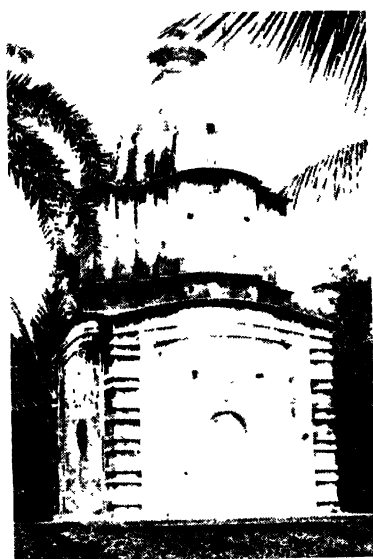
(৩৫) সিদ্ধিনাথের শিখর মন্দির : রেয়াপাড়া (পৃ : ১৪৯)

(৩৬) সুবর্ণেশ্বর শিবের একরত্ন মন্দির : দক্ষিণ সিমুলিয়া (পৃ : ৯৪)

(৩৭) পাথরের স্তম্ভে ঘণ্টা ও পদ্মকোরকের অলংকরণ : পাথরঘাটা (পৃ : ১১০-১১১)
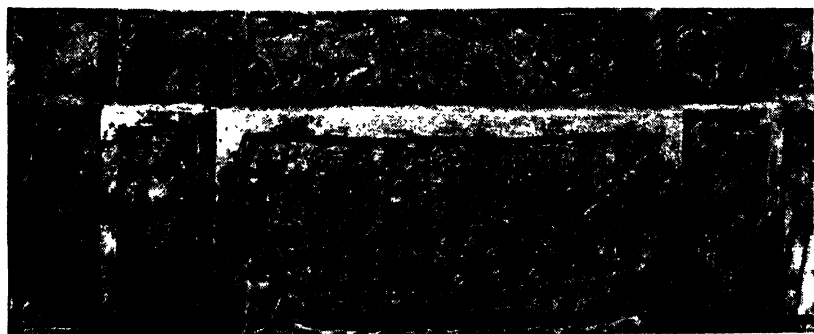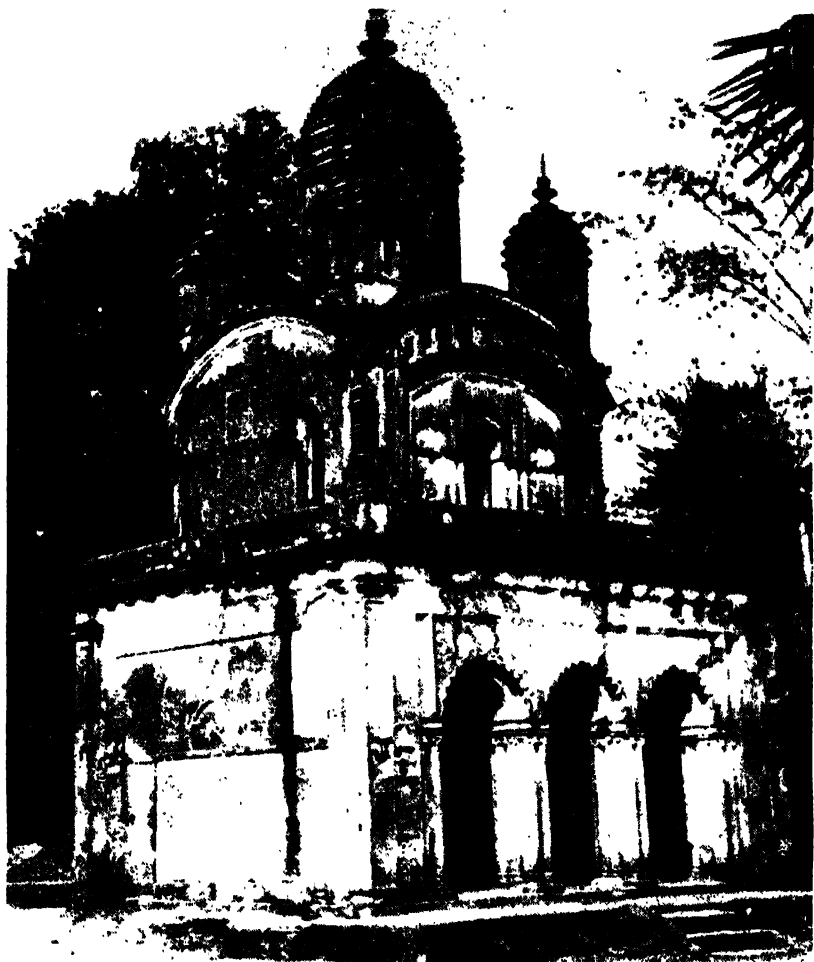
(৩৮) দালানের উপর পঞ্চরত্নরীতির মন্দির : ঈশ্বরপুর (পৃ : ২৭)

(৩৯) লোকেশ্বর মন্দিরে 'টেরাকোটা' অলংকরণ : ময়না (পৃ : ১৩০-১৩১)
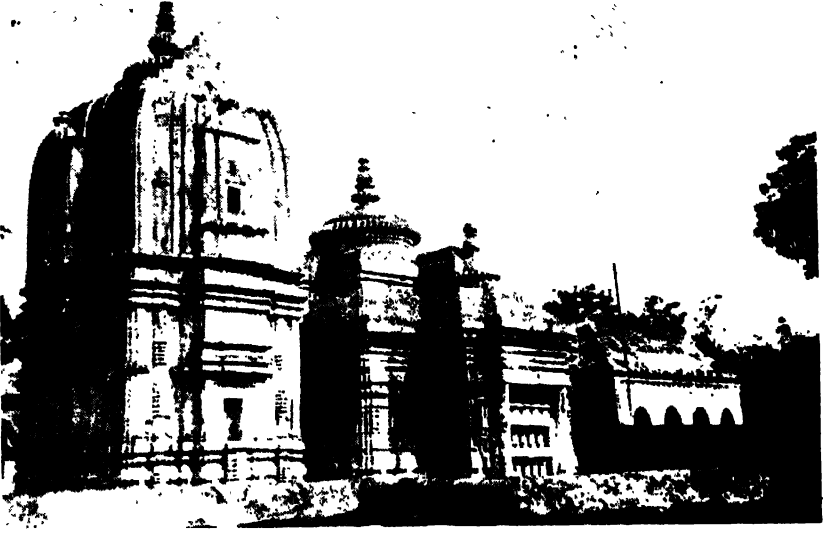
(৪০) সর্বমঙ্গলার পাথরের দেউল : গড়বেতা (পৃ . ৫৭)

(৪১) গাছের ছালে আবৃত প্রস্তরমূর্তি : খেলাড় (পৃ : ৫৪)

(৪২) 'টেরাকোটা'-সরস্বতীমূর্তি : জয়কৃষ্ণপুর (পৃ : ৭৯)
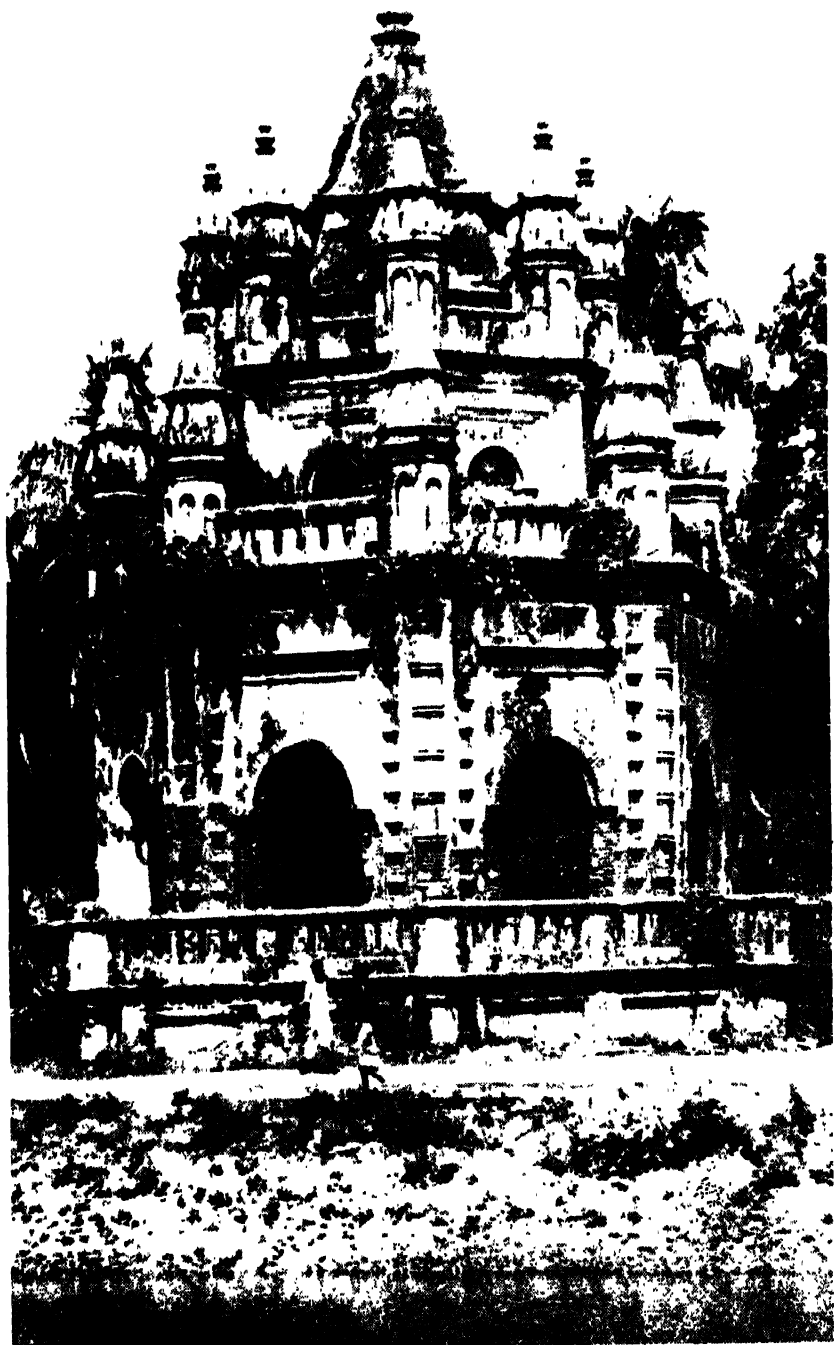
(৪৩) সতেরচূড়া রাসমঞ্চ : মহিষাদল (পৃ : ১৩২)
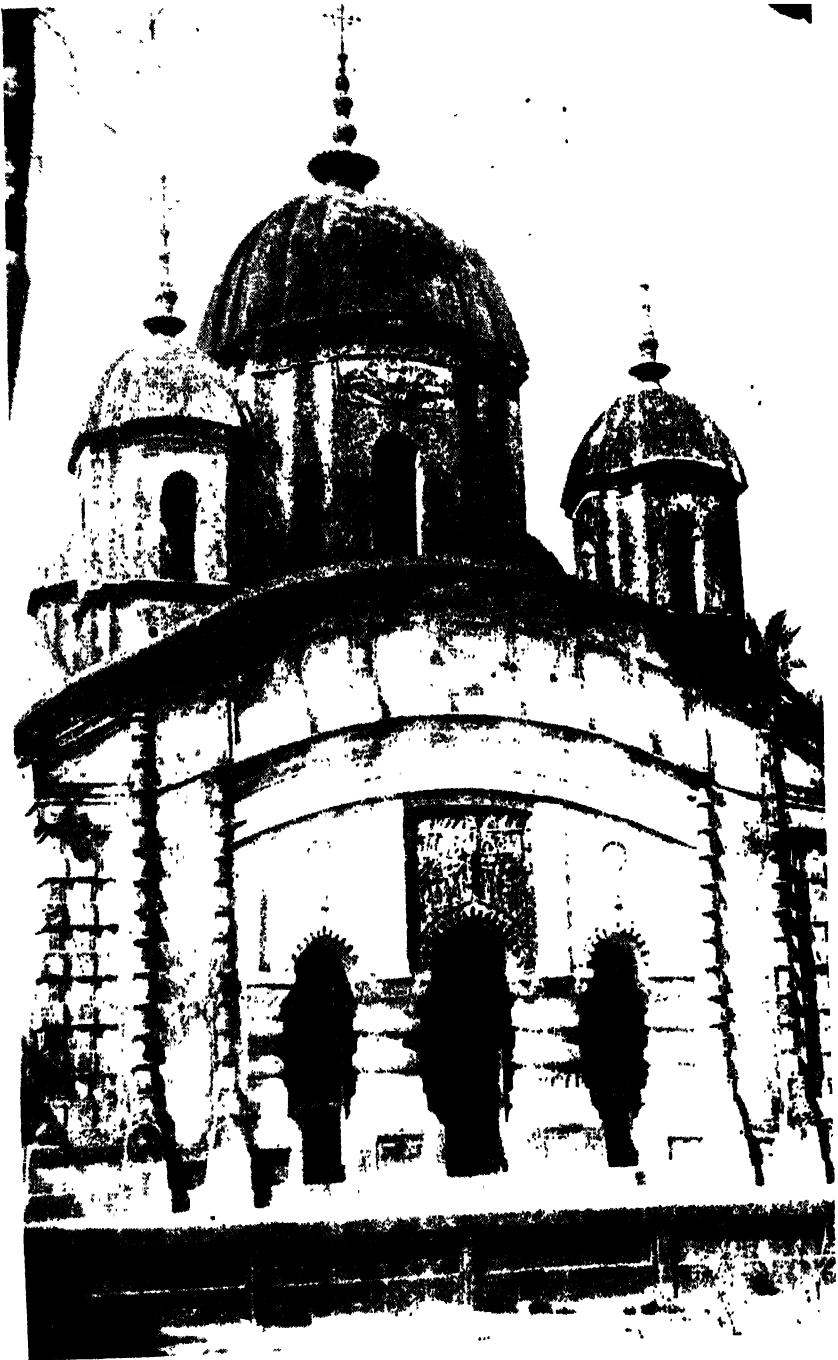
(৪৪) রাধাবল্লভজীউর পঞ্চরত্ন মন্দির : গোপীমোহনপুর (পৃ : ৬২)
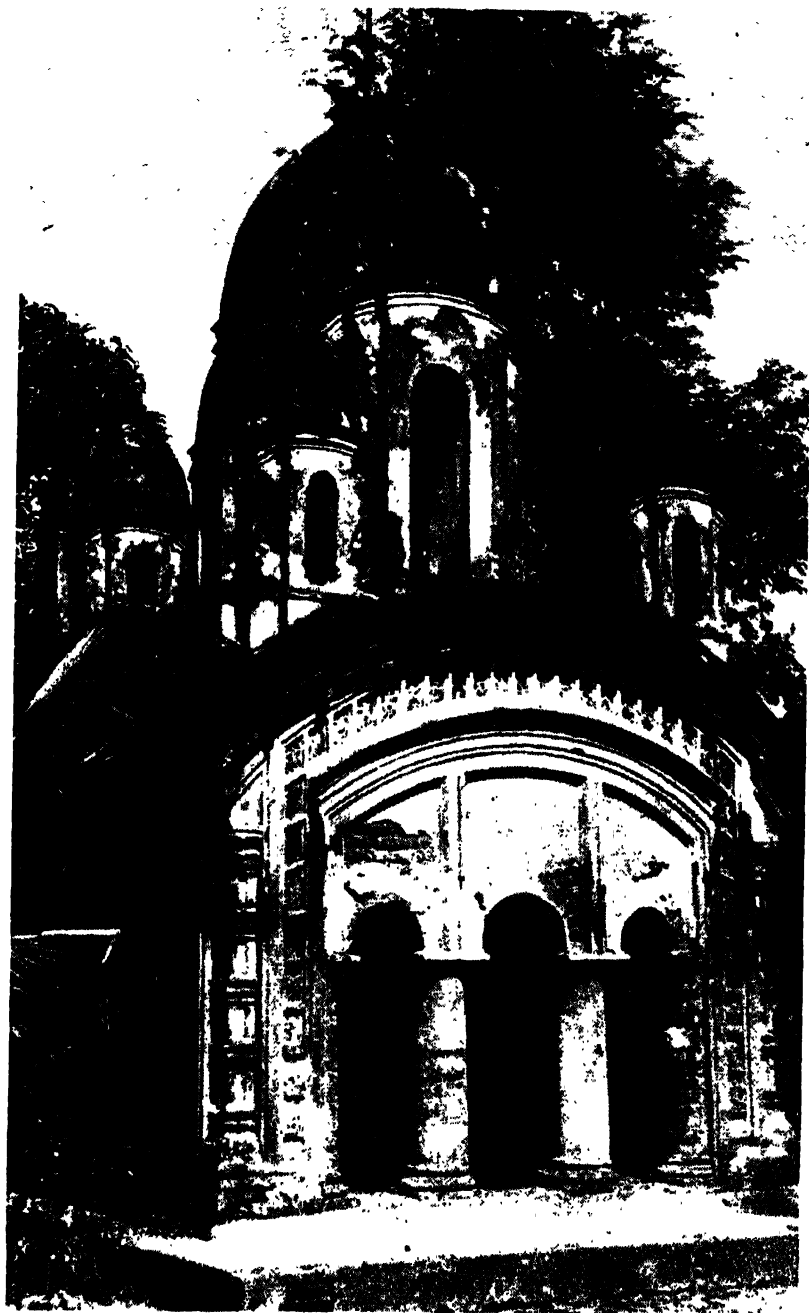
(৪৫) রাধাবল্লভজীউর পঞ্চরত্ন মন্দির : তালবান্দি (পৃ : ৯২)

(৪৬) গায়েনপাড়াব দালান মন্দিরে 'টেরাকোটা'-সজ্জা . ক্ষীরপাই (পৃ : ৪৭-৪৮)

(৪৭) ইটের জোড়া শিবমন্দির : রাজনগর (পৃ : ১৪২)

(৪৮) শ্রীধরজীউব রাসমঞ্চে পোড়ামাটির বাদিকা মূর্তি : গৌরা (পৃ . ৬৫)
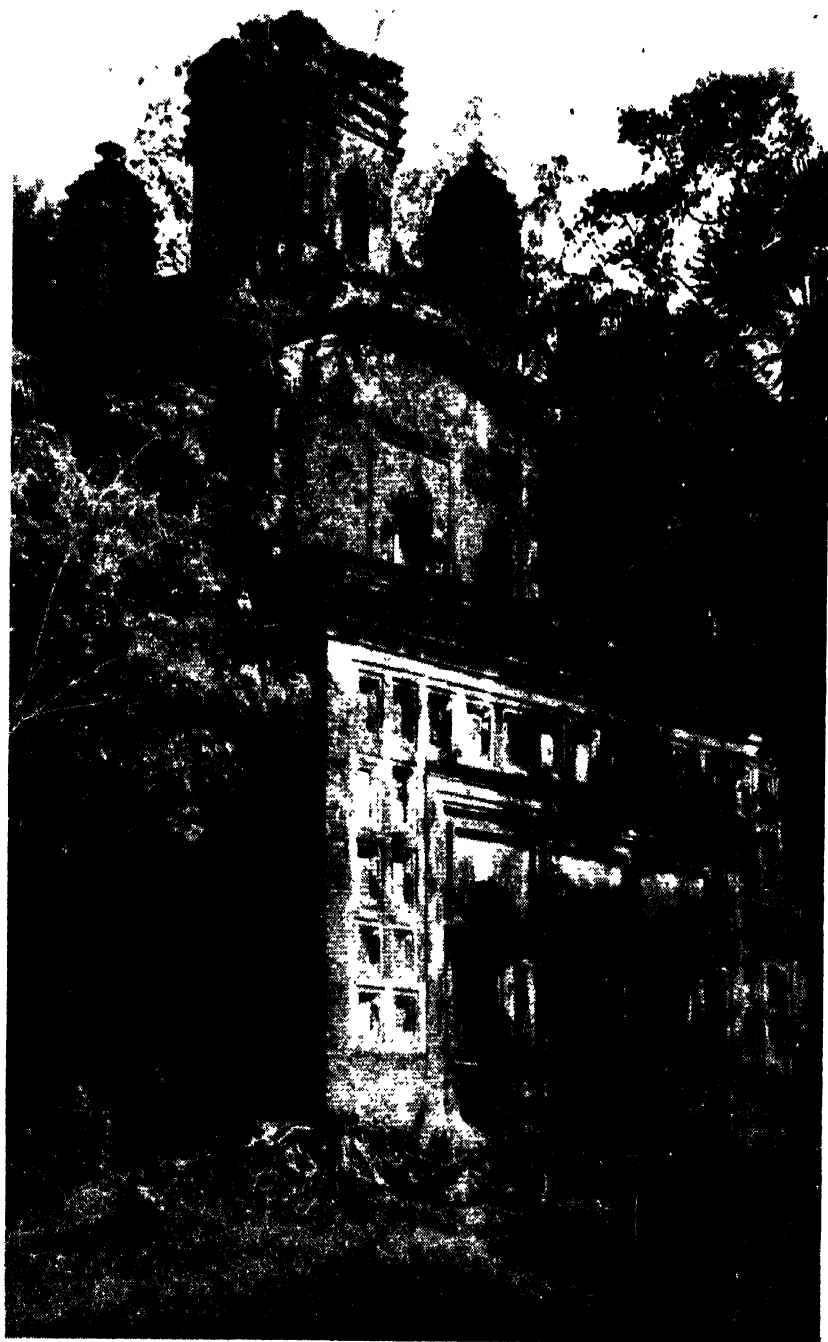
(৪৯) লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির : মনোহরপুর (পৃ : ১২৯-৩০)
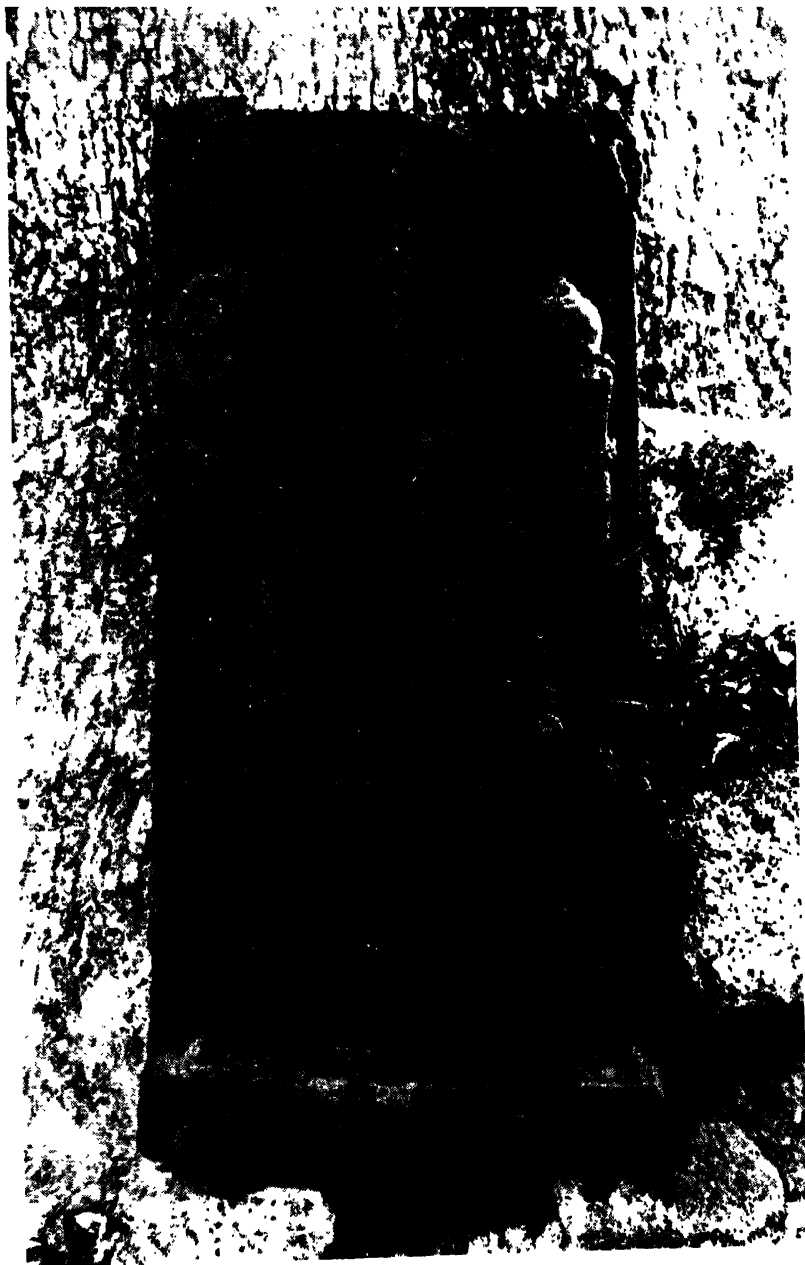
(৫০) গাছতলায় রক্ষিত কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি : হীরাপাড়ি (পৃ : ১৬৩-১৬৪)

(৫১) দেওয়ানখানা মসজিদ : মেদিনীপুর শহর (পৃ : ১৩৬)
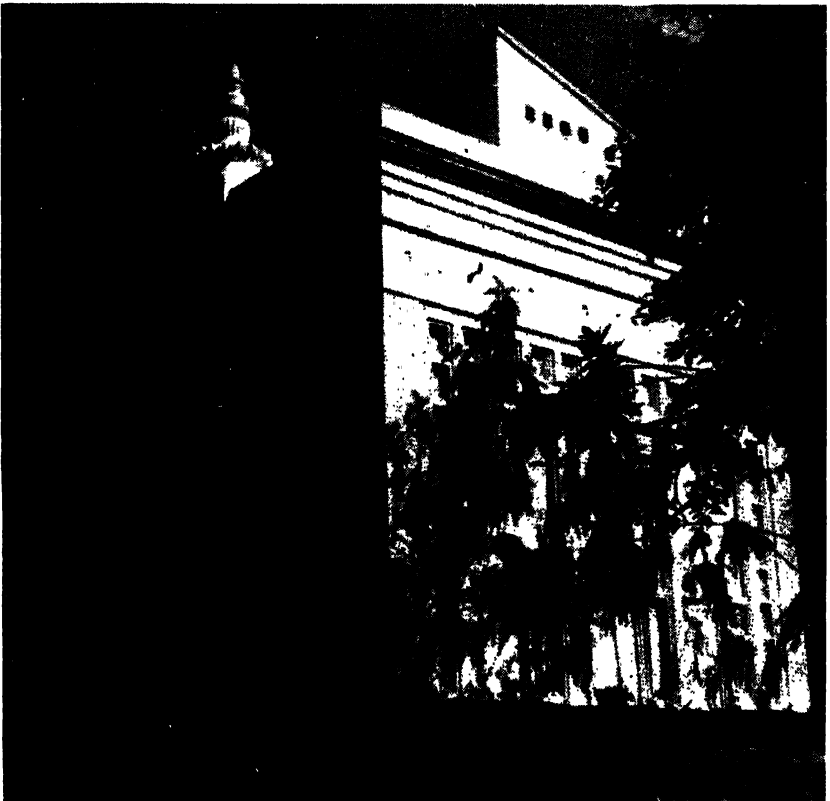
(৫২) রাধাবল্লভের দালান মন্দির : বারাঙ্গা (পৃ : ১২০)
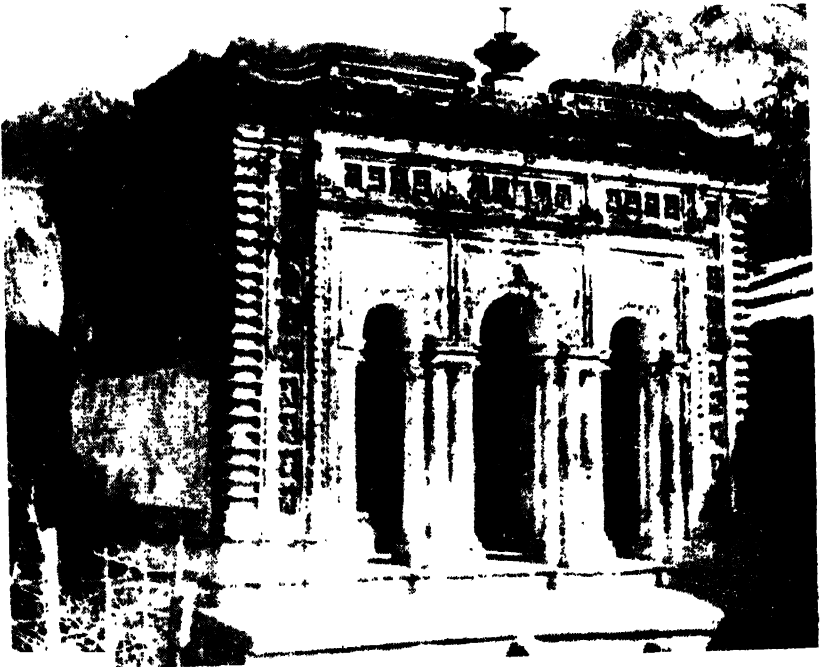
(৫৩) রাধাগোবিন্দের পাথরের জোড়বাংলা . বসনছোড়া (পৃ . ১১৭-১১৮)

(৫৪) রাধাকৃষ্ণপুরের রামচন্দ্র মন্দির : চন্দ্রকোণা (পৃ ৭১)

(৫৫) গোপালজীউর শিখর মন্দির : মীর্জাপুর (পৃ : ১৩৪)

(৫৬) চন্দনেশ্বর শিবের পীঢ়া-দেউল : সেঁকুয়া (পৃ : ১৬০-১৬১)

(৫৭) সর্বমঙ্গলার পীঢ়া-দেউল : কেশিয়াড়ী (পৃ : ৪২-৪৪)
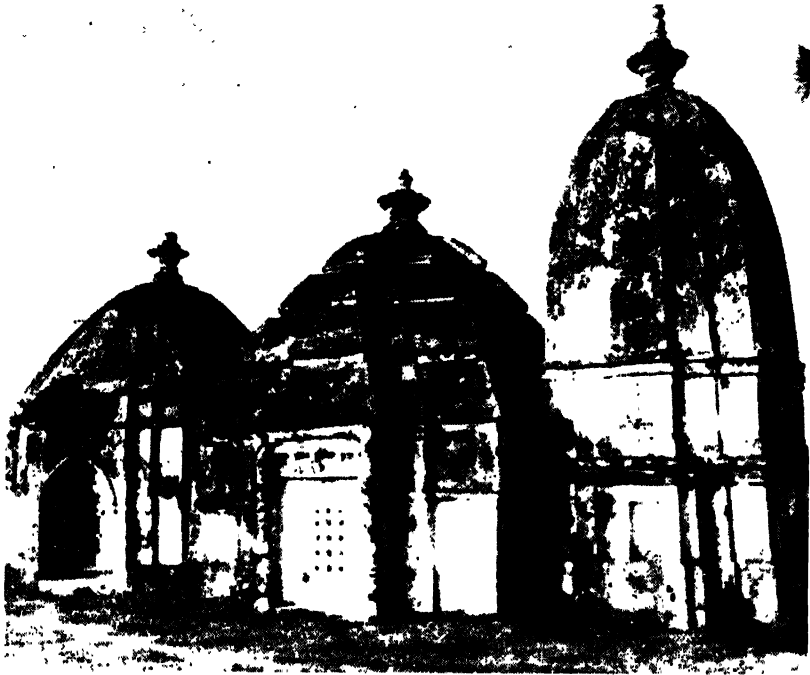
(৫৮) কেদারেশ্বর শিবের পাথরের দেউল : কেদার (পৃ : ৪১)

(৫৯) চাঁদ খাঁ পীরের মাজার : ডিহিচেতুয়া (পৃ : ৮৭)
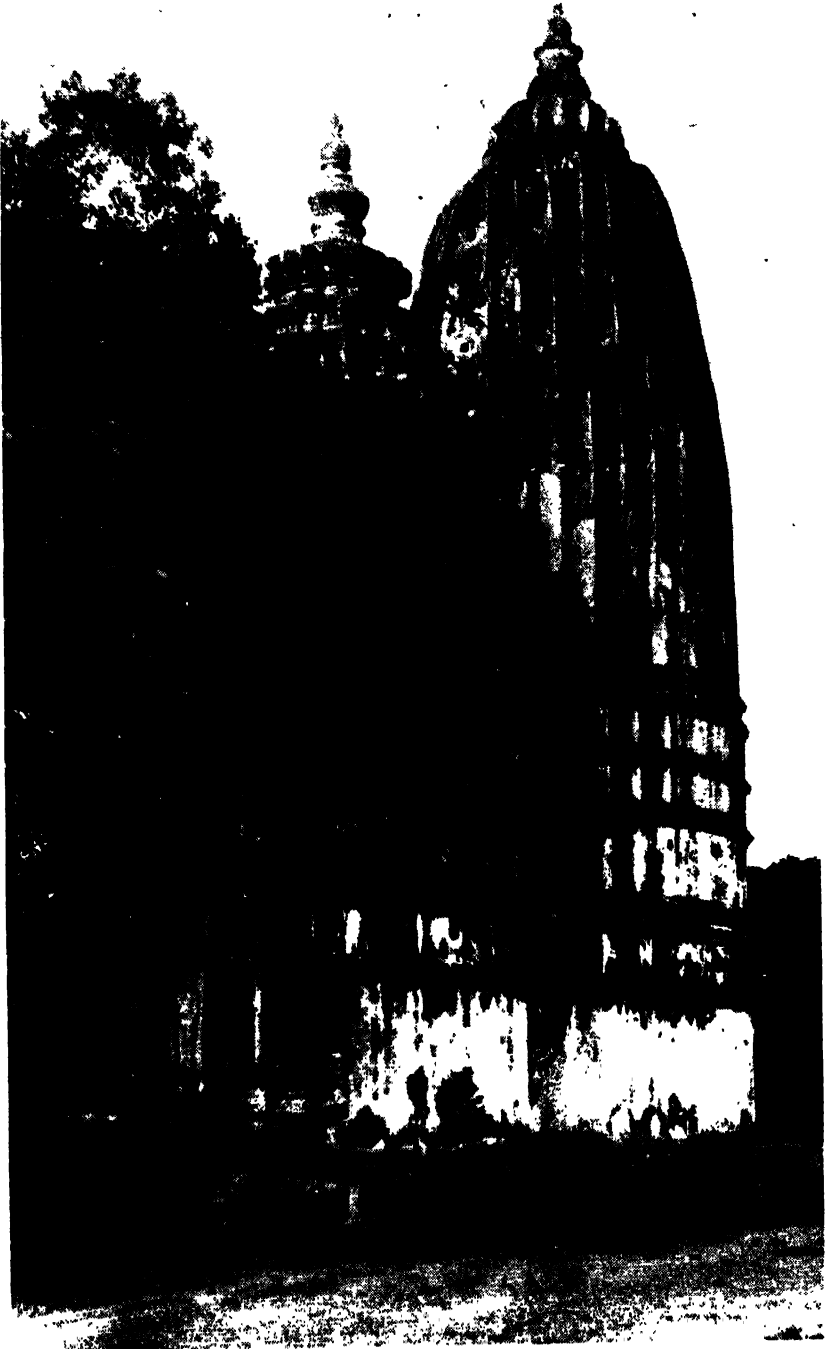
(৬০) মহারুদ্রের ইটের শিখর-দেউল : খারড় (পৃ : ৫২)

(৬১) লক্ষ্মীজনার্দনের শিখর-দেউল : সারতা (পৃ : ১৫৭-১৫৮)

(৬২) গোকুলরায় মন্দিরে উপাসিত কাঠের বিগ্রহ : তরুয়াঁ (পৃ . ৯১)

(৬৩) সর্বমঙ্গলার মন্দির দেওয়ালে পঙ্খভাস্কর্য : গড়বেতা (পৃ : ৫৭)
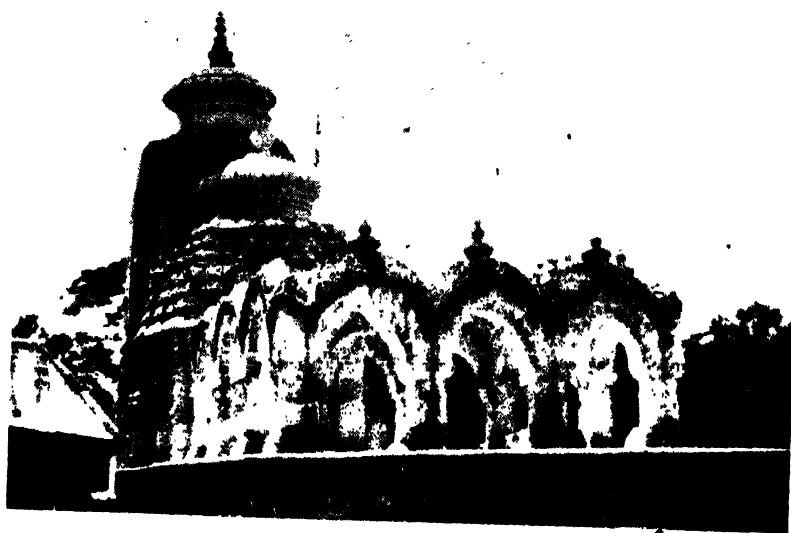
(৬৪) হটনাগরের ইটের শিখর-দেউল : এগরা (পৃ : ২৯-৩০)

(৬৫) দক্ষিণা কালী ও শিবের আটচালা মন্দির : ভগবানপুর (পৃ : ১২৭)
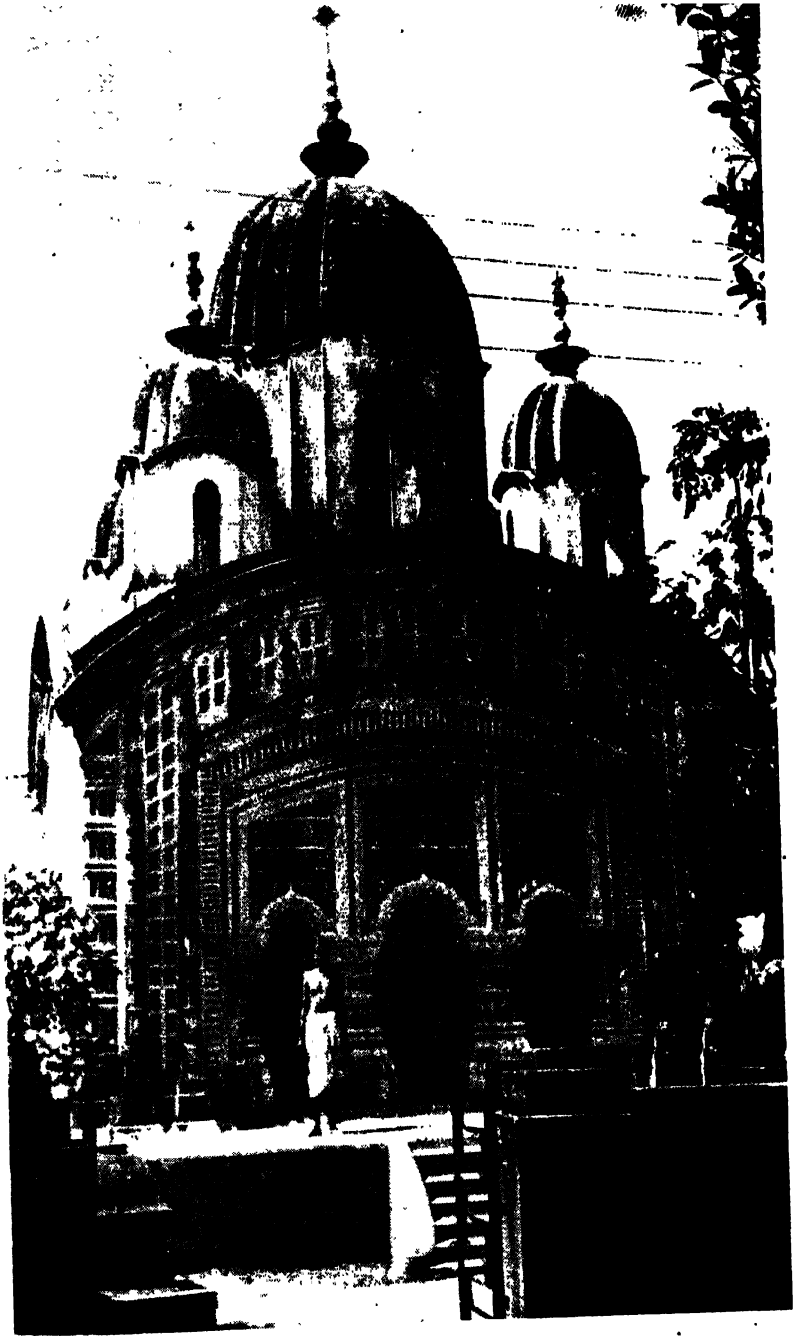
(৬৬) রাধাগোবিন্দজীউর পঞ্চরত্ন মন্দির : গোবিন্দনগর (পৃ : ৬৩)
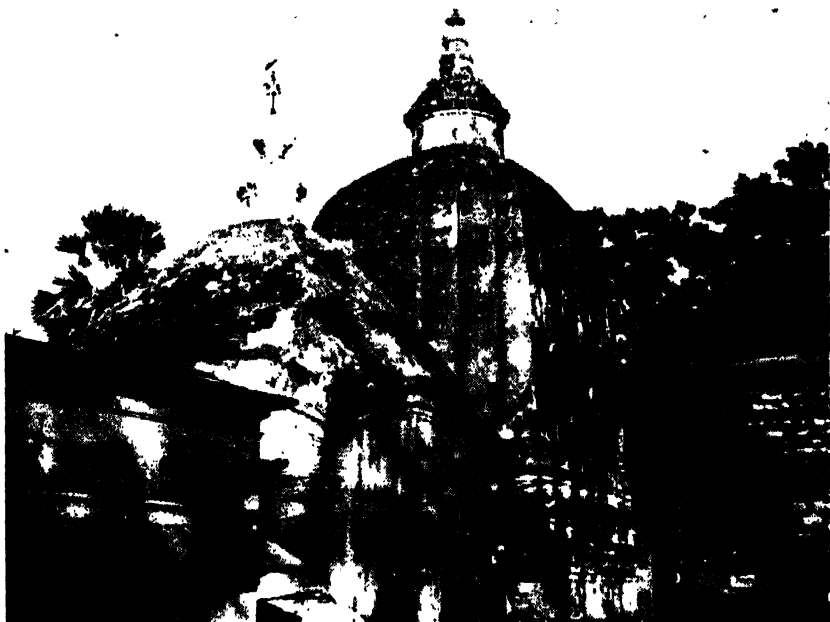
(৬৭) বর্গভীমার মন্দির : তমলুক (পৃ : ৯০)

(৬৮) জৈন ও লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি : মারণদিঘি : (পৃ : ১৩৩)

(৬৯) রাধাদামোদর মন্দিরে কৃষ্ণকালীর 'টেরাকোটা'-ফলক : ক্ষীরপাই (পৃ : ৪৬)

(৭০) রাসমঞ্চে উৎকীর্ণ পোড়ামাটির মূর্তি : মাঙলোই (পৃ : ১৬২)

(৭১) পঙ্খ নির্মিত বাতায়নবর্তিনী : চিরুলিয়া (পৃ : ৭৭)
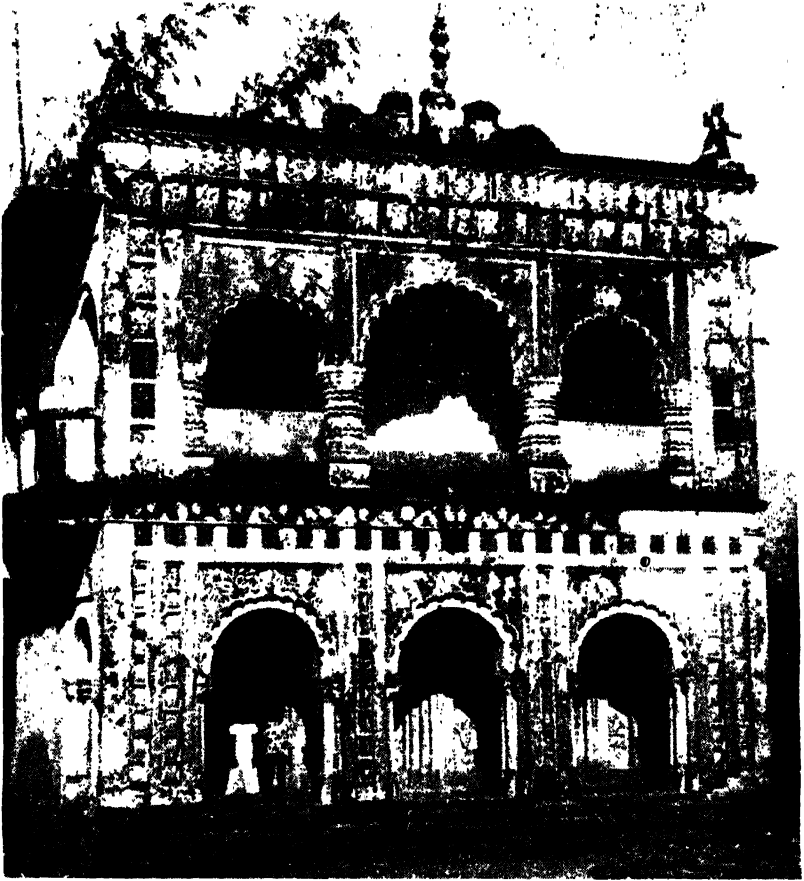
(৭২) দোতলা দালান-মন্দির : লালগড় (পৃ · ১৫১)

(৭৩) কুরুমবেড়ার প্রস্তর স্থাপত্য : গগনেশ্বর (পৃ : ৫৫-৫৬)

(৭৪) মাধবানন্দজীউর মন্দিরে কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি : গুয়াবোড়িয়া (পৃ . ৫৯)

(৭৫) রঘুনাথজীউর একরত্ন মন্দির : মোহনপুর (পৃ : ১৩৯)